ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম

(আব্বাসি হতে মেলোনি)

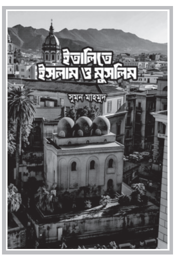

উমাইয়া শাসন হতে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও শতকে ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতির বিশদ প্রামাণ্যগ্রন্থ।

ইতালিতে মুসলিম আগমন, শাসন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য ইতিহাস।

অর্থনীতি, সমাজ ও জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের অবদান, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ এতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক যুগ থেকে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতির অবসান এবং আধুনিক ইতালিতে মুসলিমদের অবস্থান পর্যন্ত আলোচনা সংযোজিত। মানচিত্র, চিত্র, শাসকদের তালিকা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানসহ সমৃদ্ধ এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সুমন মাহমুদ

JAMANA
PUBLICATIONS LTD.

যামানা পাবলিকেশন্স লি.

ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম
(আব্বাসি হতে মেলোনি)

প্রথম প্রকাশ	জুন ২০২৬
প্রকাশক	যামানা পাবলিকেশন্স লি.
সর্বসত্ত্ব:	প্রকাশক ১১৪৫/২ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯
অনলাইন পরিবেশক	যামানা ই-শপ লি. www.jamanabd.com
প্রচ্ছদ	ফরিদী নুমান
বিন্যাস	নাজমুল হাসান
মুদ্রণ	আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শুভেচ্ছা মূল্য: ৪৮০ (চার শত আশি) টাকা

Written in Bangla by Sumon Mahmud
and published by Jamana Publications Ltd.,
Contact:+8802226663757, +8801337-105305
Price : BDT. 480.00Tk; USD : 8.00$,
www.jamanagroup.com

ISBN
978-984-99885-1-9

উৎসর্গ

আমার সে প্রিয় সন্তানকে যার অন্ধত্ব দুর্বলতা নয়- বরং ভেতরের দৃষ্টির শক্তি, ধৈর্য ও আলোর আরেক রূপ। তোমার জীবন আমাকে শিখিয়েছে- চোখ বন্ধ থাকলেও মানুষ আলো হারায় না, আলো যদি হৃদয়ের মধ্যে জ্বলে।

প্রকাশকের বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জ্ঞান, ইতিহাস ও সভ্যতার ধারাবাহিক অভিযাত্রায় কিছু গ্রন্থ কেবল তথ্যের ভাণ্ডার নয়, বরং চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। “ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম” (আব্বাসি হতে মেলোনি) তেমনই একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ, যা পাঠককে ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিমদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় নিয়ে যায়। মুসলিম আগমন, শাসন, উত্থান-পতন, হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সমকালীন বাস্তবতার এক গভীর বিশ্লেষণ এতে ফুটে উঠেছে।

ইতালিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত, সে ভূখণ্ডে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম সমাজের বিকাশ, অবদান, সংগ্রাম এবং সম্ভাবনার বহু অজানা অধ্যায় আজও বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে যথাযথভাবে আলোচিত হয়নি। গ্রন্থটি সেই শূন্যতা পূরণের একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে মুসলিম উপস্থিতির বহুমাত্রিক প্রভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান, সামাজিক অভিযোজন, অভিবাসী জীবনের বাস্তবতা এবং সমকালীন ইউরোপীয় সমাজে মুসলিমদের অবস্থানড়সবকিছুই এখানে গবেষণালব্ধ তথ্য, গভীর বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্য সূত্রের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কেবল নিজ সমাজ বা রাষ্ট্রকে জানা যথেষ্ট নয়; বরং বৈশ্বিক পরিসরে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন সময়ের দাবি। বিশেষত ইউরোপে ইসলামের অতীত ও বর্তমানকে বুঝতে আগ্রহী গবেষক, শিক্ষার্থী, চিন্তাশীল পাঠক এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য গ্রন্থটি একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

যামানা পাবলিকেশন্স লি. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, ইতিহাস ও সভ্যতাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকের বৌদ্ধিক বিকাশে অবদান রাখার নিরলস চেষ্টা করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় “ইতালিতে

ইসলাম ও মুসলিম” গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটি কেবল কিছু তথ্যই প্রদান করবে না, বরং বিজ্ঞ পাঠকদের মধ্যে নতুন অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করবে এবং ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করার প্রেরণা জোগাবে।

লেখক জনাব সুমন মাহমুদ-এর শ্রমসাধ্য গবেষণা, বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং তথ্য উপস্থাপনার আন্তরিকতার জন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একইসঙ্গে গ্রন্থটির প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, এই গ্রন্থটি যেন জ্ঞানান্বেষী পাঠকদের জন্য কল্যাণকর হয়, সত্য ও ইতিহাস অনুসন্ধানে নতুন দিশা প্রদান করে এবং বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও মুসলিম অধ্যয়নের পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করে।

প্রকাশক

ড. মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
চেয়ারম্যান, যামানা পাবলিকেশন্স লি.
ঢাকা, বাংলাদেশ

অভিমত

“ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম” (আব্বাসী যুগ থেকে মেলোনি পর্যন্ত)-সুমন মাহমুদের রচিত ইউরোপের ইসলামি ইতিহাস গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী সংযোজন। লেখক ইতালীয় উপদ্বীপে ইসলামের দীর্ঘ এবং প্রায়শই উপেক্ষিত ইতিহাসকে শৈল্পিক বর্ণনা সুস্পষ্ট ও গভীরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ৮২৭ থেকে ১০৯১ সালের মুসলিম শাসনামলকে কেন্দ্র করে শুরু করে আধুনিক ইতালির জটিল বাস্তবতা পর্যন্ত একটি বিস্তৃত ধারাবিবরণী নির্মাণ করেছেন।

সুমন মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আব্বাসী যুগে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে মুসলিম সম্প্রসারণের ইতিহাস পুনর্গঠিত করেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে এই সময়টি শুধু সামরিক অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং নৈতিকতা, জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশে ছিল পরিপূর্ণ। তিনি এমন এক সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন যা আশা, ভালোবাসা, সংহতি এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ওপর দাঁড়িয়েছিল, এবং যা ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে গভীর অবদান রেখেছিল।

এই গ্রন্থ কঠিন অধ্যায়গুলো থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। সমান অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সুমন বর্ণনা করেছেন ইতালিতে মুসলিম প্রভাবের পতন এবং একসময়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের হারিয়ে যাওয়ার কারণ সমূহ। তবুও তিনি আরেকটি অসাধারণ সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন-১৬০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলোতে যখন ইসলামি উপস্থিতি ক্ষীণ এবং প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল, তখনও মুসলিম সম্প্রদায়গুলো নীরবে তাদের পরিচয়, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি সংরক্ষণ করে রেখেছিল, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে।

আধুনিক যুগে এসে লেখক দেখিয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত নতুন মুসলিম অভিবাসীরা ইতালির সামাজিক বাস্তবতাকে কীভাবে নতুন করে রূপ দিয়েছে। ভাষা ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যময় এসব জনগোষ্ঠী আজ ইতালিতে নতুন সম্ভাবনা, নতুন উপস্থিতি এবং নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সুমন চিন্তাশীলভাবে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের উচিত জ্ঞান, ঐক্য এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজেদের মর্যাদা পুনর্নির্মাণ করা এবং ইতালীয় সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

এ গ্রন্থ শুধু একটি ঐতিহাসিক বিবরণ নয়; এটি স্থিতিশীলতা, পুনরুজ্জীবন এবং একটি বিশ্বাস ও তার অনুসারীদের অদম্য চেতনার প্রতিফলন। সুমনের কাজ পাঠকদের মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কেই অতীতকে পুনর্বিবেচনা করতে, বর্তমানকে বুঝতে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও যৌথ অগ্রগতির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে আহ্বান জানায়।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা সুমনকে তাঁর নিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা ও আন্তরিকতার জন্য বরকত দান করুন। তাঁর প্রচেষ্টা যেন মনকে আলোকিত করে, হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে এবং বৃহত্তর বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। আমিন। আশা করি তাঁর জ্ঞানসেবার এই যাত্রা সফলতা, প্রজ্ঞা এবং আরও নতুন অবদানে সমৃদ্ধ হবে।

গভীর শ্রদ্ধা ও অন্তরের প্রশংসা সহকারে, আমি এ গ্রন্থের জন্য এ ভূমিকা পেশ করছি, যা বিদ্যাচর্চা ও সাধারণ বোঝাপড়া উভয়কে সমৃদ্ধ করবে।

ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
প্রেসিডেন্ট, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সূচিপত্র

ইতালিতে মুসলিম শাসনের ক্রমানুসার (৮২৭-১০৯১ খ্রি.)	২১
জীবনীমূলক তালিকা	২৩
ইসলামের পদচিহ্ন	২৫
শাসনের বিন্যাস ও মুসলিম শক্তির উত্থান	৫২
নতুন দিগন্তের সূচনা	৭০
অস্থিরতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব	৯১
ইতিহাসের মোড় ঘোরা সময়	১০২
মুসলিম সমাজের রূপান্তর	১১৫
নতুন শাসনব্যবস্থার উত্থান ও অভিযোজন	১১৯
আফ্রিকার মাটিতে নর্মান শাসনের বিস্তার	১২৩
মুসলিম স্বায়ত্তশাসনের পতন ও জাতিগত নিধন	১৩৩
ক্ষমতা, আনুগত্য ও নিঃসঙ্গতার প্রতীক	১৪৩
সহাবস্থান ও বিলুপ্তির গল্প	১৫৪
মুসলিম সমাজের অন্তিম দিনগুলো	১৬০
আলো আর অন্ধকারের সংযোগবিন্দু	১৮১
বিস্মৃত পাঁচ শতাব্দী	১৯২
হারানো ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার	২১২
পুনর্জাগরণ ও নতুন সংলাপ	২২২
নিভৃতে বেঁচে থাকা বিশ্বাসের কাহিনি	২৩৮
একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম ইতালিয়ান	২৬১
বাংলাদেশি অভিবাসী জীবনের নতুন ইতিহাস	২৮৩
ইতালিয় মুসলিম তরুণদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ	২৯৭
করণীয় ও নীতিনির্ধারণের নতুন দিকনির্দেশনা	৩১১
Books and Primary Sources	৩২৪

[ইতালির সিসিলিতে মুসলিম শাসনকে চিত্রায়িত করা মানচিত্রটি দেখায় যে, দ্বীপটি কেবল এক স্থানীয় অঞ্চল নয়; বরং পশ্চিমী ভূমধ্যসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে মুসলিম শাসকদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। মানচিত্রের বিভিন্ন দিকে গ্রিন বা হালকা রং দ্বারা মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বিশেষভাবে পালার্মো ও মাজারা শহরগুলো হাইলাইট করা হয়েছে, যা দ্বীপের রাজধানী ও প্রধান বন্দর হিসেবে গুরুত্ব বহন করত। এ ছাড়াও মানচিত্রে বাইজান্টাইন শাসনের অবক্ষয় এবং পরবর্তী খ্রিষ্টান নর্মান আক্রমণগুলো তিরচিহ্ন বা অন্য চিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, যা সিসিলির "প্রথম রিকনকুইস্তা"-র সময়কালের ধারাবাহিকতা বোঝায়। সমুদ্রপথ ও আশেপাশের দ্বীপগুলোও প্রদর্শিত, যা মুসলিম শাসনাধীন সিসিলির ভূমধ্যসাগরের নৌপথ ও বাণিজ্যিক গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। মানচিত্রটি পাঠককে সহজে বুঝতে সাহায্য করে যে, সিসিলির মুসলিম শাসন কেবল রাজনৈতিক দিক থেকে নয়; বরং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ক্রমান্বয়ে নর্মানদের আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সময়কালের জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র ফুটে ওঠে।]

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আর-রোম-এ ঘোষণা করেছেন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الم

غُلِبَتِ الرُّومُ

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

[অর্থ: "রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে। তবে তারা তাদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় লাভ করবে। আল্লাহরই হাতে সিদ্ধান্ত, আগে ও পরে। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।"]

"রোম" মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক মহিমান্বিত অধ্যায়। প্রাচীন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, খ্রিষ্টীয় ইউরোপের বিস্তার, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্র–সব মিলিয়ে রোম এক অনিবার্য নাম। কিন্তু মুসলিমদের কাছে রোম শুধু একটি শহরের নাম নয়; এটি কুরআনের আয়াতে অমর হওয়ার পাশাপাশি রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও আলো ছড়িয়েছে, আর ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সূরার নামই আর-রোম।

প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত "রোম" বা "রোমান" কারা? রোম নামে একটা শহর আছে যা আধুনিক ইতালির রাজধানী এবং "রোমানিয়া" নামেও একটা দেশ আছে, যা পূর্ব ইউরোপের অন্যতম দেশ। যারা প্রারম্ভিক পাঠক তারা অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে জটিলতায় পড়ে যান। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগেই উক্ত জটিলতা নিরসন করা একান্ত আবশ্যক।

ইবনে কাসির বলেন, ঈসা ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বংশধরদেরকে "রোম" বলা হয়। তারা বনি ইসরাঈলদের চাচাতো ভাইদের গোষ্ঠী। বস্তুত আরবদের ভাষায় "রোম" বলতে দুটি সম্প্রদায় থেকে উত্থিত এক বিরাট জাতিকে বোঝায়। একদিকে গ্রিক, শ্লাভ সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান, অপরদিকে লাতিন ভাষাভাষী ইতালিয়ান "রোমান"–যারা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের মিশ্রণে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। যার কিছু অংশ ইউরোপে আর কিছু অংশ এশিয়া মাইনরে। এই পুরো মিশ্রিত জাতিটাকেই আরবরা

“রোম” জাতি নামে অভিহিত করত। তবে মূল ল্যাটিন রোমানরা সব সময় স্বতন্ত্র ছিল। তাদেরকে ‘বনুল আসফার’ বা “হলুদ রঙের” সন্তানও বলা হয়। তারা গ্রিকদের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল। আর গ্রিকরা সাতটি বিখ্যাত তারকার পূজারি ছিল। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৩০০ বছর (মতান্তরে ৩২২ বছর) পর্যন্ত রোমরা গ্রিকদের ধর্মমতের ওপরই ছিল। তাদের রাজত্ব শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ জাজিরা তথা আরব সাগরীয় উপদ্বীপের এলাকাসমূহে বিস্তৃত ছিল। এ অংশের রাজাকে বলা হতো “কায়সার”। তাদের রাজাদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি খ্রিষ্টান ধর্মে প্রবেশ করে সে হচ্ছে সম্রাট কন্সটান্টাইন ইবনে অগাস্টি। তার মা তার আগেই খ্রিষ্টান হয়েছিল। সে তাকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করে। তার সময়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। পরস্পর বিরোধিতা এমন পর্যায় পৌঁছেছিল যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব ছিল না। তখন ৩১৮ জন ধর্মীয় নেতা একত্রিত হয়ে কন্সটান্টাইনের জন্য এক প্রকার আকিদা বিশ্বাসের ভিত রচনা করে দেয়। যেটাকে তারা “প্রধান আমানত” বলে অভিহিত করে থাকে। বস্তুত তা ছিল নিকৃষ্টতম খিয়ানত। আর তারা তার জন্য আইনের বই রচনা করে। যাতে প্রয়োজনীয় হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করে নেয়।

এভাবে তারা মসিহ ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করে নেয়, তাতে কোথাও বাড়িয়ে নেয় আবার কোথাও কমিয়ে নেয়। আর তখনই তারা পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করা আবিষ্কার করে, শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে সম্মানিত দিন ঘোষণা করে, ক্রুশের ইবাদত চালু করে, শূকর হালাল করে দেয়, নতুন নতুন ঈদের প্রচলন করে, যেমন ক্রুশ দিবসের ঈদ, কাদাস বা পবিত্র ঈদ, গাতাস ঈদ ইত্যাদি। তারা এর জন্য “পোপ” সিস্টেম চালু করে । যে হবে তাদের নেতা। পোপের নিচে থাকবে বাতারেকা (কার্ডিনেল), তার নিচে মাতারেনা, তার নিচে উসকুফ (বিশপ)ও কিসসিস (পাদরি), তার নিচে শামামিছাহ (ডিকন)। তা ছাড়া তারা “বৈরাগ্যবাদ” প্রথা চালু করে। বাদশাহ তখন তাদের জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে গির্জা ও উপাসনালয় তৈরি করে দেয়। আর তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এক নগরীর পত্তন করে তার নাম দেওয়া হয় “কন্সটান্টিনোপল”। বলা হয়ে থাকে যে, সে তার রাজ্যে ১২ হাজার গির্জা তৈরি করে। বেথেলহেমে তিন মিহরাব বিশিষ্ট উপাসনালয় তৈরি করে। তার মা তৈরি করে “কুমামাহ” নামক গির্জা। এ দলটিকেই বলা হয়, “আল-মালাকিয়্যাহ”, যারা বাদশার দলভুক্ত লোক। তারপর তাদের থেকে “ইয়াকুবিয়্যাহ” সম্প্রদায় বের হয়। যারা ছিল ইয়াকুব আল-ইসহাকের অনুসারী। তারপর তাদের থেকে বের হয় “নাসতুরীয়্যাহ” সম্প্রদায়–যারা

নাসতুরা-এর অনুসারী ছিল। তাদের দলের কোনো কূলকিনারা নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে”। মোটকথা তখন থেকে সে দেশের রাজারা খ্রিষ্টান ধর্মমতের ওপর ছিল। যখনই কোনো কায়সার মারা যেত, তার স্থানে অন্য কায়সার আসত। অবশেষে যে ছিল তার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস।

এ মিশ্রিত জাতির অর্থাৎ গ্রিক শ্লাভ ও এশিয়া মাইনরের জাতিদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যে নব্য রোমান সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সাথে মূল ইতালিয়ান রোমানদের সংযুক্তির কারণ হচ্ছে, সম্রাট ইউলিয়ুস তার দিগ্বিজয়ী আগ্রাসনে ইতালিয়ান রোমান এলাকা থেকে বের হয়ে এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চল যেমন: ইরাক ও আর্মেনিয়া, অনুরূপভাবে মিশর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। অন্যদিকে শ্লাভদের এলাকাসহ বসফরাসের তীরবর্তী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মসিহের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগে আলেক্সান্ডারের সময় পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সম্প্রদায় আশেপাশের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে এক রাষ্ট্র অভিহিত হতো। আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আলাদা হয়ে যায় এবং ইতালিয়ান রোমানদের অধীনে চলে যায়। তখন থেকে ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিল। তারপর সম্রাট কন্সটান্টাইন যখন কায়সার (সিজার) হন, তখন তিনি তার রাষ্ট্রকে আরও বিস্তৃত করেন এবং পুরো সাম্রাজ্যকে দু-ভাগে ভাগ করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে ইতালিয়ান “রোম” নগরীকে বাছাই করেন। আর পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের সাথে মিলিয়ে এক শহর পত্তন করেন। যার নাম দিলেন কন্সটান্টিনিয়্যাহ (বর্তমান ইস্তাম্বুল)। তিনি এমনভাবে এ শহরটির পিছনে শ্রম দেন যে, তার প্রসিদ্ধি ও সুনাম ইতালিয়ান রোম নগরীকে ছাড়িয়ে যায়। ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর পুরো রাজ্যটি তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হয়। তখন এ পূর্বাংশ যা রোম দেশ নামে খ্যাত হয় তা তার সন্তান কন্সটান্টিনোস এর করায়ত্তে আসে। তখন থেকে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রাষ্ট্রকে বলা হতে লাগল রোম সাম্রাজ্য। আর রোমা বা রোম নগরী ইতালিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের অধীন থেকে গেল। কিন্তু তখনও রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে যায়নি। তারপর ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োদিসিয়োস তার দুই পুত্রের মধ্যে পুরো রোমান সাম্রাজ্যকে দু-ভাগে ভাগ করে দেন– পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্র। তখন থেকে পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ‘বিলাদুর রোম’ বা রোম সাম্রাজ্য নামে খ্যাতি লাভ করে। যার রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল। ইউরোপিয়ানরা এ রাষ্ট্রকে বাইজেন্টাইন রাষ্ট্র নামেই অভিহিত করত। (মূল ইতালি ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে

বোঝার সুবিধার্থে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শাম (সিরিয়া ও লেবানন) ও ফিলিস্তিন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তখনকার রাজার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে তখনকার দিনের অপর শক্তিমান রাষ্ট্র পারস্যের রাজা খসরু ইবনে হুরমুজের যুদ্ধে যখন পারসিকরা তাদের ওপর জয়লাভ করে এবং ইন্তাকিয়া ও দামেশক পারসিকদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

উপরোক্ত আয়াত কেবল এক যুদ্ধের ইতিহাস নয়; বরং আল্লাহর কুদরতের সাক্ষ্য। মুসলিম উম্মাহর জন্য এটি ছিল আশার প্রতীক-পরাজয় সত্ত্বেও বিজয় আসবেই, কারণ জয়-পরাজয়ের মালিক কেবল আল্লাহ। ইসলামের ইতিহাসে রোম তাই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একটি নির্ধারক অধ্যায়। মুসলিমদের বিজয়-পরাজয়, সংস্কৃতির বিনিময় এবং সভ্যতার সংঘাতে রোম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ইতালি-ইউরোপের হৃদয়, ভূমধ্যসাগরের দ্বারপ্রান্ত। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ইতালি বিশ্ব ইতিহাসের অমোঘ অংশ। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এই ভূমি একদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে মুসলিম নৌবহরের দিগ্বিজয়, দক্ষিণ ইতালির উপকূলীয় অঞ্চল, সিসিলি দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম আধিপত্য-সব মিলিয়ে ইতালি ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় হয়ে আছে।

অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীতে যখন ইসলামি খেলাফত সমুদ্রপথে বিস্তার লাভ করছিল, তখন সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির বিভিন্ন শহর মুসলিম বিজয়ের আওতায় আসে। আরব নৌ-বহরের যাত্রা শুধু যুদ্ধের জন্য ছিল না; তারা নিয়ে এসেছিল জ্ঞান, কৃষি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আলো। সিসিলির মাটিতে মুসলিমদের রেখে যাওয়া স্থাপত্য, কৃষিকাজের নতুন পদ্ধতি, এবং ভাষাগত প্রভাব আজও ইতিহাসবিদদের বিস্মিত করে।

কিন্তু ইতিহাস সব সময় সমানতালে এগোয় না। ক্রুসেড, ইউরোপের রাজনৈতিক জোয়ার-ভাটা এবং অটোমানদের সাথে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুসলিম উপস্থিতিকে ইতালির ভূমি থেকে মুছে দেয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং পরবর্তীকালে খ্রিষ্টীয় ইউরোপের উত্থান মুসলিমদের উপস্থিতি ক্রমেই ক্ষীণ করে দেয়। একসময় যে সিসিলি মুসলিম সভ্যতার আলোকবর্তিকা ছিল, তা পরিণত হয় ইউরোপীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশে।

তবুও ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না। সাম্রাজ্যের পতনের বহু শতাব্দী পর মুসলিমরা নতুন রূপে ইতালিতে ফিরে আসে। এবার তারা বিজেতা হিসেবে

নয়, অভিবাসী হিসেবে। বিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিম বিভিন্ন দেশ থেকে ইতালিতে এসে বসবাস শুরু করেছেন। কেউ এসেছে অর্থনৈতিক কারণে, কেউ রাজনৈতিক আশ্রয়ের খোঁজে, কেউবা যুদ্ধ ও দমন-পীড়নের হাত থেকে বাঁচতে।

এই বইয়ে ইতিহাসের আলোকে আধুনিক ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি, তাদের অবস্থান এবং অবদানকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এটি পাঠকের কাছে হবে ইতিহাসের আয়না, যেখানে একদিকে ইতিহাসের অতীত জ্বলজ্বল করবে, অন্যদিকে ফুটে উঠবে মুসলিম উম্মাহর উপস্থিতি, আশা, সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের দিগন্ত।

আজকের ইতালিতে মুসলিমরা একটি বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে, ইসলামিক সেন্টার গড়ে তুলেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে। একসময় যে রোম মুসলিমদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতীক ছিল, আজ সেই রোমেই আজান ধ্বনিত হয়, কুরআনের তিলাওয়াত শোনা যায়, রমজানের রোজা পালন করা হয়।

তবে এই উপস্থিতি একেবারে চ্যালেঞ্জমুক্ত নয়। ইসলামোফোবিয়া, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, অভিবাসীদের প্রতি বৈরিতা-এসব বাস্তবতা মুসলিমদের জীবনকে জটিল করেছে। তবুও ইতালির সমাজে মুসলিমরা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা তৈরি করছে। ইসলামের পরিচয় এখন কেবল অতীতের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমসাময়িক ইতালির বাস্তবতাও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন প্রেক্ষাপটে "ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম" নামের একটি গ্রন্থ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই বই শুধু অতীতের স্মৃতি নয়; এটি বর্তমানের চিত্র এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাও। ইতিহাস আমাদের শেখায়-যেখানে মুসলিমরা গেছে, সেখানেই তারা রেখে গেছে সভ্যতার আলো। ইতালিও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকের অভিবাসী মুসলিমরাই সেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করছে। এর মধ্যে আরব মুসলিমদের পাশাপাশি একটি বড় অংশ গড়ে তুলেছে বাংলাদেশি ইতালিয়ান। তারা এখন ইতালির সমাজ-অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্মাণশিল্প, ব্যবসা, রেস্টুরেন্ট, ক্ষুদ্র বাণিজ্য থেকে শুরু করে নানা খাতে তাদের শ্রম ও অবদান ইতালিকে সমৃদ্ধ করছে।

আজ তাদের সন্তানরাই ইতালির স্কুলে পড়ে, ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলে, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলছে। ইতালি এখন তাদের জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ। তারা নিজেদেরকে শুধু অতিথি মনে করে না; এই দেশই তাদের মাটি, তাদের স্বপ্নের ঠিকানা।

অন্যদিকে, ইতালিয়ান সমাজও মুসলিমদেরকে একেবারে বহিরাগত হিসেবে দেখছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাধারণ ইতালিয়ানরা মুসলিমদের সঙ্গে মেলবন্ধন গড়ে তুলছে। তাদের উদারতা, সহানুভূতি, আর মানবিকতার পরিচয় নতুন আগন্তুকদের টিকে থাকার সুযোগ দিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতা, মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনুমতি, সামাজিক কার্যক্রমে মুসলিমদের অংশগ্রহণ-এসবই ইতালিয়ান সমাজের উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

এইসব অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও বাস্তবতা মিলিয়েই আজ ইতালিতে মুসলিমদের গল্প লেখা হচ্ছে। একসময় যুদ্ধের ময়দানে যারা মুখোমুখি হয়েছিল, আজ তারা একই সমাজের নাগরিক হয়ে একসাথে বসবাস করছে। অতীতের উত্থান-পতনের ইতিহাস যেন নতুন করে বর্তমানের জীবনে ফিরে আসছে, তবে এবার সহাবস্থানের রূপে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দেখা গেছে, অনেক ইতালিয়ান এখন স্বতঃসিদ্ধভাবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তারা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা রমজানের দিনরাত্রির সৌন্দর্যই অনুধাবন করছেন না, বরং ইসলামের নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, এবং জীবনযাপনের নিয়মাবলি তাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে।

ইতালিয়ানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহের পেছনে রয়েছে একধরনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। আধুনিক জীবনের অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ, এবং মানসিক শান্তির খোঁজে তারা ইসলামের নীতি ও আচার অনুসরণে নিজেকে আবদ্ধ করছেন। অনেক ইতালিয়ান পরিবারের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করছে, নামাজ পড়ছে, রমজান পালন করছে এবং কুরআনের তিলাওয়াত শিখছে।

সাধারণ আধ্যাত্মিক অন্বেষণ ছাড়াও সামাজিক সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে ইতালিয়ানরা ইসলামের জীবনধারায় সংযুক্ত হচ্ছে। একদিকে মুসলিমরা স্থানীয় সমাজে তাদের অবস্থান তৈরি করছে, অন্যদিকে স্থানীয়রা ইসলামের মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

এই সংযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারস্পরিক বিবাহ। অনেক ইতালিয়ান এবং মুসলিম একে অপরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন পরিবার তৈরি করছে। এই সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সীমায় নয়; এটি দুই সংস্কৃতির মধ্যে একধরনের আন্তঃসম্পর্কের উদাহরণ। মুসলিম ও ইতালিয়ান পরিবারের মিলন নতুন প্রজন্মের জন্য একটি বহু সংস্কৃতির পরিচয় তৈরি করছে, যেখানে ইসলামিক মূল্যবোধ, ইতালিয়ান রীতিনীতি এবং সামাজিক সংহতি একসাথে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ইতালির শহরগুলোতে এখন এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায়-মসজিদের চারপাশে স্থানীয় ইতালিয়ানরা উপস্থিত, ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র ও পাঠাগারে তাদের আগ্রহ, এবং সামাজিক উদ্যোগে মুসলিম ও ইতালিয়ানদের অংশগ্রহণ। খাদ্য, পোশাক, ভাষা, শিল্পকলা-প্রতিটি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইসলামের নৈতিকতা ও জীবনযাপন প্রথা ইতালিয়ানদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে, এবং নতুন প্রজন্ম এই সমন্বয়কে প্রাকৃতিকভাবে গ্রহণ করছে।

অতীত যেখানে মুসলিমদের উপস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীক ছিল, আজ সেখানে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে-সহাবস্থানের, পারস্পরিক শ্রদ্ধার, এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের। ইতালিতে মুসলিম ও স্থানীয়দের এই সংযোগ প্রমাণ করছে, যে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়; এটি সমাজের গঠন, সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

গত বছর, যখন আমি মধ্য-ইতালির বলনিয়া থেকে লন্ডন যাত্রা করছিলাম, তখন ইমিগ্রেশনের চেকপোস্টে দেখি কয়েকজন হিজাবধারী তরুণী ইমিগ্রেশনে দায়িত্ব পালন করছেন। এটি শুধু একটি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নয়; বরং একটি শক্তিশালী প্রতীক মুসলিম সমাজ ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তারা এই দেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। চমৎকার ইংরেজিতে আমাকে বুঝালো যে তাদের চোখে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ভিন্নতার দ্বন্দ্ব নেই।

ইতালিতে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা এই নতুন প্রজন্মের মুসলিমরা এই ভূমিকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে দেখে। তারা এখানেই শিক্ষাগ্রহণ করছে, বন্ধুত্ব তৈরি করছে, পেশাগত দক্ষতা অর্জন করছে এবং জীবনের সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছে। তাদের চিন্তা শুধুমাত্র ইতালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এখানেই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। তারা এই দেশকে শুধুমাত্র কাজের স্থান হিসেবে দেখছে না; এটি তাদের পরিচয়, তাদের স্বপ্ন এবং তাদের নিরাপদ আশ্রয়।

এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত জীবন বা অর্থনৈতিক অবদানের সীমায় নেই। এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের প্রতীক। তারা ইতালির সমাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলবন্ধন গড়ে তুলছে এবং সহাবস্থানের এক নতুন ধারা স্থাপন করছে।

ইতালিতে মুসলিমদের প্রাথমিক উপস্থিতি মধ্যযুগে, বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দীতে লক্ষ করা যায়। তখন আরব মুসলিমরা ভূমধ্যসাগরের নৌ-পথ ব্যবহার করে দক্ষিণ ইতালির উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং সিসিলি দ্বীপে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এই সময়টিতে ইসলামিক খেলাফত অর্থাৎ আব্বাসীয় ও

উমাইয়্যাদের প্রভাব ইতালির দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্পেনে আন্দালুসীয় মুসলিম সভ্যতা বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধি এনে দেয়। সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে মুসলিম আমিরাতের শাসন স্থানীয় সমাজের জীবনযাত্রায় নতুন দিক এনে দেয়-কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা, স্থাপত্য ও শিক্ষায় উদ্ভাবন।

সিসিলি ছিল প্রথম স্থান, যেখানে মুসলিমরা শুধু সামরিকভাবে নয়; বরং প্রশাসন, কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তারা কৃষিকৌশল, নতুন ফসল, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্থাপত্যশৈলীর মাধ্যমে স্থানীয় সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিল। সিসিলি মুসলিম আমিরাতের অধীনে থাকাকালীন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

দক্ষিণ ইতালির অন্যান্য উপকূলীয় শহরগুলো যেমনঃ সালেরনো, পালেরমো, নেপলি, পোপোলিয়া ও বারি-তেও মুসলিম নৌবাহিনী কোথাও পরিপূর্ণভাবে আবার কোথাও আংশিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল বাজার, শিক্ষাকেন্দ্র এবং ছোট শহরগুলোতে প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই প্রাথমিক উপস্থিতি পরবর্তীতে মুসলিম ও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিনিময়ের পথ খুলে দেয়।

তবে মুসলিমদের এই প্রাথমিক আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ক্রুসেড, স্থানীয় খ্রিষ্টান শাসক ও রাজনীতি ধীরে ধীরে মুসলিমদের প্রভাব হ্রাস করে। সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির মুসলিমরা পুনরায় সীমিত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের বস্তু, কৃষি, ভাষা এবং স্থাপত্যের প্রভাব আজও ইতিহাসে সংরক্ষিত।

ইতালিতে মুসলিমদের এই প্রাথমিক উপস্থিতি কেবল সামরিক বিজয় নয়; বরং একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রভাবের সূচনা, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুসলিমদের পুনরাবির্ভাব ও আধুনিক অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের ধারাকে সংযুক্ত করে। ইউরোপে মুসলিম বসতি স্থাপনের ইতিহাস বহু শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে। এটি কোনো হঠাৎ প্রবাহ নয়; বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফল।

১৫শ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে মুসলিম সাম্রাজ্য বা আঞ্চলিক আধিপত্য কমতে থাকে। তবে অভিবাসন ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ২০শ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ২১শ শতকে মুসলিমদের নতুন ধরনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আরব, তুর্কি, বলকান, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি মুসলিমরা ইউরোপের বড় শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করে।

সেই হিসেবে দেখা যায় যে আজকের দিনে ইউরোপে মুসলিম বসতি কেবল সংখ্যার বিষয় নয়, বরং এটি নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবেরও প্রতীক। মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্মী, শিক্ষার্থী ও উদ্যোক্তা সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাদের উপস্থিতি একটি বহু সংস্কৃতির ইউরোপীয় পরিচয় তৈরি করছে, যেখানে ঐতিহাসিক মুসলিম ও আধুনিক অভিবাসী সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা একত্রিত হয়েছে।

ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি নিয়ে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করা। এই বইটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ইতিহাস ও বাস্তবতার সমন্বয়ে রচনা করা হয়েছে। আমার এই গবেষণার মাধ্যমে পাঠক জানতে পারবেন, কীভাবে মুসলিম সম্প্রদায় ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, কখন ও কীভাবে তারা ইতালিতে বসতি স্থাপন করেছিল, এবং তাদের প্রভাব সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে কীভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণার আরেকটি লক্ষ্য হলো বর্তমান প্রজন্মের মুসলিমদের অবস্থান ও অবদানকে সামনে আনা। আজকের দিনে আরব, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, আফ্রিকার সেনেগাল ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় ইতালির বিভিন্ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে-অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। তাদের উপস্থিতিও কেবল সংখ্যার বিষয় নয়; এটি সমাজে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রভাবের প্রতিফলন।

এই গবেষণা পাঠককে দেখাবে কীভাবে অতীতের মুসলিম উপস্থিতি এবং আধুনিক অভিবাসনের সংমিশ্রণ ইতালির সমাজকে পরিবর্তন করছে। পাশাপাশি এটি মুসলিম ও ইতালিয়ানদের পারস্পরিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক মিলন এবং সমন্বয়ের গুরুত্বও ফুটিয়ে তুলবে।

গবেষণার আরেকটা দিক হলো-ইতালিতে মুসলিমদের ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে সঠিক তথ্য প্রদান। এটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বোঝার পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজে মুসলিমদের ভূমিকা ও উপস্থিতিকে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এটি শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং সাধারণ পাঠকের জন্য একটি তথ্যভিত্তিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা ইসলামের ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া ও সামাজিক সংযোগের প্রেক্ষাপটকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে।

গবেষণার আরেকটি বিষয়কেও সামনে নিয়ে আসা হয়েছে যেটা বাংলাদেশিদের ইতালিতে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে বিশ্লেষণ করা। বর্তমানে ইতালি ইউরোপে বাংলাদেশিদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসনস্থল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের পরই ইতালি বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় অভিবাসন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কয়েক লাখ বাংলাদেশি ইতালির বিভিন্ন শহরে শ্রম, ব্যবসা, শিক্ষালাভ এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছে। তারা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই ইতালিকে সমৃদ্ধ করছে না, বরং সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রাও যোগ করছে।

প্যাশাপাশি বইটি বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভূমিকা ও অবদানের ওপর বিশেষ আলোকপাত করবে। ইতালিতে বাংলাদেশিদের জীবনযাত্রা, তাদের সংগ্রাম, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে ইতালির সমাজে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া-এসবই জ্ঞানের পরিধিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। বইটি অধ্যয়নকালীন সময়ে কখনো পাঠক ইতিহাসের পাঠক হবেন আবার কখনো গল্পের পাঠক হবেন। আবার কোথাও কোথাও বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন।

বইটি রচনায় আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ। বইয়ের একটা অংশে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবন্ধ দিয়ে বইয়ের মানকে আরও সমৃদ্ধ করতে ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারীর ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। একই সাথে বিভিন্ন সময় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ডক্টর আবদুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস। একই সাথে রোম গ্রান্ড মসজিদ, হামজা রবার্তো পিকার্দো, ইউসিসিআই, সিওআরএস, ইব্রাহিম রোমা, জিওভানী মুসলমানি ডি ইতালিয়া, সমাজবিজ্ঞানী আমিন মারুফ, ডক্টর ফাবিলা, সিয়েরা সুবায়েলা, আলজাজিরা ইতালির সিয়ান ও'লেইন, ইসলামিক কমিউনিটি অব বলোনিয়ার ইয়াসিন লাফরাম ও রোমের মাওলানা সাইফুল ইসলামের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে অসংখ্য তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সহযোগিতা পেয়েছি। আর সবচেয়ে যে মানুষটি কাছে থেকে প্রতিনিয়ত আমাকে লেখালেখি চালিয়ে যেতে সহায়তা করছেন সংসারের দায়িত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে-তিনি আমার ইতালীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী, সাইদা পিংকি।

তবে একটি কথা না বললেই নয় বইটির পান্ডুলিপি রচনার আগে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইতালির বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেছি। এ

জন্য ইমেইল করেছি এবং টেক্সট মেসেজের মাধ্যমেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। এমনকি কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জানতে লিখিত প্রশ্নও পাঠিয়েছি। সেসব প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়তো এই বইটির গুরুত্ব আরও অনেক বৃদ্ধি পেত।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেখানে বসবাসরত সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির দায়িত্বশীল পর্যায়ের কারও কাছ থেকেই ন্যূনতম সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি কোনোভাবেই ক্ষোভের নয়; বরং এটিকে আমি সেখানকার মুসলিম কমিউনিটির একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হিসেবেই দেখছি, যা অকপটে স্বীকার করা প্রয়োজন।

আমার বিশ্বাস, উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ভবিষ্যতে সেখানকার মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ ও সংগ্রহে আরও বেশি উদ্যোগী হবেন।

বইটি প্রকাশে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও অতীব প্রিয় মানুষ যামানা পাবলিকেশন্স লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ও প্রকাশক ডক্টর মুহাম্মদ আনোয়ারুল হকের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যিনি বইটি প্রকাশে খুবই উৎসাহের সাথে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁর সফলতা কামনা করি।

অবশেষে দীর্ঘ প্রায় চার বছরের সংগ্রাম, সাধনা, পরিশ্রম ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বইটির পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করলাম। যদিও বইটি রচনার পরিকল্পনা আজ হতে আরও প্রায় সাত বছর আগে নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে আমাকে বহুবার ইতালি যেতে হয়েছে।

সুমন মাহমুদ

৫১ স্কেফিংটন রোড, ইস্টহ্যাম, লন্ডন

ইতালিতে মুসলিম শাসনের ক্রমানুসার (৮২৭-১০৯১ খ্রি.)

আঘলাবিদ আমল (৮২৭-৯১০ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ান থেকে শাসিত

আসাদ ইবনে আল-ফুরাত (Asad ibn al-Furat)–৮২৭ খ্রি. সিসিলি বিজয়ের প্রাথমিক নেতা; সিসিলির প্রথম মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের শুরু হয় মাজারা দেল ভ্যালো উপকূলে।

মুহাম্মদ ইবনে আল-আঘলাব (Muhammad ibn al-Aghlab)–৮২৯-৮৩৫, সিসিলি অভিযানের পর কায়রাওয়ান থেকে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম (Abd Allah ibn Ibrahim)–৮৩৫-৮৫৬, পালেরমো ও অন্যান্য নগরী ধীরে ধীরে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় গভর্নরদের মাধ্যমে শাসন পরিচালিত হয়।

আল-আব্বাস ইবনে আল-ফাযল (Al-Abbas ibn al-Fadl)–৮৫১-৮৬১, পালেরমোর গভর্নর; তাওরমিনা, কাতানিয়া ও সিরাকিউজের আশেপাশের দুর্গ জয় করেন।

আহমদ ইবনে আল-আঘলাব (Ahmad ibn al-Aghlab)–৮৬১-৮৭২, আঘলাবিদ প্রভাব আরও বিস্তৃত হয়; পালেরমো ইসলামি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জুবাইর ইবনে উমর (Zubayr ibn Umar)–৮৭২-৮৯১, আঘলাবিদ শাসনের শেষ পর্যায়; স্থানীয় আমিরদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়।

কালবিদ আমল (৯৪৮-১০৫৩ খ্রি.)

(ফাতিমি খিলাফতের অধীন স্বশাসিত রাজবংশ, রাজধানী: পালেরমো)

আল-হাসান আল-কালবি (al-Hasan al-Kalbi)– ৯৪৮-৯৬, ফাতিমিদ খলিফার নিযুক্ত গভর্নর; সিসিলিতে স্থিতিশীল মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

আহমদ ইবনে আল-হাসান (Ahmad ibn al-Hasan)-৯৬১-৯৭১, পালেরমোতে ফাতিমি প্রশাসন শক্তিশালী করেন।

জাবির ইবনে আল-হাসান (Jabir ibn al-Hasan)–৯৭১-৯৮২, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতি ধীরে ধীরে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

ইউসুফ আল-কালবি (Yusuf al-Kalbi)—৯৮২-৯৯২, দক্ষিণ ইতালি ও ক্যালাব্রিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন।

জাফর ইবনে ইউসুফ (Ja'far ibn Yusuf)—৯৯২-১০১৯, তার শাসনকালেই রাজনৈতিক বিভক্তি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে।

আল-আখল আল-কালবি (al-Akhal al-Kalbi)-১০১৯-১০৩৭, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাইজান্টাইন আক্রমণের মুখে কালবিদ শক্তি ভেঙে পড়ে।

ইবনে আল-থুমনা (Ibn al-Thumna) ও ইবনে আল-হাওয়াস (Ibn al-Hawwās)—১০৩৭-১০৬০, পরবর্তী পর্যায়ে আঞ্চলিক মুসলিম আমিরদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ; বাইজান্টাইন ও নর্মানদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়।

মুসলিম শাসনের পতন (১০৬১-১০৯১ খ্রি.)

রজার প্রথম (Roger I of Normandy) ১০৬১ সালে সিসিলি আক্রমণ শুরু করেন। ধীরে ধীরে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত শহরগুলো একে একে পতিত হয়। ১০৯১ খ্রি.-এ নোতো (Noto) পতনের মধ্য দিয়ে সিসিলিতে মুসলিম শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে।

নর্মান শাসনের সূচনা

রজার সক্লাভুস (নর্মান) ১০৯১-১১৩০ মুসলিম জনগণের ধাপে ধাপে প্রান্তিককরণ; মনরেয়াল ও পালার্মোর পতন; নর্মান শাসনের সূচনা।

রজার ২ (নর্মান) ১১৩০-১১৫৪ ফাতিমি সংস্কার বজায় রাখা; আংশিক মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা; প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ।

ফেডরিকো দি সেকেন্দো ১১৯৪-১২৫০ মুসলিম পণ্ডিত ও শিল্পীদের আংশিক রক্ষা; প্রশাসনিক সংস্কার; মুসলিম অবদান সীমিত।

১৪-১৬ শতক ১৩০০-১৬০০ মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমশ সংকুচিত; স্বাধীন প্রশাসন প্রায় অনুপস্থিত; সীমিত কৃষি ও শিল্প কার্যক্রম।

১৬০০-১৮৬১ ১৬০০-১৮৬১ মুসলিম সংখ্যা সীমিত; স্থানীয় ও স্পেনীয় প্রশাসনের অধীনে; সংস্কৃতির অবশিষ্ট চিহ্ন।

ইতালিয়ান ইউনিফিকেশন ও ফ্যাসিস্ট যুগ ১৮৬১-১৯৪৬ মুসলিম সম্প্রদায় সামান্য; সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংহত; সীমিত রাজনৈতিক প্রভাব।

ইতালিয় প্রজাতন্ত্র ও বর্তমান ১৯৪৬-বর্তমান মুসলিম অভিবাসন বৃদ্ধি; শহর ও গ্রামে বসতি; মসজিদ, স্কুল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান; গবেষণা ও প্রকাশনা।

জীবনীমূলক তালিকা

আসাদ ইবনে আল-ফুরাত (৭৫৯-৮২৮)–সিসিলি বিজয়ের প্রথম মুসলিম সেনাপতি ও ধর্মবেত্তা; ইসলামি উপস্থিতির সূচনা করেন।

আল-আব্বাস ইবনে আল-ফাযল (৮৫১-৮৬১)–পালেরমোর গভর্নর; সিসিলির পূর্বাঞ্চল জয় ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন।

আহমদ ইবনে আল-আঘলাব (৮৬১-৮৭২)–আঘলাবিদ শাসক; পালেরমোকে ইসলামি প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বানান।

আল-হাসান আল-কালবি (৯৪৮-৯৬১)–ফাতিমিদ নিযুক্ত প্রথম কালবি গভর্নর; সিসিলিতে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ সূচনা করেন।

ইউসুফ আল-কালবি (৯৮২-৯৯২)–দক্ষিণ ইতালিতে সামরিক অভিযান; খ্রিষ্টান নগরীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেন।

জাফর ইবনে ইউসুফ (৯৯২-১০১৯)–কালবি রাজবংশের শাসক; রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেও প্রশাসন ধরে রাখেন।

ইবনে আল-থুমনা (মৃ. ১০৬২)–সিসিলির শেষ মুসলিম আমিরদের একজন; নর্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠক।

ইবনে আল-হাওয়াস (মৃ. আনু. ১০৬০)–মুসলিম কমান্ডার; সিসিলির দক্ষিণাংশে স্বাধীন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

রজার ও অফ নর্মান্ডি (১০৩১-১১০১)–নর্মান বিজেতা; মুসলিম ও আরব প্রশাসকদের প্রতি সহনশীল নীতি অবলম্বন করেন।

রজার (দ্বিতীয়) অফ সিসিলি (১০৯৫-১১৫৪)–আরবি জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক; মুসলিম পণ্ডিতদের সহায়তায় প্রশাসনিক সংস্কার চালান।

আল-ইদরিসি (১১০০-১১৬৫)–সিসিলি-ভিত্তিক বিখ্যাত ভূগোলবিদ; রজার (দ্বিতীয়)-এর দরবারে বিশ্বমানচিত্র "নুযহাত আল-মুশতাক" প্রণয়ন করেন।

আবদুল্লাহ আল-হাজিব (১১শ শতক)–সিসিলির রাজদরবারের খোঁজা (Eunuch); আরবি শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্কারে অবদান রাখেন।

জাফর আল-নাসির (১১শ শতক)—রজার (দ্বিতীয়)-এর দরবারে মুসলিম খোঁজা প্রশাসক; আরবি ভাষা ও বিজ্ঞানের সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন।

ইবনে হামদুন (১১শ শতক)—আন্দালুস ও সিসিলিতে সক্রিয় মুসলিম সাহিত্যিক; আরবি কবিতা ও দার্শনিক ভাবধারার বিস্তার করেন।

আল-জাজারি (১১৩৬-১২০৬) —যান্ত্রিক প্রকৌশলী ও জ্যামিতিক চিন্তাবিদ; তাঁর আবিষ্কারই পরবর্তীতে ইউরোপীয় শিল্প-প্রযুক্তিতে প্রভাব ফেলে।

মিশেল আমারি (১৮০৬-১৮৮৯)—ইতালিয় ইতিহাসবিদ; Storia dei Musulmani di Sicilia গ্রন্থে সিসিলির মুসলিম ইতিহাস পুনরুদ্ধার করেন।

আলেসান্দ্রো বুসানি (১৯২১-১৯৮৮)—ইসলামবেত্তা ও ভাষাবিদ; ইতালিতে ইসলামি দর্শন, ফারসি ও আরবি সাহিত্য অনুবাদক।

লিওনার্দো ক্যাপোনে (জ. ১৯৪৫)—আধুনিক ইতালিয় ঐতিহাসিক; সিসিলির ইসলামি স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়ে গবেষক।

মাসিমো কাম্পানিনি (Massimo Campanini, ১৯৫৬-২০২০)—বিশিষ্ট ইতালিয় ইসলামবেত্তা; কুরআন, আরব দর্শন ও আধুনিক ইসলামচিন্তা বিষয়ক লেখক।

"The capital is endowed with two gifts, splendor and wealth… the eye is dazzled by all this beauty." — Ibn Jubayr's description of Palermo

ইসলামের পদচিহ্ন

ইতালি[১] যেন এক স্বপ্নীল ভূখণ্ড, ভূমধ্যসাগরের হৃদয়ে প্রকৃতির হাতে গড়া এক অনন্য শিল্পকর্ম, যা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধনে বিশ্বকে মোহিত করে রেখেছে। ইউরোপের দক্ষিণে বিস্তৃত এই দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান অনন্য। আকৃতি অনেকটা লম্বাটে বুট জুতোর মতো, যা তিন দিক দিয়ে সাগরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। পূর্বে এড্রিয়াটিক সাগরের শান্ত নীল জলরাশি এসে ছুঁয়ে যায় ইতালির উপকূল, পশ্চিমে টায়রেনিয়ান সাগর তার অবারিত ঢেউয়ে ছন্দ তোলে, আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের নীলাভ বিস্তার দেশটির প্রাণকে করে তোলে আরও সমুদ্র গন্ধময়। এই তিন সাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপপুঞ্জ বিশাল সিসিলি আর সার্ডিনিয়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে দিয়েছে নতুন মাত্রা।

উত্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মহিমান্বিত আল্পস পর্বতমালা, যেন তুষারঢাকা এক অদম্য প্রাচীর, যা ইতালিকে ইউরোপের বাকি অংশ থেকে পৃথক করে

---

[১] *"ইতালি" নামটির উৎপত্তি প্রাচীন যুগের, যার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় গ্রিক ও লাতিন ভাষায়। লাতিন শব্দ Italia থেকে আধুনিক ইতালির নামের উৎপত্তি। আবার এই Italia এসেছে প্রাচীন গ্রিকদের Italoi (Ἰταλοί) শব্দ থেকে। ইতিহাসবিদদের মতে, Italoi শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরও পুরনো একটি শব্দ থেকে-Viteliu। এই শব্দের অর্থ ছিল "বাছুরের দেশ"। প্রাচীন দক্ষিণ ইতালি ছিল গবাদি পশু পালনের জন্য বিখ্যাত, বিশেষ করে বাছুর গরুর জন্য। লাতিন ভাষার vitulus শব্দও "বাছুর" বোঝাত। এভাবেই ধীরে ধীরে Viteli থেকে Italia আর তারপর আধুনিক Italy নামের বিকাশ ঘটে।*

প্রথমদিকে "Italia" শব্দটি পুরো উপদ্বীপকে বোঝাত না। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে এটি কেবল দক্ষিণ ইতালির নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। গ্রিকরা দক্ষিণ উপদ্বীপের যেসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাদের Italoi নামেই অভিহিত করত। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোমানদের শক্তি ও প্রভাব বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলও রোমান নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন "Italia" শব্দটির বিস্তার ঘটে পুরো উপদ্বীপে। রোমান সাম্রাজ্যের সময়েই "Italia" কেবল ভৌগোলিক নাম নয়; বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ে ইতালি বলতে আমরা ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি আধুনিক রাষ্ট্রকে বুঝি, যার সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও রাজনৈতিক প্রভাব গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তবুও এর নামের পেছনে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কীভাবে একটি সাধারণ কৃষিনির্ভর অঞ্চল ধীরে ধীরে মানবসভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

রেখেছে। এখানেই রয়েছে মাউন্ট বিয়াঙ্কো, মঁতে রোজা, ম্যাটারহর্নের মতো বিশ্ববিখ্যাত শৃঙ্গ, যেগুলো সারা বছর শ্বেতশুভ্র আবরণে মোড়া। ইতালির বুক চিরে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে অ্যাপেনাইন পর্বতমালা, যাকে প্রায়ই দেশটির মেরুদণ্ড বলা হয়। এই পাহাড়শ্রেণি ইতালির হৃদয়ে সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে দিয়েছে, যার ঢালে ছোট ছোট গ্রাম, জলপাই ও আঙুরের বাগান প্রকৃতিকে করেছে আরও জীবন্ত। দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত ভিসুভিয়াস ও এটনা আগ্নেয়গিরি প্রকৃতির অন্য এক নাটকীয় রূপকে উন্মোচন করেছে, যেখানে ধ্বংস আর সৌন্দর্য পাশাপাশি অবস্থান করছে।

ইতালির প্রাণস্রোত হলো তার নদীগুলো। পো নদী, যা দেশটির দীর্ঘতম নদী, উত্তরাঞ্চলের বিস্তৃত সমভূমিকে উর্বর করেছে। এই নদীর তীরবর্তী এলাকা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ইতালির অর্থনীতিকে দিয়েছে ভরসা। তেভেরে নদী, যার তীরে দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক রোম নগরী, ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক চিরন্তন সাক্ষী। এ ছাড়াও আরনো নদী ফ্লোরেন্সকে করেছে সমৃদ্ধ, আর আদিজে, লিরি ও ভলতুর্নো নদী ইতালির ভূপ্রকৃতিকে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় জলরাশি।

প্রকৃতির সৌন্দর্য শুধু পাহাড়-নদী-সাগরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হ্রদগুলোও ইতালির দৃশ্যপটে এনে দিয়েছে অপার্থিব আবেশ। লেক কোমো, লেক গার্দা, লেক ম্যাজিওরে কিংবা ট্রাসিমেনো সবগুলোই যেন প্রকৃতির আঁচলে লুকানো নীল রত্ন, যেখানে আকাশের প্রতিচ্ছবি জলের বুকে খেলে যায় রঙিন কল্পনার মতো।

ইতালি তাই শুধু ভৌগোলিক এক দেশ নয়; বরং এটি প্রকৃতির হাতে আঁকা এক সজীব চিত্রকর্ম। উত্তরের শ্বেতশুভ্র আল্পস থেকে দক্ষিণের রৌদ্রোজ্জ্বল উপকূল, শান্ত হ্রদ থেকে উচ্ছ্বাসী নদী, সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে সবুজ সমভূমি সবকিছু মিলিয়ে ইতালি হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব রূপকথার দেশ। এখানে সকাল মানে পাহাড়ে আলো ঝরে পড়ার কবিতা, দুপুর মানে সাগরের ঢেউয়ের গান, আর সন্ধ্যা মানে আঙুরখেতের সুবাসমাখা নিঃশ্বাস। এ এক ভূমি, যেখানে প্রকৃতি আর সভ্যতা একসাথে বুনে চলেছে সৌন্দর্যের চিরন্তন মহাকাব্য।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশটি প্রকৃতির রঙে রঙিন এক দেশ, যেখানে নীলাভ সাগর, শ্বেতশুভ্র আল্পস, সবুজে মোড়া উপত্যকা আর সূর্যকিরণে দীপ্ত উপকূল মিলেমিশে গড়ে তুলেছে এক অনন্য স্বর্গভূমি। এই ভূখণ্ডের রূপ শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইতিহাসের পাতায়ও এটি হয়ে উঠেছে আলো-অন্ধকারের নাট্যমঞ্চ।

এই ইতালির আকাশে যখন সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে সূর্যের আলো খেলা করছিল, তখনই এখানে এসে পৌঁছেছিল ইসলামের অমলিন আলো, যা নতুন করে রাঙিয়ে দিয়েছিল এই ভূমিকে জ্ঞানের দীপ্তি, সংস্কৃতির সৌন্দর্য আর মানবতার কল্যাণে। সাগরের নীল পথে বয়ে আনা সেই ইসলামের বার্তা এখানে এসে মিলেছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে। ভূমধ্যসাগরের তীরে যখন মসজিদের মিনার থেকে ভেসে উঠেছিল আজানের ধ্বনি, তখন তা মিশে গিয়েছিল সাগরের তরঙ্গে, পাহাড়ের নীরবতায় আর আঙুর বাগানের সুবাসে। ইসলামের সোনালি অতীত ইতালির ভূখণ্ডে শুধু যুদ্ধ ও রাজনীতির নয়; বরং জ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের রঙে ভরিয়ে দিয়েছিল এই দেশকে। সিসিলি দ্বীপের আকাশে ইসলামি সভ্যতার ছোঁয়া আজও প্রতিফলিত হয় প্রাচীন মসজিদ, বাগান আর রাজ-প্রাসাদের দেয়ালে, যেখানে আরব স্থপতিরা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে মানবসৃষ্ট শিল্পের সাথে একাকার করে তুলেছিলেন।

প্রকৃতি যেমন ইতালিকে দিয়েছে অপার রূপ, তেমনি ইসলাম তাকে দিয়েছে আলোকিত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পাহাড়ের দৃঢ়তা, সাগরের উদারতা আর নদীর প্রবাহের মতোই ইসলাম ইতালির ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল জ্ঞানের মুক্তধারা ও সৌন্দর্যের দিগন্ত। প্রাচীন গ্রন্থাগার, জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা কিংবা সংগীত-সাহিত্যের বিকাশ সবকিছুতেই ফুটে উঠেছিল সেই সোনালি ঐতিহ্য, যা আজও ইতিহাসের আলোয় দীপ্ত হয়ে আছে।

ইতালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ইসলামের সোনালি ঐতিহ্য যেন একই রঙে আঁকা দুটি চিত্র, যা পাশাপাশি এসে মানবসভ্যতার ইতিহাসে গড়ে তুলেছে এক অসাধারণ সেতুবন্ধন। এখানে প্রকৃতি ও ধর্ম মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে এমন এক আবহ, যা শুধু অতীতের গৌরব নয়; বরং আজও মানবহৃদয়ে জাগায় সৌন্দর্যের আবেশ আর শান্তির প্রত্যাশা।

ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস মানবসভ্যতার বিস্তারের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের মরুভূমি থেকে শুরু হওয়া বিজয়ের এ আন্দোলন অল্প কয়েক দশকের মধ্যে পূর্বে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর অল্প সময়েই ইসলামি রাষ্ট্র মদিনার সীমানা থেকে বেরিয়ে এসে দামেশক, বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভার মতো নগরীর জন্ম দেয়, যা পরবর্তী সময়ে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়। আরবদের সেনাবাহিনী শুধু তরবারির ঝনঝনানি নিয়ে আসেনি, বরং এনেছিল এক নতুন

সভ্যতার আলোক, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, কৃষি উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকার মরক্কো থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলামি সাম্রাজ্যের পতাকার ছায়ায় আসে এবং আফ্রিকার তীর থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপের অন্তঃস্থলে প্রবেশের পথ খুলে যায়।

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমদের প্রবেশের মাধ্যমে স্পেনে ইসলামিক আন্দালুস[২] ইতিমধ্যে এক শতাব্দী পার করে ফেলেছে। এই দীর্ঘ শাসনকাল ইসলামকে ইউরোপীয় বাস্তবতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদানে রূপান্তর করেছিল। কর্ডোবা, গ্রানাডা, মালাগা, সেভিয়া, টলেডোর মতো শহরগুলো ইসলামি শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইসলাম কেবল রাজনৈতিক শক্তিই ছিল না, বরং ইউরোপীয় সমাজের বুননে একটি সাংস্কৃতিক সূত্রে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু একই সময়ে ইউরোপের আরেক প্রান্তে ইতালির সিসিলি দ্বীপও মুসলিম অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল। ভৌগোলিকভাবে সিসিলি ছিল ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যেন ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সংযোগস্থল। এর দক্ষিণ উপকূল থেকে উত্তর আফ্রিকার উপকূল খুব বেশি দূরে ছিল না। তিউনিশিয়া উপকূলের শহর মাহদিয়া থেকে ইতালির 'মাজারা দেল ভ্যালো' বন্দর প্রায় ১৫০ মাইল দূরে। স্ফাক্স থেকে পালেরমো বা সিরাকুসাও তিন থেকে চার দিনের নৌ-পথের দূরত্বে। যদি অনুকূল বাতাস বইত, তবে মুসলিমদের দ্রুতগতির নৌবাহিনী সহজেই দক্ষিণ ইতালির যেকোনো প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারত। অন্যদিকে আফ্রিকার কার্থেজ ও কাইরোয়ান ছিল মুসলিম নৌ-বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি, যা তাদের সমুদ্রযাত্রাকে নিরাপদ করেছিল।

---

[২] *"আন্দালুস" বলতে স্পেন ও পর্তুগালের সেই অঞ্চলকে বোঝানো হয়, যেখানে প্রায় আট শতাব্দী (৭১১-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাসে একে বলা হয় আল-আন্দালুস। শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটি ভ্যান্ডাল জাতির নাম থেকে এসেছে–Vandalusia থেকে রূপান্তরিত হয়ে Al-Andalus। কারণ, মুসলিম শাসনের আগে এই অঞ্চলে "ভ্যান্ডাল" জাতির প্রভাব ছিল। আবার কারও মতে এটি গ্রিক ও লাতিন উৎস থেকে এসেছে।*

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সেনাপতি তারিক ইবনে জিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালি পেরিয়ে আইবেরীয় উপদ্বীপে প্রবেশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিমরা দ্রুত কর্ডোবা, গ্রানাডা, সেভিল ও মালাগা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে আন্দালুস হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য, চিকিৎসা ও সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগের প্রতীক। ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের অবসান হলেও আন্দালুস আজও মুসলিম সভ্যতার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয়।

অন্যদিকে, ইতালি উত্তর দিকে ছিল কনস্টান্টিনোপল-নিয়ন্ত্রিত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। বাইজান্টাইনরা একসময় শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী হলেও নবম শতকের শুরুতে তাদের শক্তি ক্রমেই ক্ষয় হচ্ছিল। বারবার আরব নৌ-আক্রমণ, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং স্থানীয় জনগণের অসন্তুষ্টি মিলিয়ে বাইজান্টাইনদের কর্তৃত্ব ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে উঠেছিল। এই সুযোগেই মুসলিমরা ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি নতুন কেন্দ্র তৈরি করার সম্ভাবনা দেখতে পেল।

ইতালি জয়ের সূচনা হয় ৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে, স্পেন বিজয়ের ঠিক ১১৬ বছর পর। বাইজান্টাইন জেনারেল ইউফেমিয়োস, যিনি সম্রাটের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন, উত্তর আফ্রিকার আঘলাবীয় শাসকের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। আঘলাবীয়রা তখনকার দিনে উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি ছিল, তাদের রাজধানী কাইরোয়ান এবং প্রধান নৌঘাঁটি মাহদিয়া থেকে সহজেই সিসিলির দিকে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল। মুসলিম বাহিনী প্রথমে 'মাজারা দেল ভ্যালো' উপকূলে অবতরণ করে[৩]। এখান থেকে ধীরে ধীরে তারা দ্বীপের শহরগুলো একে একে অধিগ্রহণ করতে শুরু করে ৮৩১ সালে মুসলিম বাহিনী পালেরমো, ৮৭৮ সালে সিরাকুসা এবং ৯০২ সালের মধ্যে সিসিলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

এভাবে উত্তর আফ্রিকার উপকূল থেকে সিসিলির মধ্যে তৈরি হলো এক নতুন সামুদ্রিক সেতুবন্ধন। আন্দালুসের মুসলিম শাসনের প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলাম এবার ইউরোপের অন্য প্রান্তে গভীর পদচিহ্ন আঁকল। সিসিলি হয়ে উঠল ইসলামি বিশ্বের জন্য কৌশলগতভাবে এক মহামূল্যবান দ্বীপ যেখানে থেকে তারা একদিকে আন্দালুস, অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকা, আবার অন্য প্রান্তে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বাইজান্টাইন ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করতে পারল।

---

[৩] মাজারা দেল ভ্যালো (Mazara del Vallo) ইতালির সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থানের কারণে শহরটি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ফিনিশীয়, গ্রিক, রোমান, আরব, নর্মান—প্রায় সব শাসকগোষ্ঠীরই এখানে প্রভাব পড়েছে।

আধুনিক মাজারা দেল ভ্যালো বর্তমানে প্রধানত মৎস্যশিল্পের জন্য খ্যাত। এটি ইতালির অন্যতম বৃহৎ মাছ ধরার বন্দর এবং শহরে উত্তর আফ্রিকার অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বড় কমিউনিটি রয়েছে। সেই কারণে এখানে এখনও আরব-মুসলিম সংস্কৃতির ধারা কিছুটা জীবন্ত রয়েছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমকালীন অভিবাসনের কারণে মাজারা দেল ভ্যালোকে অনেক গবেষক ইতালির "মুসলিম অতীত" এবং বর্তমানের বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতার মিলনস্থল হিসেবে অভিহিত করেন।

এটি ছিল ইসলামের বিজয়ের সেই বিস্তৃত চিত্রেরই অংশ, যেখানে আরব উপকূল থেকে শুরু করে আফ্রিকার মরক্কো, এশিয়ার সিন্ধু, ইউরোপের আন্দালুস এবং ইতালির সিসিলি পর্যন্ত ইসলামের পতাকা একের পর এক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। ইসলাম আর কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধর্ম বা সংস্কৃতি নয়; বরং তখনকার ইউরোপীয় ভূগোলের অংশ হিসেবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছিল।

ভূমধ্যসাগরের মাঝে অবস্থিত এ দ্বীপটি ছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে সহজগম্য, একই সঙ্গে কৃষি, বাণিজ্য ও সামরিক কৌশলের জন্য অপরিসীম গুরুত্ববহ। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই আরব মুসলিম নৌবাহিনীর কমান্ডাররা সিসিলির উপকূলে ছোট ছোট অভিযান চালাতে থাকে, উদ্দেশ্য ভীতিমূলক পরিস্থিতি তৈরি করা। ভীতি সঞ্চারমূলক এই সকল অভিযান কিন্তু ধীরে ধীরে রূপ নেয় এক দীর্ঘস্থায়ী জয়ের প্রস্তুতিপর্বে। আরব মুসলিমরা দেখতে পায় যে ইতালির সিসিরি কেবল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ নয়; বরং ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক পথের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং এ দ্বীপের বিজয় মানে শুধু সামরিক সাফল্য নয়; বরং সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। একই সাথে ইউরোপের ঠিক পেটের ভিতর ঢুকে যাওয়া। যেখান থেকে ইসলামের সোনালি বাণী উত্তরে, আরও উত্তরে প্রসারিত হয়ে উত্তর সাগর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে মুসলিমদের ভূগোলচর্চা ছিল জ্ঞান ও সভ্যতার এক অনন্য দিক। ইসলামি ওই স্বর্ণযুগে ভূগোল কেবল মানচিত্র আঁকার সীমায় আবদ্ধ ছিল না, বরং ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্য, নৌ ও সড়ক পথে হজযাত্রা ও রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে জানার তাগিদ, হজযাত্রার প্রয়োজন, বাণিজ্যের বিস্তার এবং সামরিক অভিযাত্রা সবকিছুই মুসলিমদের ভূগোল জ্ঞানে অসাধারণ সমৃদ্ধি এনে দেয়। মুসলিম ভূগোলবিদরা পৃথিবীকে গোলাকার মনে করতেন এবং তাদের ধারণা ছিল পৃথিবীর ভূমি, জল, নদী, সমুদ্র ও আবহাওয়া সম্পর্কে বেশ সুনির্দিষ্ট।[৪]

এটা ঠিক যে ইসলাম সপ্তম শতকে উত্তর আফ্রিকায় প্রাথমিক বিস্তারের অংশ হিসেবে ইতালিতে আসেনি। বরং নবম শতকের শুরুতেই, এবং যথেষ্ট দীর্ঘ

---

[৪] *আল-ইদ্রিসি: সিসিলির নর্মান রাজা রজার দ্বিতীয়ের দরবারে আল-ইদ্রিসি একটি বিখ্যাত ভৌগোলিক গ্রন্থ ও মানচিত্র প্রণয়ন করেন, যার নাম "নুযহাত আল-মুশতাক ফি ইখতিক আল-আফাক" (The Book of Roger)। তিনি পৃথিবীকে সাতটি জলবায়ুগত অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন এবং তার মানচিত্রে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেকখানি অঞ্চল যথেষ্ট নির্ভুলভাবে অঙ্কিত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, তার মানচিত্রে উত্তর নিচে এবং দক্ষিণ ওপরে ছিল, যা পরবর্তীকালের ইউরোপীয় মানচিত্র থেকে ভিন্ন।*

পরিকল্পনার পর, ইতালির সিসিলিতে প্রথম পা রাখে ইসলাম। ৮১৭ থেকে ৮৩৮ সাল পর্যন্ত শাসনকর্তা তৃতীয় আঘলাবীয় আমির, জিয়াদাত আল্লাহ (প্রথম), তার সৈন্যবাহিনী সিসিলিতে অবতরণ করান। আঘলাবীয় রাজবংশকে খলিফা হারুন আল-রশিদ (৭৮৬-৮০৯) আফ্রিকার প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অনেক আগ থেকেই আব্বাসীয় খলিফা হারুন আল-রশিদ শার্লেমেন ও ক্যারোলিঞ্জীয় রাজবংশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি হয়তো জ্ঞানের মাধ্যমে সিসিলিকে "অধিকার" করার ধারণা থেকে ৮২৭ সালের জুন মাসে তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন "আসাদ ইবনে আল-ফুরাত", যিনি তখন বয়সে আটষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ প্রবীণ।

আসাদ ইবনে আল-ফুরাত ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ, যিনি ৭৮৮ ও ৭৮৯ সালে বিশিষ্ট ইসলামি ফিকাহশাস্ত্রের[৫] প্রসিদ্ধ ফকিহ মালিক ইবনে আনাসের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলেন এবং 'আল-মুদাওয়ানা'[৬] গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যা মালিকি মাজহাবের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এর আগে তিনি কখনো কোনো সামরিক অভিযানে অংশ নেননি। তাই এই ঘটনাকে কেবল যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং "জিহাদ"-এর ধারণা থেকে বোঝা যায়, যা "আল্লাহর পথে সংগ্রাম"-এর প্রতীক। ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে "জিহাদ" শব্দের আক্ষরিক অর্থকে কেবল "যুদ্ধ" হিসেবে অনুবাদ করা অসম্পূর্ণ ও বিকৃতি, কারণ বহিরাগত সংগ্রাম আসলে "ছোট যুদ্ধ", যার ভেতরে নিহিত থাকে "বড় যুদ্ধ" অর্থাৎ মানুষের নিজের আত্মার নিচু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর জ্ঞানের পুরস্কার অর্জন করতে চায়। এই অর্থে আমরা জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিঃ আল্লাহর পথে অবিরাম সাধনা।[৭]

---

[৫] ফিকহশাস্ত্র হলো ইসলামে আইন ও জীবনবিধির তত্ত্ব ও নিয়মাবলি নিয়ে বিজ্ঞান, যা কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে-সালেহীনের চিন্তা থেকে উদ্ভূত।

[৬] আল-মুদাওয়ানা (আরবিঃ المدونة) ইসলামি আইনশাস্ত্রের (ফিকহ) ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, বিশেষ করে মালিকি মাজহাবের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে ইমাম মালিক ইবন আনাস (৭১১-৭৯৫ খ্রি.)-এর শিক্ষা, মতামত ও ফিকহি সিদ্ধান্তসমূহ তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে। মূলত এটি সংকলন করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য ইবন আল-কাসিম (Ibn al-Qāsim), আর পরে তা সংরক্ষণ ও সম্পাদনা করেন সাহনুন ইবন সাঈদ (Sahnūn ibn Saʿīd, মৃত্যুঃ ৮৫৪ খ্রি.)।

[৭] ইসলামে জিহাদ শব্দের অর্থ হলো সংগ্রাম বা চেষ্টা। এটি শুধু সামরিক যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্তরের কুপ্রবৃত্তি ও পাপের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, ছোট জিহাদ থেকে ফিরে এলে বড় জিহাদের দিকে মনোযোগ দাও। ছোট জিহাদ

সেনাপতি “আসাদ ইবনে ফুরাত” তার বাহিনী নিয়ে ইতালির সিসিলির উদ্দেশে যাত্রার আগে আধুনিক তিউনিসিয়ার সিসা নগরে অবস্থিত ‘রিবাতে’ (আরবিতে রিবাত মানে দুর্গ, রিবাত থেকে আধুনিক রাবাত শব্দের উৎপত্তি, বর্তমান মরক্কোর রাজধানী), যা ছিল এক প্রাচীরঘেরা, আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় জিহাদ কেবল বাহ্যিক যুদ্ধ নয়; বরং জ্ঞানের পথে এক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামও বটে। তিনি বলেছিলেন—

> *“আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আর তাঁর সমকক্ষও নেই! সৈনিকগণ, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমাকে এই দায়িত্ব দেননি; এটি আমার পিতা কিংবা কোনো সম্মানিত পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার নয়, যদিও পৃথিবী তাদের সমকক্ষ আর দেখেনি। কেবল কলমের শক্তিতেই আমি সেই স্থানে পৌঁছেছি, যেখানে আজ তোমরা আমাকে দেখছ। সুতরাং শরীর ও আত্মা সমর্পণ করো জ্ঞানের সন্ধানে; যতটুকু সম্ভব জ্ঞান আহরণ করো, তবে এ-ও জেনে রাখো যে, এর ভার বহন করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে। মনে রেখো, এর মাধ্যমে তোমরা শুধু এ দুনিয়াতেই নয়, পরকালেও পুরস্কৃত হবে।”*

নবম শতকের শুরুতেই মুসলিম অভিযাত্রীরা আফ্রিকা (ইতালিয়ান ইতিহাসে আফ্রিকাকে ইফ্রিকিয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে) থেকে সংগঠিত বাহিনী নিয়ে সিসিলিতে প্রবেশ করে। ৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক অভিযানের সূচনা হয় এবং ধীরে ধীরে সিসিলির দুর্গসমূহ পতন হতে থাকে। মুসলিম বাহিনী ৮৩১ সালে পালেরমো বিজয়ের পর দ্বীপটির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শহরটি দ্রুত এক সমৃদ্ধ ইসলামি নগরীতে রূপান্তরিত হয়, যেখানে মসজিদ, বাজার, বাগান ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পালেরমোর পর সিরাকিউজ, মেসিনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরও পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম শাসনের আওতায় আসে। এ

বলতে বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে, আর বড় জিহাদ হলো নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

নফস মানুষের অন্তরে এমন প্রবৃত্তি, যা প্রায়ই তাকে পাপ, অহংকার, হিংসা, লোভ কিংবা অন্যায়ের দিকে টেনে নেয়। এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা বড় জিহাদের প্রধান লক্ষ্য। নামাজ, রোজা, যাকাত, ধৈর্য, তাকওয়া এবং নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে একজন মুসলিম তার নফসকে দমন করতে পারে।

সুতরাং ছোট জিহাদ বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই হলেও, বড় জিহাদ হলো অন্তরের শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই। ইসলামে এই বড় জিহাদকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন ছাড়া কোনো মুসলিম প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না।

প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘ ও জটিল; শহরভেদে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার গল্প ভিন্ন, কিন্তু পরিণতি এক-ইতালির সিসিলি ইসলামের পতাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

তবে এ বিজয়কে শুধু সামরিক সাফল্যের চশমায় দেখা হলে এর পূর্ণতা ধরা পড়ে না। সিসিলির মুসলিম শাসন আসলে বৃহত্তর ইসলামি জগতের সঙ্গে এ দ্বীপের সংযোগ স্থাপন করে। কৃষিক্ষেত্রে মুসলিমরা নিয়ে আসে মৌলিক পরিবর্তন; স্পেন ও মিশরের আদলে সেচব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, আঁখ, লেবু, কমলা, সুতির মতো ফসলের চাষ শুরু হয়। বাণিজ্যিকভাবে সিসিলি হয়ে ওঠে উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও লেভান্তের[৮] সঙ্গে ইউরোপের যোগসূত্র। জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সিসিলি এখন ইসলামি সভ্যতার আলোকবর্তিকা। এখান থেকে যে জ্ঞান প্রবাহিত হয়, তা পরবর্তী শতকগুলোতে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের বীজ বপন করে।

ইসলামের বিজয়ের যে ধারাবাহিকতা আমরা দেখি আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু করে সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া হয়ে অবশেষে সিসিলি তা কেবল ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ নয়; বরং এক সভ্যতার নিরন্তর যাত্রা। আফ্রিকার তীরে মুসলিম পতাকা যেমন এক নতুন জীবনধারার সূচনা করেছিল, তেমনি এশিয়ার অন্তর্গত পারস্য বা মধ্য এশিয়ায় ইসলামি সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে মিশে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করে। আর ইউরোপের প্রান্তে সিসিলি তার ইতিহাসে হয়ে ওঠে সেই সেতুবন্ধন, যেখানে ইসলামি ঐতিহ্য, খ্রিষ্টীয় শাসন ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের ত্রিমুখী মেলবন্ধন ঘটে। এই দ্বীপের বিজয় তাই ইসলামি সাম্রাজ্যের বৃহত্তর জয়ের আখ্যানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, যেখানে তরবারির শক্তি, কলমের আলোক এবং সভ্যতার স্রোতধারা একত্রিত হয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে।

এই বিজয়ের মাধ্যমে মধ্যযুগে ইতালি এমন এক ইসলামি উপস্থিতির সাক্ষী হয়েছিল, যা ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে, ৮২৭ থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত, ইতালির সিসিলি ও মেজ্জোজর্নোর (দক্ষিণ ইতালি) অন্যান্য অংশে ইসলামের পদচারণা ইতালিকে ভূমধ্যসাগরীয় সমাজে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্থাপন করেছিল, যে সমাজ জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। ইতালিয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও অর্থনীতির যে সমৃদ্ধি আমরা এই সময়ে দেখতে

---

[৮] লেভান্ত বলতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে বোঝায়, যেখানে আজকের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল অন্তর্ভুক্ত।

পাই, তা ইসলামি সম্প্রদায়ের অবদানে আরও বিকশিত হয়েছিল (এবং দক্ষিণ ইতালিতে ইহুদি সম্প্রদায়েরও অবদান ছিল, যদিও ১৪৯২ সালে স্পেন প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার ইহুদিকে রোমের দিকে উত্তরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল)।

মুসলিমদের সিসিলি জয়ের পর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এক জ্ঞানী অভিজাত শ্রেণি, যাদের অনেকেই এমনকি পরবর্তীতে নর্মানদের আগমনের পরও তেরো শতক পর্যন্ত সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। এই শিক্ষিত অভিজাতরা আইনশাস্ত্র বিশেষত মালিকি মাজহাব চর্চাকে বিকশিত করেছিলেন। যদিও হেলেনীয় চিন্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দার্শনিক বিদ্যা (উলুম আল-আওয়াইল) এখানে খুব বেশি প্রসার লাভ করেনি, তবে কবিতা ছিল গভীরভাবে সমাদৃত। পণ্ডিত ও সুফিরা নিজেদের উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশে কবিতাকেই অবলম্বন করতেন। সিসিলির সমাজজীবনের একটি অনন্য চিত্র ফুটে ওঠে ফাতিমীয় দূত ইবনে হাওকাল-এর বর্ণনায়, যিনি দ্বীপটি সফর করেছিলেন:

> *"সমস্ত সিসিলিয়ান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের অভিজাত শ্রেণি তাদের সমাজের ফুল আসলে তাদের আইনজ্ঞদের মধ্যে নিহিত। তারাই বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করে, তারাই চুক্তিপত্র রচনা করে এবং সাক্ষ্য শোনে; তারাই প্রকৃত সাহিত্যিক, তারাই ধর্মীয় উপদেশক।"*

সিসিলির এই আইনগত ঐতিহ্য মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্কের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। একাদশ শতকে সিসিলির আল-মাজারি প্রথম এই নীতি প্রণয়ন করেছিলেন যে মুসলিমরা কোনো অমুসলিম শাসকের অধীনে থেকেও ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে পারে। এই সময় সিসিলি একই সাথে ইতালির অংশ ছিল এবং ইসলামি বিশ্বেরও অংশ হয়ে উঠেছিল।[৯]

রোম সাম্রাজ্যের শক্তি তখন সর্বোচ্চ শিখরে। বহু আগে কার্থেজ (বর্তমান তিউনিশিয়া) নামের মহাশত্রুকে রোমানরা নিজেদের সুবিশাল প্রদেশে গ্রাস করে নিয়েছিল। সেই প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন কেবল কিংবদন্তির আচ্ছাদনে ঢাকা। তবুও সাম্রাজ্যের সূচনার কাহিনি আফ্রিকার নিয়তির সাথে গভীরভাবে জড়িত এই কল্পনা তখনও আকর্ষণীয় ছিল। ভার্জিলের মহাকাব্য এনেইড-এ সেই স্মৃতি সাহিত্যের আকার নেয়, যেখানে উপনিবেশ স্থাপনকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এনিয়াস আর

[৯] "The History of Islam in Italy" (ইতালিতে ইসলামের ইতিহাস)"-Ahmad Gianpiero Vincenzo রচিত একটি অধ্যায়, যা The Other Muslims: Moderates and Seculars বইতে অন্তর্ভুক্ত।

দেবতাদের ষড়যন্ত্রে আত্মহননে বাধ্য হওয়া কার্থেজের রানী ডিডোর করুণ প্রেমগাথা চিত্রিত হয়েছে।

যেমন এনেইড এ বর্ণিত, আফ্রিকা থেকে ইতালির পথে সিসিলি ছিল এক সেতুবন্ধ দ্বীপ। তবে ভার্জিলের সময়েই দ্বীপটি সাম্রাজ্যের সীমানা থেকে দূরে, ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে গ্রামীণ এক পশ্চাৎপদ অঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সিসিলির পশ্চিম বন্দরগুলিতে, যেমন লিলিবাইয়ুম (বর্তমান মার্সালা, সিসিলি) অন্ত্যেষ্টি-শিলালিপির অলংকরণ কিংবা নব্য-পিউনিক উপভাষার মাধ্যমে আফ্রিকান অ-লাতিন উপাদানের ক্ষীণ চিহ্ন টিকে ছিল। ইতালিয় মূলভূমির জন্য দ্বীপটির কৌশলগত গুরুত্ব তখন কমে গিয়েছিল, কারণ রোমানরা ইতিমধ্যেই ভূমধ্যসাগরকে নিজেদের সাগর হিসেবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চম শতকে, ভ্যান্ডাল নৌবহরের আক্রমণে (উত্তর আফ্রিকা-স্পেনভিত্তিক জার্মানিক শক্তি) যখন রোমানদের নিয়ন্ত্রণ টলমল করছিল, তখন উত্তর আফ্রিকার সেই একই উপকূল থেকেই ইতালি ও আশেপাশের দ্বীপগুলোর প্রতি হুমকি শুরু হয়। পূর্ব রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান (মৃত্যু ৫৬৫, রাসূল (সা.) জন্মেও ঠিক পাঁচ বছর পূর্বে তার মৃত্যু হয়) ও তার খ্যাতিমান সেনাপতি বেলিসারিয়াস ভ্যান্ডালদের আফ্রিকান শক্তি চূর্ণ করেন। এর ফলে বাইজান্টাইনরা সিসিলিতে অস্ট্রোগথদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে এবং সেখান থেকে উত্তর ইতালির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু এই বিজয় ছিল স্বল্পস্থায়ী। লমবার্ড (বর্তমান উত্তর ইতালি) ও ফ্র্যাঙ্কদের (বর্তমান ফ্রান্স-জার্মানি) দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণের মুখে ইতালির রাজনৈতিক ভৌগোলিক মানচিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে, এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। এর ভেতর বাইজান্টাইন প্রভাব প্রধানত উত্তর-পূর্বের রাভেন্না (ইতালি), দক্ষিণের আপুলিয়া ও কালাব্রিয়া (দক্ষিণ ইতালি) এবং দ্বীপ সার্ডিনিয়া ও সিসিলিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৬৩০-এর দশক থেকে আরব-মুসলিম বাহিনী বাইজান্টাইন সিরিয়া (দামেশককেন্দ্রিক অঞ্চল) ও মিশরে এবং ৬৪০-এর দশক থেকে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে। মাত্র বিশ বছর পর, অর্থাৎ ৬৫২ সালে, সিরিয়া থেকে সিসিলির বিরুদ্ধে প্রথম মুসলিম অভিযান চালানো হয় মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, হজরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে। এদিকে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তানবুল) তখন মুসলিম শক্তির উত্থান ও দক্ষিণ ইতালিতে প্রথম আক্রমণের ফলে নতুন কৌশল নিতে বাধ্য হয়। সম্রাট কনস্ট্যান্স দ্বিতীয় ৬৬৩ সালে তার রাজধানী সরিয়ে আনেন সিসিলির সিরাকিউজে, এমনকি সাম্রাজ্যের

কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তর করার কথাও ভাবেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরই হত্যার ফলে এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

৬৯৮ সালে মক্কার বিখ্যাত সাহাবি ও মুসলিম কমান্ডার উকবা ইবনে নাফের বাহিনীর কাছে কার্থেজ পতনের পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সীমান্ত সংকোচনের মুখে পড়ে। তখন সিসিলি দ্বীপকে একটি নতুন থিমা (প্রশাসনিক-সামরিক একক) হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যেখানে গভর্নর (স্ট্র্যাটেগোস) একই সাথে বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা ধারণ করতেন।

মুসলিম আরবরা একদিকে আফ্রিকা (বর্তমান তিউনিশিয়া ও আশপাশ) শক্তভাবে দখলে আনে এবং অন্যদিকে আইবেরীয় উপদ্বীপের ভিতর (স্পেন-পর্তুগাল) অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি তাদের চোখে এক কৌশলগত লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যদি এই অঞ্চলগুলো পতিত হতো, তবে ডালমাটিয়া (অস্ট্রিয়া-ক্রোয়েশিয়া) হয়ে বলকান (দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ) পেরিয়ে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত মুসলিম অগ্রগতি কোনোভাবেই থামানো যেত না।

সপ্তম শতকের শেষ থেকে দক্ষিণ ইতালির সিরাকিউজ ও তার আশপাশ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব আদান-প্রদানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লিও তৃতীয় (বাইজান্টাইন সম্রাট) কালাব্রিয়া ও সিসিলির চার্চ রোম থেকে সরিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের অধীনে দেন। এর ফলে সিসিলিতে সন্ন্যাসবাদ ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার বহু বিকাশ ঘটে, যা পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টীয় মতবাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। প্রসঙ্গত, আমার দেখা অদ্যাবধি ইতালির এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মের প্রতি অনুরাগ অন্য অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়।

৭০৪ সাল থেকে শুরু করে ৭৩০-এর দশকে সিসিলি ও সার্ডিনিয়া বারবার মুসলিম আক্রমণের শিকার হয়। অবশেষে ৭৩৯-৪০ সালে সিসিলি আক্রমণের চেষ্টা হয়, যদিও তা ব্যর্থ হয়। পরে ৭৫২-৭৫৩ সালে দুই দ্বীপই জিজিয়া কর প্রদান করা শুরু করে। সার্ডিনিয়া তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও দুর্গম থাকায় আরবদের কাছে আকর্ষণীয় লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সিসিলি ছিল সমৃদ্ধ ও জনবহুল। তাই ৮২৭ সালে সিসিলি আক্রমণ শুরু হলে, সার্ডিনিয়ার প্রতি আগ্রহ প্রায় হারিয়ে যায়।

আব্বাসীয় খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে এক দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা কেবল রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার দিক থেকেই নয়; বরং সাংস্কৃতিক বিকাশ, জ্ঞানচর্চা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং বিশ্ব-সংলগ্নতায়ও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া শাসকদের পতনের মাধ্যমে আব্বাসীয়দের উত্থান ঘটে এবং ১২৫৮ সালে

মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তারা ইসলামি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী শাসক হিসেবে ইতিহাস রচনা করে। তাদের শাসনামলকে যথার্থ অর্থেই ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়, কারণ এই সময়ে ইসলামি সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতির নানা ক্ষেত্রে এমন সব সাফল্য অর্জন করে, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

আব্বাসীয় বিপ্লব উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থেকে জন্ম নেয়। উমাইয়াদের সিরীয় আরবপ্রীতি, মাওয়ালিদের (নওমুসলিমদের) প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং খিলাফতকে বংশানুক্রমে পরিণত করার কারণে আরব ও অ-আরব উভয় মুসলিমের মধ্যে ক্ষোভ জমে ওঠে। বিশেষত পারসিক মাওয়ালিরা উমাইয়া শাসনে নিজেদের অবহেলিত বোধ করত। এই ক্ষোভকে পুঁজি করে আব্বাসীয়রা পারসিকদের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় আরব ও শিয়া গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন আদায় করে। আবু মুসলিম নামের এক চৌকশ পারসিক সেনাপতির নেতৃত্বে এই বিপ্লব সফল হয় এবং ৭৫০ সালে 'যব নদীর যুদ্ধ'-এ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান দ্বিতীয় পরাজিত হয়ে নিহত হন।[১০] এর মাধ্যমে আব্বাসীয়রা নতুন খলিফা বংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তবে শিয়া ও বিদ্রোহীদের প্রত্যাশিত পরিবর্তন সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। আব্বাসীয় খিলাফতও বংশানুক্রমে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে সুন্নি মতবাদের রক্ষক হয়ে ওঠে। শিয়া ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করা হলেও পারসিক সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের প্রতি তারা অনুরাগী ছিল। এই কারণেই তারা রাজধানী দামেশক থেকে সরিয়ে নতুন শহর বাগদাদ প্রতিষ্ঠা করে, যা তাইগ্রিস নদীর তীরে গড়ে ওঠে এবং দ্রুতই বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হয়। বাগদাদকে ঘিরেই আব্বাসীয়দের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

আব্বাসীয় শাসক হারুন আল-রশীদ এবং তাঁর উত্তরসূরি আল-মামুনের যুগ বিশেষভাবে উজ্জ্বল। বাগদাদের খলিফা হারুন আল-রশীদের শাসনামলে বাগদাদ হয়ে ওঠে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র। আর খলিফা আল-মামুন প্রতিষ্ঠা করেন 'বাইতুল হিকমা' বা 'জ্ঞানালয়', যেখানে বিশ্বজুড়ে সংগৃহীত পাণ্ডিত্য সাহিত্য আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। গ্রিক দর্শন, ভারতীয় গণিত, পারসিক

---

[১০] যব নদীর যুদ্ধ (Battle of the Zab) ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় ও উমাইয়া খিলাফতের মধ্যে সংঘটিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। আধুনিক ইরাকের "যব নদীর তীরে" এ যুদ্ধ হয়, যেখানে মারওয়ান দ্বিতীয়ের নেতৃত্বাধীন উমাইয়া বাহিনী পরাজিত হয়। এর ফলেই উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়, যা ইসলামি ইতিহাসে এক নতুন যুগের দ্বার উন্মোচন করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, চীনা কাগজ নির্মাণশিল্প সবই ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে স্থান করে নেয়। এই সময় আল-খাওয়ারিজমি অ্যালজেব্রার (বীজগণিত) ভিত্তি রচনা করেন, ইবনুল হাইসম অপটিক্স ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিকপাল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন, আল-বিরুনি ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনন্য অবদান রাখেন। ভারতীয় অঙ্কপদ্ধতি ইসলামি বিশ্ব হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে।

শুধু বিজ্ঞান নয়, কৃষিক্ষেত্রেও আব্বাসীয়রা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। ভারত থেকে ধান ও তুলা, চীন থেকে সাইট্রাস ফল, আফ্রিকা থেকে জোয়ারসহ নানা নতুন ফসলের প্রচলন ঘটে। উন্নত সেচব্যবস্থা ও চাতাল-চালনা কৃষিকে এগিয়ে দেয়। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্য শুধু নিজস্ব জনগোষ্ঠী নয়, পাশ্চাত্য ইউরোপের ওপরও কৃষি ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে।

তবে বিপুল সাম্রাজ্য পরিচালনা সহজ ছিল না। সময়ের সাথে সাথে প্রাদেশিক গভর্নররা স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনীতে তুর্কি গিলমান বা দাস সৈন্যদের অন্তর্ভুক্তি খলিফাদের সঙ্গে সাধারণ প্রজার দূরত্ব বাড়ায়। অনেক সময় সৈন্যরাই খলিফাকে অপসারণ বা হত্যা করত। দশম শতক নাগাদ খলিফাদের ক্ষমতা কেবল বাগদাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিয়া বুয়াইদি আমির কিংবা সুন্নি সেলজুক তুর্কিরা প্রকৃত ক্ষমতা দখল করে নেয়, আর খলিফারা থেকে যান কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে।

অবশেষে ১২৫৮ সালে হুলাগু (হালাকু) খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলরা বাগদাদ আক্রমণ করে। তারা শহর ধ্বংস করে, খলিফাকে খুন এবং লক্ষাধিক মানুষকে নির্বিচারে কুপিয়ে হত্যা করে। 'বাইতুল হিকমা' র বিশাল গ্রন্থাগার অগ্নিদগ্ধ হয়, জ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার বিলুপ্ত হয়। এর মধ্য দিয়েই বাগদাদভিত্তিক আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটে এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগ হঠাৎ থেমে যায়।

যদিও পরবর্তী সময়ে মিশরে মামলুক সুলতানরা প্রতীকী আব্বাসীয় খলিফা নিয়োগ করে, তাদের ক্ষমতা ছিল কেবল ধর্মীয়। ১৫১৭ সালে অটোমান সুলতান সেলিম প্রথম মিশর জয় করলে আব্বাসীয় বংশের শেষ চিহ্নটিও মুছে যায়। তবুও সাত শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আব্বাসীয়রা যে ঐতিহ্য, জ্ঞান ও সভ্যতার ভান্ডার সৃষ্টি করেছিল, তা কেবল ইসলামি বিশ্ব নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

তবে এর মানে এই নয় যে আব্বাসীয়রা সামরিক শক্তিকে উপেক্ষা করেছিলেন। বরং তারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যেমন বিকশিত করেছেন, তেমনি ভূমধ্যসাগরের

বুকে সামরিক ও নৌবাহিনী প্রেরণ করে ইসলামের দিগন্তও প্রসারিত করেছেন। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ইউরোপের দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অষ্টম ও নবম শতকে মুসলিম বাহিনী উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে সিসিলিতে অভিযান চালায়।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আব্বাসীয় যুগে মুসলিমদের মনোযোগ কেবল যুদ্ধ ও ভূখণ্ড সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তারা সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রাষ্ট্র ও সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সিসিলি বিজয় প্রমাণ করে যে ইসলামি সাম্রাজ্য শুধু তলোয়ার নয়; বরং কলমের শক্তিতেও ভূমধ্যসাগরে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

একদিকে বাগদাদে "বাইতুল হিকমার"[১১] আলোকচ্ছটা বিশ্বকে জ্ঞানের ভান্ডার উপহার দিচ্ছিল, অন্যদিকে ইতালির সিসিলি ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে মুসলিমরা নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করছিল। এভাবেই আব্বাসীয় খিলাফত কেবল ইসলামের স্বর্ণযুগের সাক্ষীই নয়; বরং জ্ঞান ও শক্তির এক অনন্য সমন্বয়ও বটে।

অষ্টম শতকের সময়কালজুড়ে ইসলামি আরব বিশ্বে এক স্বতন্ত্র ধারা দেখা দেয়, যেখানে মুসলিম অভিযানগুলো মধ্য ভূমধ্যসাগরে, বিশেষ করে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একদিকে, বাইজানটাইন ও রোমান সাম্রাজ্যের নতুন দাসশ্রমের প্রয়োজন এবং অন্যদিকে, ঘরের ভেতরের অসন্তোষ প্রকাশ পেলে সাগরের ওপর অভিযানগুলোকে স্থগিত করতে বাধ্য হতো।

এদিকে সাম্রাজ্যের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষোভের মূল কারণ ছিল সপ্তম শতকে আরবদের উত্তর আফ্রিকা বিজয়। বিচিত্র ও পৌত্তলিক এই 'বার্বার' (পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে বর্বর) জনজাতি, যারা মরুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত, আরবরাও তুচ্ছভাবে 'বর্বর' নামে অভিহিত করত, যেমন রোমানরা পূর্বে করেছিল।[১২] তাদের ওপর আরবদের প্রাথমিক জয়ের পরে তারা দাস হিসেবে

---

[১১] এটি শুধু একটি গ্রন্থাগার নয়, বরং গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত। বাইতুল হিকমা ইসলামি জ্ঞানচর্চার সোনালি যুগের প্রতীক হিসেবে মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে।

[12] 'বর্বর' থেকে 'বারবার' শব্দের রূপান্তর একটি আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এটি কেবল ভাষার পরিবর্তন নয়; বরং সংস্কৃতির বিনিময়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। প্রাচীন গ্রিকরা যেসব জাতিকে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে শুনত না, তাদেরকে barbaroi বলে অভিহিত করত। শব্দটির মধ্যে ছিল একধরনের হীনতা ও বিদ্রুপ, যেন তাদের ভাষা কেবল "বার-বার" শব্দের মতো অস্পষ্ট ও অশ্রাব্য। পরবর্তীকালে রোমানরাও একই অর্থে barbarus শব্দ ব্যবহার করে।

উপার্জিত কর বা জিজিয়া প্রদান করত। পরবর্তীতে, বহু 'বার্বার' স্বেচ্ছায় নিয়োগ পায় উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা (মাঘরিব, বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া) ও স্পেনে বিজয়ের জন্য গঠিত সৈন্যবাহিনীতে। ঠিক যেমনটা পরবর্তীতে তুর্কিরা সৈন্যরা নিয়োগ পেয়েছিল সেলজুকদের সৈন্যবাহিনীতে। আরব সেনাবাহিনীতে এই সকল 'বার্বার'দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ইসলাম গ্রহণ তাদের অসম অধিকার মিটাতে যদিও সচেষ্ট হয়নি। তবুও 'বার্বার' আরব গভর্নরদের অধীনে আত্মসমর্পণ না করে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরা নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই 'বার্বার'গোষ্ঠীরা দুই ধারায় বিভক্ত ছিল হুফ্রা ('হলুদ') ও ইবাজা ('সাদা')।

এদিকে ৭৪০ সালে পশ্চিম মাগরিবে আরব ও স্থানীয় 'বার্বার' গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। দীর্ঘদিনের অবদমিত ক্ষোভ একসময় বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে 'বার্বার' নেতা মাইসারা আল-মাগরির নেতৃত্বে, যাকে বিদ্রোহীরা নিজেদের 'খলিফা' ঘোষণা করে। কর আরোপ, দাসত্ব এবং আরব শাসকদের শৃঙ্খল ভেঙে

অর্থাৎ, গ্রিক-রোমান দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সভ্য নয়, ভিন্ন ভাষী, অপরিচিত কিংবা শত্রু, সবাই ছিল "বর্বর।"

ইসলামের বিস্তার ও আরব বিজয়ের ফলে উত্তর আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলে আরবরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে পরিচিত হয়। এরা ছিল প্রাচীন আমাজিঘ বা ইমাজিঘেন জাতিগোষ্ঠী, যারা আজ আমরা "বারবার" নামে চিনি। আরবরা গ্রিক ও লাতিন উৎস থেকে আসা "বর্বর" শব্দটি গ্রহণ করে আরবিভাষায় উচ্চারণ করতে শুরু করে al-Barbar আকারে। সময়ের সাথে উচ্চারণে রূপান্তর ঘটতে ঘটতে "বর্বর" থেকে "বারবার" রূপটি স্থায়ী হয়ে যায়।

কিন্তু এ পরিবর্তনের ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াও কাজ করেছে। ইসলামের মাধ্যমে আরবরা উত্তর আফ্রিকার এ জনগোষ্ঠীর সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। যদিও শুরুতে আরব ইতিহাসকাররাও গ্রিকদের অনুসরণে "বারবার" শব্দটি কিছুটা অবমাননাকর অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, ধীরে ধীরে এই শব্দটি স্থানীয় জাতিসত্তার পরিচয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। "বারবার" বলতে পরবর্তীকালে আর কেবল "অসভ্য" নয়, বরং এক বিশেষ জাতিগত গোষ্ঠী-মাগরেব অঞ্চলের অধিবাসীদের বোঝানো হতে থাকে। আজকের দিনে "বারবার" শব্দটির ব্যবহার অনেক সময় বিতর্কিত। কারণ আধুনিক ইমাজিঘ আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের পরিচয়ের জন্য "আমাজিঘ" বা "ইমাজিঘেন" শব্দটিকে প্রাধান্য দেন। তাদের মতে, "বারবার" নামটি ঔপনিবেশিক যুগের এবং বাইরের দৃষ্টিভঙ্গির চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়, যা আসল আত্মপরিচয়ের বিকৃতি। তবে ইতিহাসের প্রমাণ বলছে, ভাষার বিবর্তন এবং সংস্কৃতির সংযোগের ফলে 'বর্বর' শব্দটি আরবভাষায় রূপান্তরিত হয়ে 'বারবার' নামে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

এখানে আমরা দেখতে পাই, একটি শব্দ কেবল উচ্চারণগত কারণে নয়; বরং ভিন্ন সভ্যতার চোখে অপরকে সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন অর্থ ও পরিচয় পায়। গ্রিকদের "বর্বর" যেভাবে নেতিবাচক অর্থে শুরু হয়েছিল, ইসলামি উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে সেই শব্দই ধীরে ধীরে জাতিগত পরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে।

তারা স্বাধীনতার পতাকা তোলে। বিদ্রোহের ঢেউ ৭৪২ সালে এসে কায়রাওয়ানের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায় এবং উত্তর আফ্রিকায় আরব শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে।

এদিকে ভূমধ্যসাগরের ওপারে সিসিলির দ্বীপ তখন মুসলিম আগ্রাসনের প্রাথমিক ঝাঁকুনির মুখোমুখি হচ্ছিল। প্রথম অভিযানে মুসলিম সেনারা সিরাকিউজে পৌঁছালেও দুর্গ জয় করতে পারেনি। আরবি বর্ণনায় একটি প্রতীকী চিত্র ফুটে ওঠে জনৈক মুসলিম সেনাপতি বিফল অভিযান হতে প্রস্থানকালে দুর্গের দরজায় তলোয়ারের আঘাতে দাগ কেটে রেখে যান, যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার। কিন্তু ৭৫২-৭৫৩ সালে নতুন করে বার্বার বিদ্রোহ দমন করতে বিপুল সৈন্যশক্তি সরিয়ে নিতে হয়, ফলে সিসিলির অভিযান স্থগিত হয়ে পড়ে। এই বিরতিকে কাজে লাগিয়ে বাইজান্টাইনরা দ্বীপের প্রতিরক্ষা জোরদার করে; পাহাড়ি দুর্গ আর প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে ওঠে। আমার দেখা (লেখকের) তাওরমিনার কাছে ক্যাস্টেলমোলা দুর্গের গ্রিক শিলালিপি আজও সাক্ষ্য দেয় যে, কনস্ট্যান্টিন নামক এক বাইজান্টাইন শাসক এর নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তবে সিসিলির পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিরক্ষার পরিধি ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রাচীন সেলিনুন্টের ধ্বংসাবশেষে দেখা যায় তড়িঘড়ি নির্মিত এই দুর্গের প্রাচীরগুলো যা দীর্ঘ অবরোধ টিকিয়ে রাখার জন্য নয়; বরং শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বানানো হয়েছিল।

অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকায় তখন চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার ঝড়। এরই মাঝে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে। আব্বাসীয়দের উত্থান ইসলামি বিশ্বে ক্ষমতার কেন্দ্রকে সিরিয়া থেকে ইরাকে টেনে নেয়। কেন্দ্র দুর্বল হতে থাকায় প্রান্তিক প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়। সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত, আল-আন্দালুসে উমাইয়া বংশধরেরা ৭৫৬ সালে গড়ে তোলে স্বাধীন আমিরাত। এই প্রেক্ষাপটে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক ভূ-চিত্রও আমূল পরিবর্তিত হয়। নতুন প্রজন্মের নেতারা আবির্ভূত হন, যারা একদিকে বার্বারদের দমন করতে চান, অন্যদিকে খলিফার নামে হলেও কার্যত স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে থাকেন।

এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন ইব্রাহিম ইবনে আল-আঘলাব। ৭৯৯ সালে বিদ্রোহ দমন করে তিনি উত্তর আফ্রিকায় নিজের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলেন এবং ৮০০ সালে কায়রাওয়ান দখল করেন। আব্বাসীয় খলিফার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন স্বাধীন শাসক, যিনি নিজের উত্তরসূরিকে ক্ষমতায় বসানোর প্রথা চালু করেন। এভাবেই জন্ম নেয় আঘলাবি আমিরাত, যা উত্তর আফ্রিকার ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে দেয়।

এই রাজনৈতিক পুনর্গঠন সরাসরি প্রভাব ফেলে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির মুসলিম অভিযানে। নবম শতকে আঘলাবি শাসকেরা দ্বীপটিকে কেবল ব্যবসার লক্ষ্যস্থল হিসেবে নয়; বরং একে আরবিকরণ ও ইসলামিকরণের এক পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবেও কল্পনা করতে শুরু করেন। পরিকল্পিত উপনিবেশ স্থাপন, আব্বাসিদের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, বার্বার-বিরোধী মনোভাব এবং বিশ্বস্ত সামরিক নেতাদের নিয়োগ সব মিলিয়ে তারা ইতালির সিসিলিকে নিজেদের নতুন প্রদেশে রূপ দিতে চায়। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে বার্বার সৈন্যরা এ অভিযানে অংশ নেয় বিজিত সম্পদ, ভূমি ও দাস পাওয়ার আশায়। কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমাদের এই অভিযোগ ইসলামের অন্যসব অভিযানের মতই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

এইভাবে উত্তর আফ্রিকার ভেতরের অস্থিরতা, আরব-বার্বার দ্বন্দ্ব ও আব্বাসীয় রাজনৈতিক পুনর্গঠন মিলেমিশে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম সিসিলির সূচনা ঘটায়। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে দেখা যায়, স্থানীয় বিদ্রোহ আর কেন্দ্রীয় খিলাফতের দুর্বলতা একসাথে নতুন সাম্রাজ্য গঠনের পথ খুলে দেয়, যার মঞ্চ হয়ে ওঠে ভূমধ্যসাগরের হৃৎপিণ্ড আজকের আধুনিক ইতালির সিসিলি।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টম শতকের কিংবদন্তি বিশ্বাসঘাতক কাউন্ট জুলিয়ান ভিসিগথ স্পেনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তেমনি নবম শতকে ইউফেমিওসও বিদ্রোহী নৌবাহিনীর ডিভিশনাল অফিসার-সিসিলি প্রদেশের প্রতি অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছিল। বলা হয়, উভয়ই মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের মন্তব্যকে খণ্ডানোর মতো সাহস ও শক্তি কোনোটাই আমার নেই। কিন্তু ইতিহাসকে কেবল এভাবে ব্যাখ্যা করা কি যথাযথ? বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, ভেতরে ভেতরে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে অসন্তোষ জমে উঠেছিল। শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে মুসলিম বিজয়ের মতো বৃহৎ ঘটনাকে বোঝা একধরনের সরলীকরণ।

ভিসিগথ স্পেনে অষ্টম শতকে জনগণের একাংশ রাজাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। করের বোঝা, অভিজাত গোষ্ঠীর পারস্পরিক লড়াই এবং শাসনের অনিশ্চয়তা সাধারণ জনগণকে অসন্তুষ্ট করেছিল। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ সেই অসন্তোষকে সুযোগে পরিণত করে। তাই বলা যায়, স্পেনের পতনের মূলে ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ বিভাজন, শুধু কাউন্ট জুলিয়ানের তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতা নয়।

একই চিত্র আমরা দেখি সিসিলিতেও। নবম শতকে বাইজান্টাইন শাসন স্থানীয় জনগণের আস্থা হারিয়েছিল। সেনাপতি ও প্রশাসকরা জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর চাপাতেন, সামরিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং কেন্দ্রীয় কনস্ট্যান্টিনোপল[১৩] থেকে পাঠানো গভর্নররা দ্বীপবাসীর কাছে প্রায়শই পর ছিল। ইউফেমিওসের বিদ্রোহকে এ প্রেক্ষাপটে দেখা জরুরি। তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষমতার লড়াই হয়তো ছিল, কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে ডাকার গল্প আসলে পরবর্তীকালের ব্যাখ্যা, যা ঘটনাকে নাটকীয় করে তোলে। মূলত বাইজান্টাইন শাসনের প্রতি স্থানীয় অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাবই মুসলিম বিজয়ের পথকে সহজ করেছিল।

আমার মতে, কাউন্ট জুলিয়ান কিংবা ইউফেমিওসকে ইতিহাসের প্রধান নায়ক বা খলনায়ক হিসেবে দাঁড় করানো পশ্চিমা ঐতিহাসকদের বানানো এক গল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়। বরং বিজয়ের পেছনে ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতরের পচন, সামাজিক বিভাজন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং শাসকদের প্রতি জনগণের অনাস্থা। মুসলিম বাহিনী এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল মাত্র।

অতএব, এই দুই ঘটনাকে আমরা ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অসন্তুষ্ট জনগণ, দুর্বল শাসন ও অভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে পারি। কিংবদন্তি ইতিহাসকে নাটকীয় করে তোলে, কিন্তু গবেষণার আলোয় দেখা যায় প্রকৃত কারণ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, যা বাইরের শক্তিকে সহজ প্রবেশপথ দিয়েছিল।

৮২৬ সালে ইউফেমিওস বিদ্রোহ শুরু করে এবং দ্বীপের স্ট্র্যাটেজোস কনস্ট্যান্টিনকে হত্যা করে সিরাকিউজে[১৪] নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত সেখানে তিনি সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা দাবি করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়; এটি হয়তো ব্যক্তিগত আগ্রহ বা সুযোগসন্ধানী প্রচেষ্টা, বিশেষত একই বছরে বিদ্রোহী আন্দালুস মুসলিমদের হাতে বাইজান্টাইন ক্রেটে হারানোর পর। ইবনে আল-আসীর উল্লেখ অনুসারে, এটি আরও একটি নৌ-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল, যেখানে তিনি নিজেই আফ্রিকার (আধুনিক তিউনিশিয়া) উপকূলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন।

---

[১৩] কনস্টান্টিনোপল (Constantinople), বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী, ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক নগরী, যা পরবর্তীকালে অটোমানদের হাতে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত হয়।

[১৪] সিরাকিউজ (Syracuse), সিসিলির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন নগরী, গ্রিক উপনিবেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্কিমিডিসের জন্মভূমি এবং পরবর্তীকালে রোমান ও বাইজান্টাইনদের কৌশলগত দুর্গনগরী হিসেবে খ্যাত ছিল।

তবে ইউফেমিওসের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন তারই প্রাথমিকভাবে পছন্দ করা একজন অধস্তন অফিসার, যার আরবি নাম বালান্তা [সম্ভবত বাইজান্টাইন 'কুরোপালাটেস' বা প্রাসাদের প্রধানকে নির্দেশ করে], পালেরমো [Palermo][১৫] গভর্নরের সঙ্গে যোগসাজশে প্রতিরোধ চালায়। এই অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতা সামলাতে গিয়ে ইউফেমিওসের আঘলাবিদের প্রতি আহ্বান মূলত সহায়ক বাহিনী সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে, মুসলিম বিজয়ের আগেই সিসিলিতে তার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হ্রাস হয়ে পড়েছিল।

সিসিলিতে কীভাবে অভিযান পরিচালিত হবে এই প্রশ্ন নিয়ে কায়রাওয়ান (Qayrawan, তিউনিশিয়া)[১৬] এ জুরিস্ট, সেনাপতি এবং প্রভাবশালী পরিবারদের মধ্যে গভীর বিতর্ক জন্ম নেয়। পরবর্তীতে, এগারো শ শতকের রিয়াদ আল-নুফুস গ্রন্থে এই বিতর্কের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। আল-নুয়াইরির পরবর্তী বর্ণনায় একজন জ্ঞানী জুরিস্ট দ্বীপের দূরত্ব ইতালির মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে আফ্রিকার দূরত্ব বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, "যদি আমি একটি পাখি হই, আমি ওখানে উড়ে যেতাম না।" অর্থাৎ, সমুদ্রপারের আক্রমণ ও সরাসরি বসতি স্থাপন এক নয়; শুধুমাত্র দক্ষিণ ইতালির দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বাহিনী থাকলে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। মধ্য একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিস্থিতি ঠিক এমনটাই ছিল।

মুসলিম বাহিনী ৮২৭ সালের জুনের মধ্যভাগে বিশাল পায়রা এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে সাউস (Sousse, তিউনিশিয়া) থেকে রওনা করে পশ্চিম সিসিলির মাজারা (Mazara del Vallo) এ অবতরণ করে। প্রাথমিক অভিযানের পর মুসলিম বাহিনী "ভ্যাল দি নোটো" (Val di Noto)-র প্রাচীন রোমান রাস্তা ধরে সিরাকিউজে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছানোর পর বাইজান্টাইন নৌবাহিনীর প্রতিরোধ, মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ ও সেনাপতি আসাদের মৃত্যু সব মিলিয়ে এই অভিযান প্রায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

---

[১৫] পালেরমো (Palermo), সিসিলি দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্রধান নগরী, যা মুসলিম শাসনামলে দ্বীপের রাজধানী হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং পরবর্তীতে নর্মান শাসনের অধীনেও সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি ধরে রাখে। বর্তমানে ইতালির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ও প্রদেশ। পালেরমোতে এখনরও মুসলিম সভ্যতার বেশ কিছু স্থাপত্য চোখে পড়ে। আমার দেখা ইতালির অন্যতম সমৃদ্ধ ও সুন্দর একটা শহর।

[১৬] ক্যারাওয়ান (Kairouan) উত্তর আফ্রিকার অন্যতম প্রাচীন ইসলামি নগরী, যা ৭ম শতকে আরব বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি শুধু তিউনিসিয়ার নয়, সমগ্র মাগরিব অঞ্চলের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে জাইতুনা মসজিদ ও প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামি জ্ঞানচর্চার এক বিশাল ঐতিহ্য বহন করে।

মুসলিম বাহিনীর এই আক্রমণের একটি লক্ষণীয় দিক ছিল যা, ধীরগতি ও বিচ্ছিন্নতা। পরবর্তীকালের আঘবালীয়দের অভিযানে মুসলিম বাহিনী সিসিলির পশ্চিম তৃতীয়াংশ-ভ্যাল দি মাজারা (Val di Mazara)-নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেয়। এই অভিযানে অংশ নেয় আঘলাবিদ আরব জুন্ড, হাকালিবা (মধ্য ইউরোপ/বলকান দাস), নন-আরব আফ্রিকান সেনা, সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে সৈন্য এবং আন্দালুসিয়ান বার্বার নেতা আসবাঘ ইবনে ওয়াকেল (Farghalish)-এর নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী। ৮৫৯ সালের পর থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ক্রেটের মুসলিমরাও যোগ দেয়, যারা প্রাথমিকভাবে কর্ডোবা ও মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে তিউনিশিয়ায় হিজরত করেছিল।

৮৩১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণিঝড়ের মতো মুসলিম বাহিনী পালেরমোতে অবতরণ করে। মুসলিম বাহিনীর অবরোধের পর পালেরমোর পতন হয়। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে আল-আসীর উল্লেখ করেন যে, “অবরোধের পর স্থানীয় জনসংখ্যা ৭০,০০০ থেকে প্রায় ৩,০০০-এ নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে শহরটি ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং আধুনিক ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম শহর হিসেবে বিকশিত হয়। এটি মুসলিম শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে পরিচিত।” অন্যবধি সেই পালেরমো তার সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার চিহ্ন নিয়ে আধুনিক ইতালির মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

পরবর্তীতে ৮৪০-এর দশকের শুরুতে প্লাটানি (Platani), কালতাবেল্লোটা (Caltabellotta), কোরলিওনে (Corleone) এবং ট্রাপানি (Trapani) বন্দরসহ ভ্যাল দি মাজারা অঞ্চলের বাদবাকি শহরগুলো মুসলিম শাসনের অধীনে পূর্ণভাবে চলে আসে। মুসলিমরা এ অঞ্চলকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও জুন্ডের প্রধান পরিবারের সদস্যদের জন্য বরাদ্দ করেছিল। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, এখানকার স্থানীয়রা বড় জমির সমাহারে স্থাপনা পুনর্নির্মাণ না করে ছোট ছোট খামার এবং স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে নতুন আফ্রিকান বসতি স্থাপন উৎসাহিত করেছিল।

এদিকে ‘ভ্যাল দি মাজারার’ বাইরেও মুসলিমদের সাফল্য ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে মেসিনা (Messina), ৮৪২-৮৪৩ সালে নেপলস-র পতন হয়। তবে উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল ভ্যাল ডেমন (Val Demone) বারবার অভিযান পরিচালনা করার পরও মুসলিম বাহিনী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তী ৫ বছর (৮৪৫-৮৪৯) দক্ষিণ-পূর্বের তৃতীয়াংশ-

ভ্যাল দি নোটো-মোদিকা (Modica), লেন্টিনি (Lentini) এবং রাগুসা (Ragusa) মুসলিমদের অধীনস্থ হয়। তবে প্রধান দুর্গগুলো যেমনঃ তাওরমিনা (Taormina), কাটানিয়া (Catania) ও সিরাকিউজ (Syracuse) বাইজান্টাইনদের হাতেই রয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনী ধীরে ধীরে বাইজান্টাইন নিয়ন্ত্রিত সিসিলিতে তাদের অভিযান বিস্তৃত করতে থাকে। এই বিজয় কোনো একক বৃহৎ যুদ্ধের ফল নয়; বরং ছিল ধারাবাহিক কৌশলগত অগ্রযাত্রার ফলাফল। ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সেফালু (Cefalù) বিজয় করা হয়, আর ক্যাস্ট্রোজিওভান্নি (বর্তমান এন্না, Enna) শহর কয়েক দফা ব্যর্থ আক্রমণের পর অবশেষে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

পালেরমোর দক্ষ গভর্নর আল-আব্বাস ইবনে আল-ফাযল (৮৫১-৮৬১) পূর্বাঞ্চলের সামরিক অভিযান পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তাওরমিনা, কাতানিয়া ও সিরাকিউজ অঞ্চলের দুর্গ ও শহরসমূহ ক্রমান্বয়ে জয় করে নেয়।

৮৫৯ সালে ক্যাস্ট্রোজিওভান্নি পতনের পর মুসলিমরা মধ্য সিসিলিতে স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং এরপর পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলোর দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে, ৮৬০ সালের মধ্যেই পালেরমো ইসলামি শাসনের কেন্দ্র হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে প্রশাসন ও সামরিক অভিযান উভয়ই সুচারুভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

এখন আসি দক্ষিণ ইতালির মূলভূমিতে মুসলিম প্রভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে। ৮৩২ থেকে ৮৭১ সালের মধ্যে মুসলিম আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ এখানে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করে। আরব সূত্রে দক্ষিণ ইতালিকে কখনো বলা হয়েছে আল-জাজিরা ('মহাদেশ'), আবার গ্রিক সূত্রে ক্যালাব্রিয়া (বর্তমান Calabria, Italy) নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এই অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনপদ সিসিলির মুসলিম সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখত।

মেসিনা প্রণালি (বর্তমান Strait of Messina) মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের ব্যবধানে দক্ষিণ ইতালিকে সিসিলির কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তাই স্থানীয় নৌবাহিনী ও জলদস্যুদের জন্য এই জলরেখা সহজ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ইতালি তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতায় জর্জরিত ছিল। ক্যালাব্রিয়া ও আপুলিয়া (Apulia) অঞ্চলে বাইজান্টাইন প্রভাব ক্রমেই সীমিত হচ্ছিল; আর পশ্চিম উপকূলে নেপলস

(Napoli), আমালফি (Amalfi) ও গায়েতা (Gaeta) নামের ছোট সামুদ্রিক ডাচিগুলো অত্যন্ত দুর্বল শক্তি নিয়ে টিকে ছিল।

এসব অঞ্চলের প্রথম দিকের মুসলিম অভিযানগুলোর অধিকাংশ ছিল ছড়ানো-ছিটানো, মূলত বিচ্ছিন্ন। তবে ধীরে ধীরে মুসলিমরা স্থানীয় শক্তিগুলোর সাহায্যে সিসিলির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। ৮৩২ সালে নেপলস যখন বেনেভেন্টোর (Benevento) প্রিন্স সিকার্ড দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তখন মুসলিম বাহিনীকে মিত্র হিসেবে আহ্বান করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে নেপলস স্থানীয় সৈন্য ও মুসলিমরা যৌথভাবে ব্রিন্ডিসি (Brindisi) আক্রমণ করে।

এরপর ৮৪০-এর দশকে বেনেভেন্টোতে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সিকার্ড হত্যার পর রাদেলচিস (Radelchis) ও সিকোনুল্ফ (Siconulf) দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির গড়ে ওঠে। এ সময় উভয়পক্ষই মুসলিম বাহিনীর নিকট হতে সৈন্য গ্রহণ করে কেউ আফ্রিকা থেকে, কেউ আন্দালুসিয়া (Spain) বা ক্রেটে (Crete, Greece) থেকে। আমরা বিভিন্ন সূত্রে 'আবু জাফর' নামে এক মুসলিম কমান্ডারের কথা জানতে পারি যিনি তারান্তো (Taranto) অঞ্চলে অভিযান কার্যক্রম চালাতেন। তিনি সিসিলিয়ান আরেক নেতা মাসার (Masar) রাদেলচিসের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন।

সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে ৮৪৬ সালে, যখন মুসলিম নৌ-বাহিনী রোমের তিবের নদী (Tiber, Rome) অতিক্রম করার মাধ্যমে সেন্ট পিটার ও পল গির্জা আক্রমণ পরিচালনা করে।[১৭] যদিও ক্ষয়ক্ষতি সীমিত ছিল, তবে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীতে পোপ লিও চতুর্থ (Leo IV) এই প্রতিক্রিয়ায় লিওনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং খ্রিষ্টান শক্তিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কালক্রমে সেটাই প্রথম ক্রুসেডের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই ঘটনার পরও মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে বাণিজ্য সম্পর্ক থেমে থাকেনি। আমালফি বন্দরে মুসলিম মুদ্রা ও স্বর্ণের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যেও ভূমধ্যসাগরে অর্থনৈতিক লেনদেন অব্যাহত ছিল।

---

[১৭] বর্তমানে রোম নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সেন্ট পিটার ও পল গির্জা (Santi Pietro e Paolo a Roma) শহরের আধুনিক ধর্মীয় স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। গির্জাটি টর দে শেঞ্চি অঞ্চলের একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর নির্মিত, যেখান থেকে সমগ্র রোম শহরকে একদৃষ্টিতে দেখা যায়। সেন্ট পিটার ও পল গির্জা আজ রোমের এক নিঃশব্দ তীর্থস্থান, যেখানে ইতিহাস, শিল্প ও আধ্যাত্মিকতার শান্ত ছায়া মিলেমিশে আছে, যেন প্রাচীন রোমের উত্তরাধিকার আজও সেখানে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

যদিও ৮৭১ সালে ফ্রাঙ্ক ও বাইজান্টাইন বাহিনীর যৌথ আক্রমণে মুসলিম বারি (Bari) আমিরাত ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এর মধ্যবর্তী চার দশক দক্ষিণ ইতালির রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলিমদের প্রভাব ছিল গভীর কখনো তারা বিভিন্ন বাহিনীর হয়ে সৈন্য সরবরাহ, কখনো মিত্র, কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজের অবস্থানকে ধরে রেখেছিল। মুসলিমেরা শুধু যুদ্ধ ও অভিযান নয়; বরং রাজনৈতিক ভারসাম্য পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

সিসিলিতে আঘলাবিদদের অভিযান এবং দক্ষিণ ইতালির মূলভূমিতে মুসলিম বাহিনীর অনিয়মিত আক্রমণ ও বিভিন্ন অভিযানের সঙ্গে সময়ের ব্যবধানে বারিতেও (Bari) মুসলিম নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর পূর্বে বাইজান্টাইনদের হাতে ছিল। বারির ওপারেই বাইজানটাইনদের সাম্রাজ্য বলকানের উপস্থিতি। বারির আমিরাত সম্পর্কে প্রধান সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মুসলিম ইতিহাসবিদ আল-বালাযুরীর (প্রায় ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু) কিতাব ফুতুহুল-বুলদান (ভূমির বিজয় গ্রন্থ), যা শুধুমাত্র প্রাথমিক মুসলিম বিজয় নয়; বরং দক্ষিণ ইতালির মূলভূমিতে সংঘটিত অভিযানের এক বিরল বর্ণনাও প্রদান করে। এই তথ্যগুলো পরে ইবনে আল-আসীরের ইতিহাসেও প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলিম বাহিনী ৮৪০ সালে বারিতে প্রথম ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করে। ঠিক তার সাত বছর পর, অর্থাৎ ৮৪৭ সালে মুসলিমরা প্রথম সাফল্য অর্জন করে। এরপর তারা অ্যাপুলিয়ার (Apulia) বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়। মুসলিম বাহিনী ৮৪১ সালে কাপুয়া (Capua) বিজয় করে এবং ৮৫৬ সালে তিনজন আমিরের অধীনে নেপলস (Napoli) ও আশেপাশের অঞ্চলে বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ৮৫৮ এবং ৮৬২ সালে কনজা (Conza), ৮৬১ সালে আসকোলি (Ascoli) এবং স্যান ভিনচেঞ্জো আল ভোল্টুর্নো (San Vincenzo al Volturno) এর মত শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে ভেনাফ্রো (Venafro) ও মুসলিম বাহিনীর হাতে বিজয় হওয়ার পাশাপাশি মন্টেক্যাসিনো (Monte Cassino) ও স্যান ভিনচেঞ্জোর প্রতিটি শহরকে ৩,০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি করে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ করা হতে বিরত রাখা হয়। এই বিপুল সম্পদের পুনর্বণ্টন স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে,

যদিও যুদ্ধের ফসলের ধ্বংস, যুদ্ধের ক্ষতি এবং দাস-শ্রমের কারণে জনসংখ্যা হ্রাসের নেতিবাচক প্রভাবও কোনো অংশে কম ছিল না।

অসমর্থিত আরবি সূত্রের বাইরে, এই সকল ব্যাপারে লাতিন ও গ্রিক উৎসগুলো মুসলিমদের প্রতি সব সময় বৈরী ছিল। তাদের ভাষা ও শব্দচয়নে একধরনের হিংসাত্মক ও লুণ্ঠনকারী হিসেবে মুসলিমদের উল্লেখ করা হয়। যেমন পোপ জন (John, ৮৭২-৮৮২) মুসলিমদের সাম্রাজ্যের প্রতি 'অপকারী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য সূত্রে তারা মুসলিমদের 'চতুর এবং আক্রমণাত্মক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাগুলো মূলত বাইবেল ও স্থানীয় প্রচলিত রূপকে প্রতিফলিত করে, বাস্তবে মুসলিমদের কর্মকাণ্ড শুধুই অন্যান্য সাময়িক অভিযানের মতোই ছিল।

বারিতে মুসলিমদের প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন আল-আঘলাবের একজন সৈনিক (Al-Aghlabid client), তার নাম বিকৃত ও অস্বাভাবিকভাবে "ওল্লা" হিসেবে লেখা হয়েছে। যদিও শাসনক্ষমতা তিনজন প্রধান আমিরের হাতেই ছিল। বারির প্রথম আমির ছিলেন কালফন আল-বার্বার (Kalfun al-Barbare), যিনি বারি জয় করে ৮৫২ পর্যন্ত পাঁচ বছর শাসন করেন। আল-বালাযুরীর মতে, কালফন ছিলেন আরব গোত্র রাবেইয়া (Rabiah)-এর এক মুসলিম সৈন্য। তিনি বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালাতেন এবং জটিল কমান্ডো বাহিনী তৈরি করে দ্রুতগতিতে আক্রমণ পরিচালনা করে পুরা বাহিনী নিয়ে নিরাপদে সরে পড়তে পারতেন; উদাহরণস্বরূপ, ৮৪৮ সালে রাদেলচিস এবং বেনেভেন্টোর (Benevento) বাহিনীর সঙ্গে কাপুয়া আক্রমণে তিনি কমান্ডো বাহিনীর জোটবদ্ধ ছিলেন।

বারির মুসলিম শাসন অ্যাপুলিয়ার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেললেও পালেরমোর (Palermo) মধ্যে কোনো রাজনৈতিক স্থায়ী সংযোগ গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় খ্রিষ্টানরা ইসলামি আইনের আওতায় করদাতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তবে মুসলিমদের প্রকৃত প্রশাসনিক কাঠামো খানিকটা সীমিত ছিল। সামগ্রিক প্রশাসনিক কাজ মূলত বিভিন্ন অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝেই সীমিত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

বারির দ্বিতীয় আমির আল-মুফার্রাজ বিন সাল্লাম (Al-Mufarraj ibn Sallam, ৮৫৩-৮৫৬) অত্র অঞ্চলের প্রায় ২৪টি দুর্গ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি বারিতে জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করেন, কিন্তু সৈন্যদের বিদ্রোহে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিহত হন। বারির তৃতীয় ও শেষ আমির ছিলেন সৌদান (Soudan, ৮৫৭-৮৬৫), যিনি সম্ভবত সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে আগত। তিনি মন্টেক্যাসিনো এবং স্যান ভিনচেঞ্জো অঞ্চলে মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন। সৌদানের আমলে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের কাছে তার শাসনের স্বীকৃতি চাওয়া হয়, তবে খলিফার মৃত্যু (৮৬১) তার স্বীকৃতিকে বিলম্বিত করে।

ফেব্রুয়ারি ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক সম্রাট লুইস (Louis II) মুসলিম নিয়ন্ত্রিত বারি পুনর্দখল করলে, শহরের শাসক আমির আমিন সৌদান বন্দি হন এবং চার বছর পর মুক্তি লাভ করেন। বারির পতনের পর আঘলাবিদ প্রশাসন কায়রাওয়ান থেকে দুটি পৃথক গভর্নর নিয়োগ দেয় একজন সিসিলির জন্য এবং অন্যজন দক্ষিণ ইতালির মহাদেশীয় অঞ্চলের জন্য। এই পদক্ষেপ মূলত বারির প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের চেষ্টা ছিল, যদিও একই সময় সালেরনো (Salerno) দখলের ব্যর্থতা আঘলাবিদ সামরিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

যদিও বারি আনুষ্ঠানিকভাবে আঘলাবিদ আমিরদের অধীন ছিল, বাস্তবে এটি আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে কেবল নামমাত্র সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। খলিফার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও খিলাফত কেন্দ্র থেকে সরাসরি কোনো প্রশাসনিক বা সামরিক সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর একটি প্রধান কারণ ছিল আব্বাসীয় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। ফলে, বারির স্থানীয় গভর্নর বা আমিররা প্রায় স্বাধীনভাবে প্রশাসনিক ও সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যদিও তাঁরা নামমাত্র খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। এই কারণে বারির প্রশাসনিক কাঠামো কখনোই খিলাফতের সঙ্গে স্থায়ী বা কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি।

বারির মুসলিম শাসনের পতনের অন্যতম কারণ ছিল প্রশাসনিক অদক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা। স্থানীয় সমাজ বিশেষত খ্রিষ্টান ও বাইজান্টাইন জনগোষ্ঠীর

সঙ্গে কোনো স্থায়ী সহযোগিতা বা সমন্বয় গড়ে ওঠেনি, যা দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। তদুপরি, আঘলাবি বাহিনীর মূল অংশ সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অভিযানে ব্যস্ত থাকায় বারির প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত সৈন্য ও সম্পদের অভাবে অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলের এই কৌশলগত অঞ্চলটি দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে দক্ষিণ ইতালির বিভিন্ন ডাচি ও শহর-রাষ্ট্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও জটিল রাজনৈতিক সম্পর্ক মুসলিম প্রশাসনের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে।

বলা যায় যে, বারির মুসলিম শাসন যদিও আঞ্চলিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়, তা মূলত সামরিক সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং স্থায়ী প্রশাসনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও কার্যত কোনো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ বা সহায়তা না থাকায় স্থানীয় আমিরদের স্বাধীনতা ক্রমে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে বারি অঞ্চলের মুসলিম শাসন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পালেরমোর পালাটাইন চ্যাপেলের অভ্যন্তরে মুসলিম স্থাপত্য

“He charts the shift from Sicily as ‘warrior outpost’ to vital and productive hub that would transform the medieval Islamic world, and indeed the entire Mediterranean.”- William Granara

শাসনের বিন্যাস ও মুসলিম শক্তির উত্থান

৮৫৯ সালে মুসলিম বাহিনী প্রবল এক ঝড়ের বেগে ক্যাস্ত্রোজিওভানি (আজকের এন্না)-তে আঘাত হানে। শহরটি দ্বীপের একেবারে মাঝখানে, বিশাল পাহাড়ের চূড়ায় গেঁথে থাকা এক প্রাকৃতিক দুর্গ। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুসলিম বাহিনীর হাতে শহরের পতন হয়, আর সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা সিসিলির হৃদয়ে চূড়ান্তভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে। মুসলিমদের ক্যাস্ত্রোজিওভানি জয় মানে শুধু একটি শহর বিজয় নয়, এটি মুসলিম বাহিনীর জন্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রযাত্রার দরজা খুলে দেওয়া, যা তাদের ‘ভাল দি নোটো’ অঞ্চলে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছিল।

এই দিকে বাইজান্টাইনরাও এত সহজে হার মানার জাতি ছিল না। তারা সমুদ্রপথে নৌবাহিনী নিয়ে সিসিলির দিকে ধেয়ে এসে দ্বীপে তাদের শক্তি পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরগুলো অ্যাগ্রিজেন্টো, কাল্টাবেল্লোটা আর প্লাটানি তখনও শান্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। বাইজান্টাইনরা উক্ত অঞ্চলের শাসকরে সহায়তার সমন্বিত যৌথ অভিযান চালানোর আশায় হাত মেলালেও সেটি আর সফল হয়নি। বরং ক্ষোভে বাইজান্টাইনরা এক ভয়ংকর কাজ করে বসে। তারা মুসলিম কমান্ডার শহীদ আল-আব্বাসের কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহ বের করে প্রকাশ্যে এনে পুড়িয়ে দেয়। আল-আব্বাস ছিলেন মুসলিমদের নেতা ও কমান্ডার, যিনি ৮৬১ সালে কাল্টাগিরোনের কাছে এক যুদ্ধে মারা যান। তার মরদেহ অপমান করা হয়েছে মূলত বাইজান্টাইনদের পরাজয়ের প্রতীকী প্রতিশোধ হিসেবে।

এদিকে তখনও সিসিলিতে মুসলিম শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী কোনো আমির বা শাসক গড়ে ওঠেনি। তবুও শাসনের শূন্যতা পূরণ করতে আফ্রিকা হতে এগিয়ে আসেন দক্ষ গভর্নররা। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খাফাজা ইবনে সুফিয়ান। ৮৬২ সাল থেকে তিনি সিসিলির শাসনভার গ্রহণ করেন। এভাবে আপাতত অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা দিয়ে সিসিলির শাসন পরিচালনা করতে হয়েছিল।

নতুন শাসক খাফাজার শাসনে মুসলিমরা দক্ষিণ-পূর্বের শহরগুলোকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসার জন্য একের পর এক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়। যদিও রাগুসা অনেক আগেই মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। পরবর্তীতে রাগুসার মানুষ কর দিতে অস্বীকার করলে আবারও মুসলিম বাহিনীর সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। বিদ্রোহ মোকাবিলায় পাশ্ববর্তী নোটো শহরে ৮৬৪ থেকে ৮৬৬ সালের মধ্যে দুবার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অপরদিকে বড় শহরগুলিতে মুসলিমদের বিজয় সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠিন। শহরসমূহের মধ্যে কাতানিয়া, তাওরমিনা আর সিরাকিউজ-প্রতিটি শহরের অবরোধ একের পর এক ব্যর্থ হয়। তবে মুসলিমরা এসব শহর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও, আশেপাশের গ্রাম আর ফসলের মাঠ ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল। অবশেষে চূড়ান্তভাবে ৮৬৮ সালে সিরাকিউজে তৃতীয়বারের মতো আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। বাইজান্টাইন নৌবাহিনী এবার মুসলিমদের অভিযান ব্যর্থ করতে এগিয়ে আসলেও কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে পারে নাই।

ঠিক সেই সময়ই ঘটল আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ৮৬৯ সালে গভর্নর খাফাজা কোনো এক যুদ্ধ শেষে সৈন্যদের নিয়ে প্রসাদে ফেরার পথে খুন হলেন। মুসলিম সৈন্যরা তার মৃতদেহ দ্রুত পালেরমো নিয়ে যায়, যাতে খ্রিষ্টানরা তাকে কোনো প্রকার অপমান করতে না পারে।

খাফাজার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ শাসনভার গ্রহণ করেন। স্থানীয়ভাবে তিনি স্বীকৃত হওয়ার পরে আফ্রিকা থেকে তার শাসনের অনুমোদন আসে। দুই বছর পর ৮৭১ সালে তিনিও নির্মমভাবে খুন হন।

এভাবেই প্রাথমিকভাবে সিসিলির মুসলিম শাসনের ধারাবাহিকতা কিছুটা অস্থিরতার ছায়ার মাধ্যমে শুরু হয়। একের পর এক শহর জয়, আরেক শহরে ব্যর্থ অবরোধ, গভর্নর হত্যাকাণ্ড, নতুন নেতৃত্ব এবং আবার ষড়যন্ত্র এভাবেই চলতে থাকে সেখানকার শাসনব্যবস্থা। এতৎসত্ত্বেও প্রতিটি আক্রমণ, ষড়যন্ত্র এবং মৃত্যু ধীরে ধীরে সিসিলির মুসলিম ইতিহাসের বুননকে শক্ত করে দিয়ে যাচ্ছিল, যা কয়েক শতাব্দী পরে এক বেদনাময় সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

এদিকে ৮৩০-এর দশকে বিভিন্ন আরব সূত্রে মুসলিমদের প্রথম মাল্টা অধিকারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকেই দ্বীপটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি হিসেবে মুসলিম দুনিয়ার নজরে আসে। ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে অবস্থিত মাল্টা

ছিল উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি এবং ইতালির উপকূলের সংযোগস্থল, তাই এর নিয়ন্ত্রণ মানেই সমুদ্রপথে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার।

যদিও ৮৭০ সালের আগস্টে সিসিলির মুসলিম সেনাদের মাধ্যমে মাল্টায় অভিযান পরিচালনার কথা জানা যায়। তখন বাইজান্টাইনরা সমুদ্রপথে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলে কার্যকর কিছুই করতে পারে নাই। মুসলিম বাহিনী প্রবল শক্তি নিয়ে দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধে মাল্টার গভর্নর নিহত হন, আর বিশপকে বন্দি করে পালেরমোতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মাধ্যমে মাল্টার বাইজান্টাইন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও দুর্গ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি প্রচুর ধনসম্পদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জব্দকৃত এসব সম্পদ সিসিলিতে পাঠানো হয়নি। এর কিছু অংশ আহমাদ ইবনে আল-আঘলাবের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। আর বাদ বাকি অংশ মাল্টার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মুসলিম গভর্ণনের নিকট রেখে দেওয়া হয়।

তবে এত বড় বিজয়ের পরও আঘলাবিরা মাল্টাকে উন্নয়ন বা স্থায়ী বসতির জন্য তেমনভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। তাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা, গভর্নরদের দ্রুত পরিবর্তন, খাফাজার পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং পালেরমোতে নতুন শাসকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে মাল্টা দ্রুতই ভুলে যাওয়া এক দ্বীপে পরিণত হয়। এটা ঠিক যে সেই সময়ের মাল্টার সঠিক চিত্র অঙ্কন করা খুব কঠিন কাজ। এমনকি মুসলিম ঐহিহাসিকদের কাছেও খুব একটা তথ্য নেই যা দিয়ে ইতিহাসের সত্যতা যাচাই বাছাই করা যায়। মাল্টার মুসলিম শাসনামলে কোনো স্থায়ী নগরায়ণ বা বড় উন্নয়ন করা হয়নি। কিছু আংশিক বসতি ও সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে দ্বীপটিকে জীবন্ত রাখা হয়। স্থানীয় খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম ও আচার ধরে রাখত, আবার আংশিকভাবে মুসলিম শাসনের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংযোগও বাজায় রাখত।

মুসলিম শাসনামলে মাল্টার প্রধান উন্নয়ন ঘটে কৃষিক্ষেত্রে। খরা ও পানির অভাব মাল্টার বড় সমস্যা ছিল। মুসলিমরা উন্নত সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যার মধ্যে ছিল নোরিয়া (চক্রাকৃতি পানি তোলার যন্ত্র), কূপ ও সেচনালা। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা শুষ্ক জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলে এবং নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে মুসলিমরা মাল্টায় সাইট্রাস ফল, তুলা, খেজুর, বাদাম, ডুমুর ও জলপাই চাষ শুরু করে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলে। এই কৃষি উন্নয়ন অদ্যাবধি মাল্টার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে।

বর্তমানে সেখানে ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব স্পষ্ট। আজকের মাল্টিজ ভাষার শিকড় আরবিতে নিহিত। প্রায় ৪০ শতাংশ মাল্টিজ শব্দ আরবি থেকে

এসেছে, বিশেষ করে কৃষি, দৈনন্দিন জীবন ও প্রশাসনিক শব্দভান্ডারে। এ কারণে মাল্টিজ ভাষা ইউরোপে অনন্য, কারণ এটি একটি সেমিটিক ভাষা হলেও ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে। মুসলিম শাসনকালে আরবি প্রশাসনিক ও বিচারিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

মাল্টার সীমিত নগরায়ণে মুসলিমরা বিশেষ ভূমিকা রাখে। তারা "মদিনা"কে নতুন করে সাজায় এবং প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। শহরের চারপাশে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, যা বাইরের আক্রমণ থেকে তাদের সুরক্ষা প্রদান করত। মুসলিমরা গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক বসতিগুলোকে পুনর্গঠন করে এবং একটি সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামো তৈরি করে।

একই সাথে ধর্মীয় জীবনেও ইসলাম প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মাল্টায় মসজিদ নির্মাণ হয় এবং স্থানীয় জনগণ ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে মুসলিমরা খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখে, যা সেই সময়ের ইসলামি শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

মুসলিম শাসনকাল মাল্টার সামাজিক অগ্রগতিতেও অবদান রাখে। নতুন নতুন আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়, যা পূর্বের বাইজেন্টাইন আমলের তুলনায় অধিক কার্যকর ছিল। ভূমি বণ্টন, ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক নিয়মকানুনে মুসলিমরা পরিবর্তন আনে। মাল্টা উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বাণিজ্যিকভাবে আরও সংযুক্ত হয়, ফলে দ্বীপটি একটি কৌশলগত বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

মুসলিম শাসনের আরেকটি বড় অবদান ছিল জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার। কৃষি ও স্থাপত্যে তারা যে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করেছিল, তা ইউরোপীয় মধ্যযুগে উন্নতির পথ দেখায়। জল ব্যবস্থাপনায় মুসলিম প্রযুক্তির প্রভাব এখনও মাল্টার ঐতিহ্যে টিকে আছে।

পরবর্তীতে ১১শ শতাব্দীতে নর্মানরা মাল্টা দখল করে সেখানে খ্রিষ্টান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তবুও মুসলিম প্রভাব একেবারে বিলীন হয়ে পড়েনি। নর্মানরা মুসলিম কৃষক, কারিগর ও জ্ঞানীদের ধরে রাখে। কারণ তারা বুঝেছিল মুসলিমদের উন্নয়নমূলক অবদান মাল্টার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। মুসলিম কৃষকরা দীর্ঘ সময় ধরে মাল্টায় কৃষিকাজ চালিয়ে যায় এবং মুসলিম প্রশাসনিক ও কৃষি ব্যবস্থার ছাপ শতাব্দীর পর শতাব্দী অম্লান থাকে।

মুসলিম শাসনকালীন সময়ে দ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আংশিক আরবিকৃত টোপোনিম দেখা যেত। ছোট খোলা জমিতে মুসলিম প্রশাসনের প্রভাব থেকে কর আদায় হতো, তবে বড় শহরগুলো আংশিকভাবে বাইজান্টাইন বা স্থানীয় খ্রিষ্টান প্রভাবের অধীনে ছিল।

সিসিলির মুসলিম শাসকদের বড় স্বপ্ন ছিল সিরাকিউজকে মুসলিম শাসনের অধীনস্থ করা। শহরটি শুধু ধর্মীয় কেন্দ্রই নয়; বরং অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকেও অপরিহার্য ছিল। সিরাকিউজ মুসলিমদের অধীনে এলে দক্ষিণ-পূর্বের 'ভাল দি নোটো' অঞ্চল পুরোপুরি নিরাপদ হতো এবং বাইজান্টাইন প্রতিরোধ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যেত।

এভাবেই আট শতকের শেষভাগে সিসিলির পূর্ব আকাশে ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। নতুন অভিযানের উদ্দেশ্যে ৮৭২ সালে মুসলিম বাহিনী পালেরমো থেকে রওনা হয়ে এগিয়ে গেলো পাহাড়ঘেরা তাওরমিনার দিকে। শহরটি তখন ছিল বাইজান্টাইনদের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি, যা উঁচু প্রাচীর আর নীল সাগরের পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এক অদম্য দুর্গ। মুসলিম সৈন্যরা বহুদিন শহর ঘিরে রাখলেও প্রাথমিকভাবে সফল হলো না। তাওরমিনা তখনও বাইজান্টাইনদের পতাকা উড়াচ্ছিল, যেন শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে খড়কুটোর মতো বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রাম।

মুসলিমদের প্রথমবারের ব্যর্থতার পর পালেরমোর গভর্নর আল-হাসান ইবনে আল-ফাদল সেনাবাহিনীকে আবার পুনর্গঠন করলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, পূর্ব উপকূল জয় করা মানে পুরো সিসিলিকে একসূত্রে বাঁধা। তার ৮৭৪ থেকে ৮৭৫ সালের মধ্যে তার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল উপকূলের দিকে। এবারের অভিযানে ক্যাটানিয়া, লেন্টিনি, এমনকি কিছু দুর্গবেষ্টিত ছোট শহরও একে একে আত্মসমর্পণ করতে থাকল। এভাবেই পূর্ব সিসিলির বাতাসে তখন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল শাসনের রং আরবি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল বাজারের ভিড় থেকে, সৈন্যদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল নতুন নামাজের আহ্বান।

৮৭৭ সালে মুসলিম বাহিনী শহরটির স্থল ও সমুদ্রপথ উভয় দিকেই ঘিরে ফেলে। মুসলিমদের এবারের অভিযান ইতোপূর্বের বিভিন্ন অভিযান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অভিযান পরিচালনার করার জন্য তারা সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল। নতুন উদ্ভাবিত ম্যানগোনেল (একধরনের অবরোধযন্ত্র) ব্যবহার করা হয়।[১৮]

[১৮] সিসিলির আঘলাবি সময়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন শহরগুলো দখল করার জন্য প্রস্তুতি নিত, তখন তারা বিভিন্ন যান্ত্রিক সহায়তা ব্যবহার করত। সবচেয়ে ভয়ংকর ও কার্যকর ছিল ম্যানগোনেল। এটি মূলত একটি বড় ঘূর্ণায়মান যন্ত্র, যাকে দূর থেকে প্রাচীর ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হতো। কাঠ ও রশি দিয়ে তৈরি এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হতো যে, একদল সৈন্য ঘূর্ণন চালালে বিপুল শক্তি তৈরি হতো। এই শক্তি

অবশেষে এলো ৮৭৮ সাল, যা সিসিলির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত হয়ে থাকবে। সেই বছর মুসলিম বাহিনী অবরোধ করল মহাশক্তিশালী শহর সিরাকিউজকে, যা ছিল বাইজান্টাইন শাসনের শেষ আশ্রয়। এই অভিযান নয় মাস ধরে চলে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ক্ষুধা, আর সমুদ্রপথে অনবরত যুদ্ধ, অবশেষে শহরের প্রাচীর ভেঙে পড়ে, পতন হয় সিরাকিউজের। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন শহরের নীরবতায় তখন যেন শোনা যাচ্ছিল এক নতুন যুগের পদচারণা।

সিরাকিউজ পতনের সঙ্গে সঙ্গে সিসিলির প্রায় পুরো দ্বীপই মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আঘলাবিদ শাসনের পতাকা ওড়ে সমুদ্রবন্দর থেকে পাহাড়ি দুর্গ পর্যন্ত। মুসলিম ক্রনিকলাররা পরে এই ঘটনাকেই বলেছিলেন "ফুতুহ সিকিলিয়া" সিসিলির বিজয়ের চূড়ান্ত সোপান। পালেরমো থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত তখন জেগে উঠেছিল এক নতুন সভ্যতার সুর, যেখানে আরব ও ভূমধ্যসাগর মিশে যাচ্ছিল এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক স্রোতে।

এভাবেই আট শতকের শেষের দিকে সিসিলির আকাশে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়। তখন দ্বীপটির শাসনভার ছিল আঘলাবিদ আমিরদের হাতে, আর তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল পালেরমো, যা আরবদের ভাষায় পরিচিত ছিল 'বাল-হারম' নামে। এই শহরটি তখন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল সিসিলির প্রাণকেন্দ্রে। গভর্নর বা আমিরগণ যদিও নামেমাত্র কায়রাওয়ানের আঘলাবিদ আমিরের অধীন ছিলেন, বাস্তবে তারা প্রায় স্বায়ত্তশাসিতভাবেই শাসন চালাতেন। কায়রাওয়ান থেকে শুধু আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আসত, কিন্তু পালেরমোতেই গড়ে উঠত সিদ্ধান্তের আসল কেন্দ্র।

ব্যবহার করে বড় বড় পাথর বা ভারী বলকে শহরের প্রাচীরের দিকে ছোঁড়া হতো। কখনো কখনো এতে কাঠের বড় প্রলেপযুক্ত বলও ব্যবহার করা হতো, যা প্রাচীরের কোনো অংশকে চূর্ণ করে ফেলত।

সেনারা ম্যানগোনেল ঘিরে দাঁড়াত, নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ত, যাতে প্রতিপক্ষ ছোঁড়া তির বা আগুনের আঘাত থেকে বাঁচানো যায়। দূর থেকে রেলিং বা ঢাল ব্যবহার করে যন্ত্রটি চালানো হতো। পাথর বা বল ফেলার সময়ে শীতল বাতাসের সাথে সঙ্গে গর্জন আর ভাঙার শব্দ কানে বাজত।

ম্যানগোনেল শুধু প্রাচীর ভাঙার জন্য নয়, শহরের ভেতরের আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যও ব্যবহৃত হতো। প্রতিপক্ষ সৈন্যরা যখন মাটিতে বসে অথবা ঘরে লুকিয়ে থাকত, পাথর বা বল নেমে আসত এবং হাহাকার ছড়াত। এতে শহরের মানুষরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো।

সৈন্যরা কখনো কখনো ম্যানগোনেলের সাথে ছোট বন্দুক বা আগুন লাগানো যন্ত্রও ব্যবহার করত। শহরের প্রাচীর ধ্বংস হলে, সৈন্যরা প্রবেশ করত এবং ধ্বংস, লুটপাট ও বন্দি নেওয়ার কাজ শুরু করত। এই যন্ত্রের কারণে আঘলাবি মুসলিম সৈন্যরা প্রাচীর ভাঙার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর হতো। যদিও এটি তৈরি ও পরিচালনা কঠিন, এর প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। ম্যানগোনেল যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যদের ভয় ও শক্তি প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ের দুই শাসক আল-হাসান ইবনে আল-আব্বাস ও আল-আব্বাস ইবনে ফাদল ছিলেন দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসক। তারা সিসিলির স্থানীয় পরিস্থিতি বুঝে প্রশাসন সাজিয়েছিলেন আরব ও বার্বার নীতির এক অনন্য মিশ্রণে। ফলে একদিকে শাসনে শৃঙ্খলা বজায় থাকত, অন্যদিকে স্থানীয় সমাজের বৈচিত্র্যও টিকে থাকত। পালেরমো শুধু প্রশাসনিক সদর নয়, ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে বাণিজ্যের এক ব্যস্ত কেন্দ্র। বাজারের ভেতর ভেসে আসত সাগরপথে আগত জাহাজের আওয়াজ, কারিগরদের হাতের কাজ বিক্রি হতো দূরদেশের ব্যবসায়ীদের কাছে।

এই সময়েই মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে নতুন গতি দেয়। পালেরমোর রাস্তাঘাটে তখন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে, আরবি ভাষার সুর মিশে যেত ভূমধ্যসাগরের হাওয়ায়। শহরটি হয়ে ওঠে শুধু রাজনীতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়, সংস্কৃতি ও জ্ঞানেরও এক বিকাশস্থল। আঘলাবিদ শাসনের এই অধ্যায় সিসিলির ইতিহাসে রেখে যায় প্রশাসনিক দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সিরাকিউজের পতনের পর সিসিলির আকাশে যেন নতুন এক শাসনের ভোর হয়। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল সংগঠিত নতুন প্রশাসন, এক সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা। পালেরমো, যা একসময় ছিল যুদ্ধের পরিকল্পনা ও সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্র, এখন হয়ে উঠল প্রশাসনিক হৃৎস্পন্দন। এখান থেকেই মুসলিম গভর্নরগণ দ্বীপের প্রতিটি প্রান্তে আইন, কর ও শাসনের নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন।

এই সময় থেকে সিসিলিতে মুসলিম প্রশাসন নিতে শুরু করে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। গড়ে ওঠে বিভিন্ন 'দেওয়ান'-দপ্তরভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। এক দেওয়ান ভূমি ও রাজস্বের তত্ত্বাবধান করত, আরেক দেওয়ান বিচার ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা দেখভাল করত। এভাবেই ধীরে ধীরে আরবি প্রশাসনিক পরিভাষা ও নীতি মিশে যায় সিসিলির দৈনন্দিন জীবনে।

রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'জিজিয়া' ও 'খারাজ'। অমুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেও নিয়মিত কর সংগ্রহ করা হতো, তবে তাদের ধর্ম ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত থাকত। এতে একদিকে রাজকোষ সমৃদ্ধ হলো, অন্যদিকে স্থানীয় জনজীবনও ক্রমে নতুন শাসনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিখল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পালেরমো তখন সিসিলির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরজুড়ে নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, উত্তর আফ্রিকার

কায়রাওয়ান, মিশরের ফুস্তাত, এমনকি দূর আন্দালুসের কর্ডোবার বন্দরগুলোর সঙ্গে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। সিসিলির বাজারে তখন ভেসে আসে আফ্রিকার স্বর্ণ, মিশরের বস্ত্র, আন্দালুসের ধাতু; আর এখান থেকে রপ্তানি হতো শস্য, ফল ও চমৎকার মৃৎশিল্প।

কৃষিক্ষেত্রেও ঘটে এক নীরব বিপ্লব। মুসলিম প্রকৌশলীরা দ্বীপজুড়ে সেচ ও খালব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। আনা হয় নতুন ফসলের চাষ-আখ, কমলা, লেবু, এমনকি শস্যচক্রের উন্নত পদ্ধতি। গ্রামীণ দৃশ্যপটে দেখা দেয় সবুজের নতুন পরত; সিসিলির মাটি যেন আবারও প্রাণ ফিরে পায়।

৮৭৯ থেকে ৮৮৫ সালের এই সময়কাল তাই কেবল শাসনের নয়, পুনর্জাগরণেরও যুগ। পালেরমোর প্রাসাদ থেকে শুরু করে গ্রামের খেত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এক নতুন প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সজীবতা, যার ছোঁয়ায় সিসিলি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল ভূমধ্যসাগরের এক সমৃদ্ধ মুসলিম প্রদেশে।

শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। একদিকে তিনি ছিলেন কঠোর শাসক, যিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে যেকোনো বিরোধীকে নির্মমভাবে দমন করতেন; অন্যদিকে তার সামরিক দক্ষতা আঘলাবিদের শক্তিকে শীর্ষে পৌঁছে দেয়। আরব ইতিহাসবিদরা তাকে মনে রেখেছেন এক "লৌহকঠিন" শাসক হিসেবে, যিনি প্রতিটি প্রতিরোধকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে জানতেন।

আফ্রিকার ভূমিতে তার সময়টা একের পর এক সামরিক সাফল্যে ভরপুর ছিল। ৮৭৯-৮৮০ সালে মিশর থেকে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে তেলেনিদ প্রতিরক্ষা, ৮৮১-৮৮৩ সালে জাবের বর্বারদের ওপর অভিযান, ৮৯৩ সালে বৃহৎ ভূমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ, আর ৮৯৬-৮৯৭ সালে জাবাল নাফেসার বিদ্রোহ দমন প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি নিজের নাম অমর করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যই শেষ পর্যন্ত তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। কারণ তার খ্যাতি আর কঠোরতা প্রজন্মের চোখে একদিকে অতিরঞ্জিত, অন্যদিকে বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার মতো হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহই পরবর্তীতে তার রাজবংশকে দুর্বল করে তোলে এবং আফ্রিকায় ফাতিমিদের উত্থানের পথ খুলে দেয়।

তার জীবনের শেষ অধ্যায় লেখা হয় সিসিলি আর দক্ষিণ ইতালির মাটিতে। জুন ৯০২ সালে তিনি আফ্রিকার আমিরের পদ থেকে নিজেই সরে দাঁড়ান। দায়িত্ব দিয়ে দেন তার পুত্র আবুল-আব্বাস আব্দুল্লাহকে, আর তিনি নিজে পা রাখেন

সিসিলির মাটিতে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে বলা আছে হজে না গিয়ে তিনি যুদ্ধকেই নিজের পুণ্য অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি ত্রাপানি থেকে শুরু করে ছুটে বেড়ান শহর থেকে শহরে। পালেরমো হয়ে পূর্ব সিসিলির বহু নগরে ইসলামের পতাকা গাঁথেন। আফ্রিকা থেকে আসা সৈন্যদের সঙ্গে মিলে তিনি এক বিশাল যৌথ বাহিনী গড়ে তোলেন। আরবদের সেই স্বপ্নের দিন এলো অবশেষে ৯০২ সালের ১ আগস্ট। বহু বছরের চেষ্টা শেষে পতিত হলো তাওর্মিনা। গ্রিক সূত্র "সেন্ট এলিয়াসের জীবন" জানায়, সেই দিনে শহরের বিশপ নিহত হয়েছিলেন। তাওর্মিনার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাল দিমোনে অঞ্চলের দুর্গগুলো আত্মসমর্পণ করে। রোমেটা শহরও মুসলিমদেরকে জিজিয়া দিতে রাজি হয়। এভাবেই প্রায় পঁচাত্তর বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অবরোধ আর বিদ্রোহ শেষে মুসলিম শাসকরা ঘোষণা করতে পারল পুরো সিসিলি এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে।

ইব্রাহিমের বিজয়ের স্পৃহা ততক্ষণে থেমে যায়নি। সিসিলিকে সুসংগঠিত করে তিনি দৃষ্টিপথ প্রসারিত করলেন সমুদ্রের ওপারে ইতালির মূল ভূখণ্ডে। মেসিনা প্রণালির জ্বলজ্বলে নীল জলরাশি পেরিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী কালাব্রিয়ার দিকে অগ্রসর হলো। পথের শহরগুলোতে আতঙ্কের বাতাস ছড়িয়ে পড়ল; মানুষের চোখে দেখা দিলো বিস্ময় আরব সেনাপতি যেন নতুন যুগের অগ্রদূত।

কিন্তু ইতিহাস সব সময় বিজেতার পক্ষে থাকে না। ৯০২ সালের অক্টোবরে, কোসেনজার দুর্গ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল শেষ প্রাচীরের মতো। শহর অবরুদ্ধ, বিজয় প্রায় নিশ্চিত এমন মুহূর্তেই ইব্রাহিম হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যুদ্ধের আঘাতে পতিত হয়েছিলেন নাকি রোগে নিঃশেষ হয়েছিলেন-এ নিয়ে ইতিহাস আজও নিশ্চুপ। কিন্তু মৃত্যু যেমনই হোক, তার প্রস্থান ছিল বিস্ময়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন এক বজ্রপাত।

তার মৃত্যু ছিল শুধু একজন নেতার মৃত্যু নয়; বরং একটি অগ্রযাত্রার শ্বাসরোধ। ইব্রাহিম ছিলেন সিসিলির মুসলিম প্রশাসনের মস্তিষ্ক, রাজনৈতিক স্থিতির ভিত্তিপ্রস্তর, এবং সেই বিরল সংগঠক যিনি যুদ্ধ, প্রশাসন, অর্থনীতি ও সমাজ গঠনের তত্ত্বকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। তার হাতে সিসিলি শুধু দখল করা ভূমি ছিল না; ছিল নবজন্মের অপেক্ষায় থাকা একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার মানচিত্র।

তার আকস্মিক প্রস্থান সেই মানচিত্রে যেন হঠাৎ গভীর একটি ফাটল তৈরি করল। মুসলিম সিসিলির বিজয়যাত্রা থেমে গেল অদৃশ্য শোকে; নেতৃত্বে দেখা দিলো

টানাপোড়েন; ভেতরে শুরু হলো ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ। ইতিহাসে প্রায়ই ব্যক্তির মৃত্যু সাম্রাজ্যের ভাগ্য বদলে দেয় ইব্রাহিমের মৃত্যু তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সেদিন, কোসেনজার দেয়ালের নিচে পতিত হয়েছিল শুধু একজন সেনাপতি নয়, মুসলিম ইতালির ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা। পরে ইতিহাসবিদ আল-নুয়াইরী মুসলিম সিসিলির কাহিনি নিয়ে সংক্ষেপে বলেছিলেন "প্রত্যেক গভর্নর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, সামরিক অভিযান এবং জিহাদ পরিচালনা করেছেন।" এই ছোট বাক্যের ভেতরেই লুকিয়ে আছে পুরো সত্য। সিসিলির মুসলিম যুগ ছিল বিজয়ের মতোই আনন্দে, গৌরবের মতোই রক্তক্ষয়ের ইতিহাস।

তবুও শেষ পর্যন্ত একটি দৃশ্যই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্বিতীয় ইব্রাহিমের শেষ নিশ্বাস মিলেছিল সিসিলি আর ইতালির মাটিতে, যেখানে তিনি যুদ্ধকেই নিজের প্রার্থনা বানিয়ে সমাপ্ত করেছিলেন জীবন।

শাসকগণ সিসিলিতে পূর্ণভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর এবার আস্তে আস্তে দ্বীপের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করছিলেন, কিন্তু বাইজান্টাইন প্রভাবিত শহরগুলো কখনো সহজে আত্মসমর্পণ করত না। সেসময় গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল খ্রিষ্টান সাধুদের জীবনকথা। লিও অফ কাটানিয়া, এলিয়াস দ্য ইয়ংগার, লিও-লুক, এলিয়াস স্পেলিওটস, ভিটালে, সাবাস দ্য ইয়ংগার, লুক অফ ডেমননা, এবং নেইলস এই সাধুরা একধরনের রক্ষা ও সান্ত্বনার আলো বহন করতেন।

যখন মুসলিম সেনারা শহরগুলো দখল করতে ব্যর্থ হতেন, তখন সাধুরা গ্রামীণ মঠ বা দুর্গে লুকিয়ে পড়তেন। তারা তাদের উপস্থিতি নীরব রাখতেন, তবে মানুষের কাছে আশার আলো হয়ে থাকতেন। কখনো তারা আফ্রিকার সেনাদের সঙ্গে চুক্তি করে বন্দিদের মুক্ত করানোর ব্যবস্থা করতেন, আবার কখনো বাইজান্টাইনদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতা করতেন। তাদের এই কাজ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে মুসলিম শাসনের আওতায় থেকেও অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করত।

দ্বীপের বড় শহরগুলো যেমন: সিরাকিউজ, কাতানিয়া এবং তাওর্মিনা, প্রাথমিকভাবে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিল ঠিকই। অবরোধ চলতে থাকত, খাদ্য ও সম্পদ সীমিত হয়ে যেত। তখন সাধুরা প্রায়ই ক্ষুধা, রোগ ও অস্থিরতার মধ্যেও জনগণকে সাহস দিতেন। গ্রামের মানুষদের কাছে তারা পরামর্শদাতা, ধৈর্যের প্রতীক, এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক কৌশলের দিকনির্দেশক হয়ে উঠতেন।

যখন সৈন্যরা বিজয় অর্জন করত, তখনও বিজিত সম্পদ অর্জন ও জিজিয়া আদায়ে অসুবিধা হতো। স্থানীয়দের সঙ্গে চুক্তি করা হতো কেউ নিজের জমি রাখত, কেউ কর দিত। তবে প্রায়শই এই কাঠামো বাস্তবে পুরোপুরি প্রয়োগ করা যেত না। সৈন্যদের হাতে সম্পদ চলে যেত, এবং কমান্ডারের অমর্যাদা বা মৃত্যু হলে নিয়ন্ত্রণ হতো সেনাদের হাতে।

এভাবে দ্বীপে ইসলামি শাসন ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এক অদ্ভুত সমন্বয় তৈরি করেছিল। অনেক শহর মুসলিম শাসনের আওতায় আসে, তবে স্থানীয়দের প্রাচীন জীবন ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রয়ে যায়। কিছু অঞ্চল সম্পূর্ণ আরবিকৃত হলেও, উত্তর-পূর্ব সিসিলিতে খ্রিষ্টান পরিচয় শক্তভাবে টিকে ছিল।

দ্বীপের মানুষের জীবনে প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জ আসত। কখনো তারা লুকিয়ে থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত, কখনো সৈন্যদের সঙ্গে চুক্তি করে জীবন বাঁচাত। অনেকে আফ্রিকায় ফিরে যেতেন, আবার কেউ সমুদ্রপথে নতুন বসতি স্থাপন করতেন। বড় বড় শহরের মসজিদগুলোতে এখন গির্জা বা প্রশাসনিক ভবন দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতি টিকে থাকত সাধুদের ধৈর্য, শিক্ষার কেন্দ্রগুলো এবং গ্রামীণ মঠগুলো সমাজকে বাঁচিয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতে সিসিলিয়ার খ্রিষ্টান সাধুদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

এভাবে সিসিলিতে মুসলিম শাসন দীর্ঘ সময় ধরে চললেও, বাস্তবতা ছিল বার্বার যুদ্ধ, সমঝোতা, চুক্তি এবং অস্থিরতার মিশ্রণ। দ্বীপের আকাশে যুদ্ধের গর্জন থেমে গেলেও মানুষের স্মৃতি, সাধুদের সাহস, এবং সংস্কৃতির বীজ চুপচাপ অক্ষুণ্ন রয়ে গেল। ইসলামি শাসনের এই যুগ যেন একটি দীর্ঘ গল্পের মতো যেখানে বিজয় ও পরাজয়, ধ্বংস ও সংরক্ষণ, শক্তি ও নম্রতা একসাথে ছায়াপথে ছড়িয়ে আছে। আমার এটাই মনে হয়েছে সিসিলিয়ার মুসলিম শাসক ও গভর্ণররা যেভাবে রাজ্য ও শহর জয়, সাম্রাজ্য বিস্তার ও একের পর এক অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন যে হিসেবে রাজ্যের স্থিতিশীলতা, নাগরিকদের জীবনের উন্নতি ও জননিরাপত্তার কথা যেমন ভাবেননি।

একই সাথে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণও ছিল না। যখন যারা যেভাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছে তারা নিজেদের মতো করেই সাম্রাজ্যকে সাজিয়েছে। পূর্বাপর আন্দালুসিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের মতো কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ও নেতৃত্ব বরাবরই অনুপস্থিত ছিল, যার কারণে প্রায়শই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লেগেই ছিল।

সিসিলির ভূমি ছিল এক জটিল নকশার মতো যেখানে ধর্ম, জাতি, রাজনীতি এবং আঞ্চলিক স্বার্থের মিলনস্থল হিসেবে কাজ করত। মুসলিম ও খ্রিষ্টান, আরব ও বার্বার, দ্বীপের উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত প্রতিটি শহর ও উপত্যকা এক অভিন্ন ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে। পালেরমো থেকে আগ্রিজেন্টো, ভ্যাল ডেমন, ভ্যাল দি নোটো এবং ভ্যাল দি মাজারা সবখানেই এই উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

উত্তর-পূর্বের ভ্যাল ডেমন অঞ্চলে খ্রিষ্টান বসতি সবচেয়ে দৃঢ় ছিল। এখানে আরবি নামের প্রভাব ছিল কম, খ্রিষ্টান জনগণ দৃঢ় প্রতিরোধে অবস্থান নিয়েছিল। ভ্যাল দি নোটোতে নামগুলো মিশ্রিত হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমের ভ্যাল দি মাজারায় আররি টোপোনিম ঘনঘন পাওয়া যায়। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গ বা 'দুর্গ' নির্দেশক নামগুলো বোঝায়, যে স্থানগুলো প্রাথমিকভাবে প্রতিরক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

ভ্যাল দি মাজারায় এই ধরনের নামের সংখ্যা ভ্যাল দি নোটোর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং ভ্যাল ডেমন-এর তুলনায় প্রায় ছয় গুণ। 'Qaṣr' (দুর্গ) ও 'Burj' (টাওয়ার) নামও অনুরূপভাবে পাওয়া যায়। অনেক দুর্গে আরবি ব্যক্তিগত নামও সংরক্ষিত, যা সেই সেনা কমান্ডারদের স্মরণ করায় যারা প্রথমে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তবে সব দুর্গই আঘলাবি জুন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল না; কিছু নাম স্থানীয় বিদ্রোহী বা পালেরমোর শাসককে স্মরণ করিয়েছে।

বিভিন্ন গ্রামের নাম ও খোলা জমির অবস্থান মূলত দ্বাদশ শতাব্দীর আরব-নর্মান দলিল থেকে জানা যায়। তবে ধারণা করা যায়, এই বসতিগুলো বহু আগে থেকে গড়ে উঠেছিল। নামের পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের ফলে কোথায় কখন বসতি স্থাপিত হয়েছে তা বোঝা কঠিন। কিছু জমি করমুক্ত দেওয়া হতো, যার মাধ্যমে বসবাসকারীরা মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।

বৃহৎ শহরগুলোতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হলেও আঘলাবি সময়ে কোনো শহর প্রাদেশিক কাঠামোর অংশ হিসেবে গড়ে ওঠেনি। দশম শতাব্দীতে প্রথমবার কৃষিজমিতে ছোট খোলা বসতিগুলো 'raḥl', 'maûil' বা 'qarya' নামে পরিচিত হয়। ইসলামি উত্তরাধিকার আইন চালু হলে তখনকার জমিগুলো প্রজন্মে ভাগ হয়ে ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যেত।

আঘলাবি এবং পরবর্তী ফাতিমীয় সময়ে বার্বারদের ভূমিকা আংশিক অস্পষ্ট। প্রথমে তারা আঘলাবি বাহিনীর অংশ হিসেবে এসেছিল, পরে নিজেদের খাতায় লড়াই করেছিল এবং বারি আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফাতিমিদের ক্ষমতায়

আসার পর কিছু বার্বার সিসিলিতে বসতি স্থাপন করে এবং ইবাধি[১৯] আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আঘলাবি সময়ে তাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি কম ছিল, ফাতিমিদের সময় সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা স্পষ্ট।

যখন নর্মানরা দ্বীপ দখল করে, ততক্ষনে সিসিলি প্রায় পুরোপুরি আরবিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আরব ও বার্বারদের বৈষম্য ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। বার্বার ভাষা ক্রমেই আরবির সঙ্গে মিশে যায়। একাদশ শতাব্দীর সিসিলিয়ান কবিরা দ্বীপকে 'স্বর্গ' বললেও, আফ্রিকার জন্য বার্বারাইজড শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এভাবে দেখা যায় যে ইসলামি সিসিলি ছিল এক জটিল সমন্বয়। ধর্মান্তর, প্রতিরোধ, পালানো, সমাহিত সামাজিক মিলন এই সব মিলেমিশে এক অনন্য সামাজিক পরিবেশ গড়েছিল। খ্রিষ্টানরা মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। পশ্চিম সিসিলি ও বড় শহরগুলোতে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে স্থানীয়রা আরও আরবিকৃত ও ইসলামিকৃত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ন রয়ে গিয়েছিল।

অদ্যাবধি আপুনি সিসিলি, পালেরমোসহ দক্ষিণ ইতালির যেখানেই যান না কেন, এমন শহর গ্রাম পাবেন যাদের নামের শিকড় আরবি। ক্যালটাজিরোনে (Caltagirone) এবং ক্যালটানিসেটা (Caltanissetta) এসেছে আরবি শব্দ কালতা (দুর্গ) থেকে; মঙ্গিবেল্লো (Mongibello) ও জিবিলমান্না (Gibilmanna)-র জিবিল মানে পাহাড়ি স্থান; রাকালমুতো (Racalmuto) ও রেগালিয়ালি (Regaliali) এসেছে "রাহ্ল" থেকে, যার অর্থ এলাকা বা গ্রাম; আর "মার্সালা" (Marsala), বা মার্স'আল্লাহ, অর্থাৎ "আল্লাহর বন্দর"।

আরবি বংশনামও আজ পর্যন্ত টিকে আছে সালিমবেনি (Salimbeni), তাইব্বি (Taibbi), সাক্কা (Saccà), জাপ্পালা (Zappalà), কুফফারো (Cuffaro) এবং মিচিচ্চে (Micicch) বেশ প্রচলিত, যা সিসিলির আংশিক উত্তর আফ্রিকান বংশধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সিসিলিয়ানরা যখন আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলেন, তাদের কথোপকথনে প্রচুর আরবি শব্দ ছড়িয়ে থাকে।

---

[১৯] মুসলিম সিসিলিতে ইবাধি আন্দোলন মূলত উত্তর আফ্রিকাকেন্দ্রিক ইবাদি মতের অনুসারী বারবার মুসলিমদের একটি ধর্ম–রাজনৈতিক ধারা, যারা সিসিলির প্রাথমিক আরব বিজয়ের সময় দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তারা কঠোর নৈতিক আদর্শ, শাসনে সমতা এবং গোত্রীয় স্বশাসনকে গুরুত্ব দিত, তবে পরবর্তীকালে ফাতিমিয় ও সুন্নি উত্থানের ফলে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়।

সিসিলিতে মুসলিম শাসনের শিখা এখন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। রাজ্য ও সাম্রাজ্যজুড়ে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। তখন দূর কনস্টান্টিনোপল থেকে আবারও নড়েচড়ে বসলেন বাইজান্টাইন সম্রাট বেসিল প্রথম (Basil I)। পরাজয়ের ক্ষত তখনও তাজা, কিন্তু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এত সহজে দ্বীপটি ছাড়তে রাজি ছিল না। ৮৮৫ সালের দিকে সম্রাটের নির্দেশে সমুদ্রপথে শুরু হয় কিছু সীমিত পাল্টা অভিযান। বাইজান্টাইন নৌবহর সিসিলির পূর্ব উপকূল বরাবর হামলা চালায় তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলিম নিয়ন্ত্রিত বন্দর ও দুর্গগুলোকে দুর্বল করা।

তবে মুসলিম শাসকেরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তারা দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলেন। বিশেষত কাটানিয়া ও তাওরমিনা, যে দুটি শহর একসময় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলো নতুন করে গড়ে তোলা হয় শক্ত দুর্গনগর হিসেবে। পাথরের প্রাচীর, প্রহরী টাওয়ার, এবং সৈন্যদের স্থায়ী শিবিরে সিসিলির পূর্ব উপকূল যেন আবারও প্রস্তুত হয়ে উঠল যেকোনো আক্রমণ ঠেকাতে।

তবুও বাইরের শত্রুর চেয়ে বড় বিপদ এসে দাঁড়ায় ভেতর থেকে। এই সময় মুসলিম শাসন কাঠামোর ভেতরে দেখা দেয় আরব ও বার্বার অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। একদল চেয়েছিল শাসনে আরব ঐতিহ্যের আধিপত্য বজায় রাখতে, অন্যদল দাবি করছিল স্থানীয় বার্বার সেনাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রশাসনের ঐক্য কিছুটা নড়বড়ে হয়ে যায়, শাসনের কার্যকারিতাও সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।

তবুও পালেরমো তখনও ছিল সক্রিয়, তার বাজার ও বন্দর সচল ছিল আগের মতো। যুদ্ধের হুমকির মাঝেও শহরজুড়ে জীবন চলতে থাকে। মসজিদের মিনারে সন্ধ্যার আজান উঠত, আর সমুদ্রতীরে জাহাজগুলো প্রস্তুত থাকত নতুন অভিযান কিংবা প্রতিরক্ষার জন্য। ৮৮৫ থেকে ৮৮৯ এই কয়েকটি বছর তাই সিসিলির ইতিহাসে ছিল এক অস্থির, কিন্তু জীবন্ত অধ্যায়; যেখানে বাইরের শত্রু আর ভেতরের দ্বন্দ্ব মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অনিশ্চিত, তবুও অদম্য সময়ের গল্প।

৮৯০-এর দশকে সিসিলির আকাশে আবারও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। গভর্নর "আল-হাসান ইবনে আল-আব্বাস" তখন দ্বীপের প্রতিটি কোণে শাসনের সেতুবন্ধন গড়ে তুলছিলেন। তার নেতৃত্বে পুরো সিসিলিতে "কেন্দ্রীয় প্রশাসন" প্রতিষ্ঠিত হলো। পালেরমো, যা একসময় কেবল যুদ্ধের কেন্দ্র ও বন্দর নগরী ছিল, এখন হয়ে উঠল "আমির আল-সিকিলিয়ার" আসন। এখান থেকে সেনা ও প্রশাসন দুটি একত্রে পরিচালিত হতে লাগল, যেন শহরটি হয়ে গেল দ্বীপের প্রাণকেন্দ্র।

৮৯২ সালে মুসলিম বাহিনী পুনরায় দখল করে তাওরমিনাকে। এই বিজয় সিসিলির জন্য এক একীভূত মুহূর্ত। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ দ্বীপের প্রতিটি প্রান্ত এখন মুসলিম শাসনের আওতায়। মানুষের বাজারে, বন্দরঘাটে, গ্রামীণ অঞ্চলে যেন এক নতুন নিয়ম ও শান্তি স্থির হলো।

এই সময়ের সিসিলি কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও এক সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হলো। পালেরমো হয়ে উঠল আঘলাবিদ সাম্রাজ্যের "উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ানের সমতুল্য রাজধানী"। তার বাজারে বাণিজ্য, প্রশাসনিক ভবনে নিয়ম ও শৃঙ্খলা, সেচখাত ও খালগুলোতে সবুজ শস্য সব মিলেমিশে শহরটি যেন জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠল আঘলাবিদ শাসনের চূড়ান্ত বিকাশের।

দশম শতকের শুরুর দিকে, সিসিলি ও আফ্রিকার মুসলিম শাসন একটি জটিল ও বহুস্তরীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। দ্বীপের উত্তেজনা ধর্মীয়, জাতিগত এবং আঞ্চলিক কারণে অনেকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল। মুসলিম ও খ্রিষ্টান, আরব ও বার্বার, পালেরমো থেকে আগ্রিজেন্টো, ভ্যাল ডেমন, ভ্যাল দি নোটো এবং ভ্যাল দি মাজারার মধ্যে এই শক্তির ভারসাম্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

৯০৬ সালে টাসকানির দ্বিতীয় লোরেন লোথারের কন্যা যার নাম বার্থা তিনি বাগদাদের খলিফা আল-মুকতাফীকের কাছে একটা পত্র পাঠান। একই সাথে তখনকার সময়ের রীতি অনুযায়ী প্রচুর উপহার উপঢৌকনও প্রেরণ করেন। জানা যায় যে সেই পত্রটি গ্রিক ভাষায় লিখিত ছিল। আর আলী নামক এক বাহক এই উপহার ও চিঠি খলিফার কাছে নিয়ে যান। উক্ত আলি, যিনি আরবি ও গ্রিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

আলি আবার তখন আঘলাবি আমির জিয়াদাত আল্লাহ তৃতীয়ের (৯০৩-৯০৯) নৌবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এই উপহারে ছিল পঞ্চাশটি তলোয়ার, পঞ্চাশটি ঢাল, পঞ্চাশটি নীশান দা-লান্স, বিশটি স্বর্ণজড়িত পোশাক, বিশটি সাদা কাগজের বই, বিশজন কন্যা দাসী, দশটি বড় ও ভয়ংকর শিকারি কুকুর, সাতটি বাজ পাখি, সাতটি শকুন, একটি সিল্কের তাঁবু, বিভিন্ন রঙের উলের কাপড়, মোতির মতো কিছু পাথর, এবং তিনটি ফ্রাঙ্কিস পাখি, যেগুলো বিষযুক্ত খাবার দিলে ডাক দিত এবং ডানা মেলে উড়তে পারত।

এই দূত সঙ্গে একটি গোপন বার্তাও বহন করছিল। উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুত্ব ও বিবাহ জোটের প্রস্তাব পাঠানো এবং নিজেকে ফ্রাঙ্কদের রানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাগদাদের খলিফা তার প্রভাবিত অঞ্চলে যথাযথ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমঝোতা আনতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে তার এ উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পত্র ও উপহার খলিফার কাছে কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে না পারলেও কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা হয়।

এই ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় যে, দীর্ঘ দূরত্বের কূটনীতি সেই সময়ে প্রায়শই কার্যকর হতো না। মুসলিম প্রশাসন ও দূরবর্তী শাসনব্যবস্থা এমনকি সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যে জটিল রাজনৈতিক প্রক্রয়াকে নিয়ন্ত্রণে করতে পারত না। বার্থার ব্যর্থতা শুধু তার নিজস্ব রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে নয়; বরং দ্বীপের মুসলিম শাসন ও দূরবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাকেও তুলে ধরে।

সিসিলিতে আঘলাবি শাসনের সময়, স্থানীয় খ্রিষ্টানরা প্রায়শই নিয়মিতভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও, সামাজিক সংযোগ ও কূটনৈতিক মেলামেশার মাধ্যমে তাদের অবস্থান ঠিকই ধরে রাখত। শহরগুলো যেমনঃ প্যালার্মো, আগ্রিজেন্টো, ভ্যাল ডেমন এবং ছোট গ্রামগুলো ক্রমে আরবি ও ইসলামি সংস্কৃতিতে মিশে যেতে থাকে। তবে নাম এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে বৈষম্য ও প্রতিরোধ ক্রমাগত লক্ষ করা যায়।

বার্থার উদাহরণ প্রমাণ করেছে, সেই সময়ে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, ব্যয়বহুল উপহার ও দূরবর্তী শাসনশক্তি কোনো প্রভাবশালী রাষ্ট্রশক্তির নিশ্চয়তা দেয় না। এটি শুধুমাত্র প্রতীকী ও প্রারম্ভিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার রূপে ইতিহাসে রেকর্ডিত হয়েছে। আরও বোঝা যায় যে বার্থার পত্রচারণা ও উপহারের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মুসলিম ও খ্রিষ্টান শক্তি একে অপরের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে জড়িত থাকলেও, দীর্ঘ দূরত্বের কূটনীতি ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর। এভাবেই সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা, দূরবর্তী সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা এবং কৌশলগত সংযোগের দুর্বলতা ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

সিসিলিতে আঘলাবীয় শাসনের দীর্ঘকালীন প্রভাব কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক সীমার মধ্যে থাকেনি; এটি শহরের রাস্তাঘাট, মানুষের ভাষা, এমনকি স্থাপত্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি কোণ স্পর্শ করেছে। আরবি ভাষা প্রশাসনের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। স্থানীয় গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাভাষীরা ক্রমে আরবি শিখতে শুরু করে, অফিস, বাজার, আদালত সবখানে আরবির ছোঁয়া লাগে। এতে একটি নতুন যোগাযোগের বন্ধন তৈরি হয়, যা প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে সহজতর করে।

শহরের সৌন্দর্যও নতুন রূপে গড়ে ওঠে। মুসলিম স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয় মসজিদ, স্নানাগার, বাজার এবং বাগান-নগরী। পালেরমোর রাস্তায় বাগানের ছায়া আর সুবিন্যস্ত বাজার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য দুইই নিয়ে আসে। শৈল্পিক কারিগরি, মূর্তিকলা এবং স্থাপত্যে আরব-বার্বার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পরে ইউরোপীয় স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করে।

সিসিলি হয়ে ওঠে ইউরোপ ও ইসলামিক বিশ্বের সংযোগসেতু। পণ্ডিতরা জ্ঞান বিনিময় করতে এখানে আসেন, বণিকরা বাণিজ্য সম্প্রসারণে আসে, কারিগররা শিল্প ও প্রযুক্তি নিয়ে যাতায়াত করে। শহরের বাজার, বন্দর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভরে ওঠে বহুজাতিক মানুষের সঙ্গে, যেন ভূমধ্যসাগরের এই দ্বীপ একসময়ের জন্য স্থাপন করে নতুন এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতির মিলনক্ষেত্র।

মুসলিম স্থাপত্যে কাতালানি চার্চ, মেসিনা সিসিলি

এভাবেই আঘলাবিদ শাসন শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণই প্রতিষ্ঠা করেনি, সিসিলিকে একটি সমৃদ্ধ, বহু সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তুলেছে।

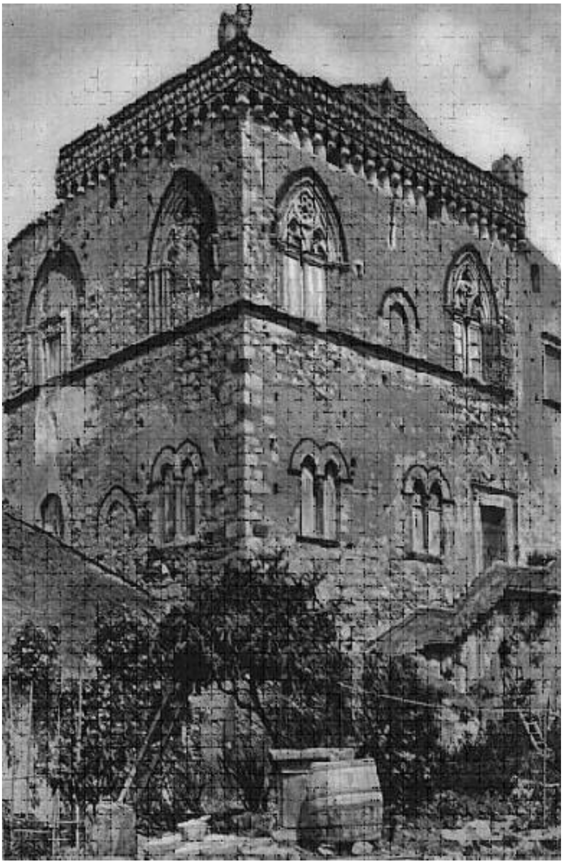

মুসলিম শাসনামলে তাওরমিনার একটি বাড়ি

Justice and knowledge are the foundations upon which the prosperity of a nation rests." inspired by Fatimid principles of governance and scholarship.

নতুন দিগন্তের সূচনা

বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে নতুন আরেক শক্তির উত্থান ঘটে। তারা ছিল ফাতিমি নিজেদের দাবি ছিল আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ও ফাতিমা (রা.)[২০]-এর বংশধর। নবিজির (সা.) কন্যার নামে তাদের নামকরণ হলেও অনেক আরব ইতিহাসকার তাদের ডাকত "উবায়দিয়্যুন" নামে, কারণ তাদের প্রথম নেতা ছিলেন মাহদী আবু উবায়দুল্লাহ।[২১] ফাতিমিরা নিজেদের শুধু রাজনৈতিক শাসকই নয়; বরং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করতে চাইত।

৯০৯ সালের এক অস্থির প্রভাতে উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ানের মিনার থেকে ভেসে এলো এই নতুন নাম। তিনিই ছিলেন "ফাতিমি খিলাফতের" প্রতিষ্ঠাতা, যার উত্থানে পর্দা নামল বহুদিনের আঘলাবিদ শাসনের ওপর। কায়রাওয়ানের প্রাসাদ, যেখানে একসময় আঘলাবিদ আমিরদের ক্ষমতার প্রতিধ্বনি শোনা যেত, এখন ফাতিমিদের পতাকায় ঢেকে গেল। উত্তর আফ্রিকাজুড়ে এক নতুন রাজনৈতিক দিগন্ত খুলে গেল, যার আলো বা ছায়া ধীরে ধীরে পৌঁছাতে লাগল সিসিলিতেও।

যদিও সিসিলি তখনও নামমাত্র আঘলাবিদ শাসনের অধীন ছিল, কিন্তু পালেরমোর মসজিদে খুতবার ভাষায় পরিবর্তন এলো। আঘলাবিদ আমিরদের নামের জায়গায় উচ্চারিত হতে লাগল নতুন খলিফা, আল-মাহদি বিল্লাহর নাম। নামাজে, প্রশাসনিক দপ্তরে, এমনকি মুদ্রাতেও দেখা গেল সেই প্রতীকী আনুগত্যের ছাপ। এটা ছিল একপ্রকার ঘোষণা সিসিলি এখন নতুন খিলাফতের প্রতি অনুগত, অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে।

---

[20] আলী (রা.) রাসুল (সা.)-এর জামাতা ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা। এবং ফাতিমা (রা.) রাসুল (সা.)-এর কনিষ্ঠকন্যা এবং হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর মাতা।

[২১] মাহদি আবু উবায়দুল্লাহ, যিনি ইতিহাসে উবায়দ আল্লাহ আল-মাহদি বিল্লাহ নামে পরিচিত, ছিলেন ফাতিমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও উত্তর আফ্রিকায় প্রথম শিয়া ইসমাইলি শাসক, যার নেতৃত্বে আঘলাবিদ আমিরাতের পতন ঘটে এবং একটি নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা হয়।

তবে বাস্তবতা ছিল আরও জটিল। গভর্নর "আল-হাসান ইবনে আল-আব্বাস" দ্রুত ফাতিমিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, কিন্তু দ্বীপের ভেতরে একতার বদলে দেখা দেয় বিভক্তি। স্থানীয় আরব ও বার্বার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শুরু হয় মতভেদ কেউ নতুন খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত, আবার কেউ এখনও পুরনো আঘলাবিদ ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত। পালেরমোর প্রাসাদের ভেতরে রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ চলতে থাকে, আর গ্রামীণ অঞ্চলে শোনা যায় গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস।

৯১২ সালের দিকে সিসিলি নতুন করে অস্থির ভারসাম্যে দাঁড়িয়ে ছিল একদিকে পুরনো শাসনের স্মৃতি, অন্যদিকে নতুন খিলাফতের ছায়া। কিন্তু এই অস্থিরতার মাঝেই দ্বীপটি প্রস্তুত হচ্ছিল এক নতুন যুগের সূচনার জন্য, যা পরবর্তীতে ফাতিমিদের অধীনে সিসিলিকে আরেক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধ্যায়ে পৌঁছে দেবে।

ফাতিমিদের শাসন সিসিলিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও শুরুতে তা ছিল অনেকটাই পরোক্ষ। কায়রাওয়ান থেকে গভর্নর নিযুক্ত করা হতো, কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় আমিররা প্রায় স্বাধীনভাবেই দ্বীপ পরিচালনা করতেন। তবুও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন খিলাফত দ্বীপের প্রশাসনে নিজের ছাপ রাখতে শুরু করে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক "কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত শাসনব্যবস্থা", যা আগের আঘলাবিদ কাঠামোকে পুনর্গঠন করে দেয় নতুন রূপে।

এই সময় ফাতিমি প্রশাসন শুরু করে "বিস্তৃত সংস্কার কার্যক্রম"। রাজস্ব বিভাগ "দেওয়ান আল-খারাজ" নতুনভাবে সাজানো হয় ভূমি কর, বাণিজ্য শুল্ক ও শস্য রাজস্বের হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে কায়রাওয়ানের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। পাশাপাশি "দেওয়ান আল-জুন্দ", অর্থাৎ সেনা বিভাগও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়, যাতে সৈন্যসংগঠন ও রসদব্যবস্থা আরও কার্যকর হয়। ফাতিমিরা নতুন করনীতি চালু করেন, যা আগের আঘলাবিদ ব্যবস্থার তুলনায় ছিল অধিক নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ।

"পালেরমো (আরবিতে-Bal'harm)" এই সময় ফাতিমি সিসিলির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরটি বাণিজ্য, নৌচালনা ও জাহাজ নির্মাণে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর বন্দরজুড়ে তখন ভেসে বেড়াত ফাতিমি পতাকা, আর দূরদূরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসত বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্য।

ফাতিমি শাসকরা উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে সিসিলির সমুদ্রপথের যোগাযোগ আরও জোরদার করেন। এ সময় দ্বীপটি হয়ে ওঠে "ফাতিমিদের কৌশলগত নৌঘাঁটি", যেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক পথ ও সামরিক রুট উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। এই পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই সিসিলি ফাতিমি খিলাফতের প্রশাসনিক ও

অর্থনৈতিক জালের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে ইসলামি শাসনের নতুন শৃঙ্খলা ও ভূমধ্যসাগরীয় উন্মুক্ততার এক মিশ্র সুর বাজতে থাকে।

ক্যামব্রিজ ক্রনিকলের সাক্ষ্যে আমরা দেখি, ৯২৬-৯২৭ সালের পরবর্তী সময়গুলোতে সিসিলিতে মুসলিম শাসকরা দ্বীপের শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে পরবর্তীতে সবকিছু পাল্টে গেল। পালেরমোতে টানা দুই মৌসুম অতিবৃষ্টির ফলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলো, তার পরপরই এলো এক বছরের তীব্র ফসলহানি। দুর্ভোগে নাজেহাল মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল, আর সেই রাগ গিয়ে পড়ল আমিরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপর। আগ্রিজেন্টো অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, যার প্রতিধ্বনি মুহূর্তেই সারা দ্বীপে পৌঁছে গেল।

প্রথম আঘাতেই বিদ্রোহীরা শক্ত প্রতিরোধ দেখাল। তারা শহরের অবরোধ ভাঙল, সেনাদের ধাওয়া করে দ্বীপের নানান অঞ্চলে আক্রমণ চালাল। পালেরমোর ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ এতটাই বেড়ে উঠল যে শহরটি নিজেই অবরোধের মুখে পড়ে গেল। ৯৩৭ সালের শরতে কায়রাওয়ান থেকে পাঠানো হলো অভিজ্ঞ সেনানায়ক খালেল ইবনে ইশহাককে। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী পালেরমোতে দৃঢ় কেল্লাশৈলীর সরকারি দপ্তর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন, যার নাম দেওয়া হলো ‘খালিসা’। এখানেই প্রশাসনের কেন্দ্র, গভর্নরের নিরাপত্তা, সৈন্যদের ব্যারাক, কারাগার, স্নানাগার এবং অস্ত্রাগার দাঁড়িয়ে গেল। সেনানায়ক খালেল এই শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলে বিদ্রোহ দমন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম সিসিলির অনেক দূর মাজারা, ক্যালটাভুটুরো, ক্যালটাবেল্লোটা, কলেসানো ও প্লাটানি পর্যন্ত। এসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। তারা এমনকি বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছেও সাহায্য ও সরবরাহ চাইতে শুরু করল।

এই সময়ে প্রকৃতিই যেন মানুষের পরীক্ষা নিতে নামল। ৯৪০ সালে দ্বীপে ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। শস্যহীন ভূমি, অনাহারে কাতর মানুষ অবশেষে আগ্রিজেন্টো বিদ্রোহীরা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করল খালেলের বাহিনীর কাছে। ৯৪১ সালে তিনি বিজয়ীর মতো আফ্রিকায় ফিরে গেলেন।

যদিও কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে বিদ্রোহের কারণ ছিল করসংক্রান্ত বিরোধ, কিন্তু আসল কারণ ছিল আরও গভীরে প্রোথিত। বিশিষ্ট জুরিস্ট আল-দাউদী লিখেছেন যে, এই সংঘাতের শেকড় ছিল জমি ও বসতি স্থাপন নিয়ে। আগ্রিজেন্টোর ইতিহাস তাই হয়ে উঠল দাবি-দাওয়ার অন্তহীন দ্বন্দ্ব। শহরটি প্রথম বিজয়ের পর পরিত্যক্ত ছিল। ৮২৮-৮২৯ সালে বাইজেন্টাইন বিদ্রোহী

ইউফেমিয়োস আঘলাবিদদের সঙ্গে যুদ্ধে শহর দখল করে। এর পর মুসলিমরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, জমি চাষ করে, উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতি চালু করে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধন হয়। এভাবে একটা সময়ের জন্য দ্বীপের বাসিন্দাদের মাঝে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

এই স্থিতিশীলতারও স্থায়িত্ব বেশি দিন টিকেনি। বহু বছর পর শান্তি ভেঙে গেল নতুন বসতি গড়ার প্রয়োজনে। নির্মাণ ও অবকাঠামোর উন্নয়নের কাজে কাঠ দরকার হলে আগ্রিজেন্টোর মানুষ তা দিতে অস্বীকার করে। আর প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় কিছু মানুষের এই অসহযোগিতার পিছনে মূল হাত ছিল কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ইন্ধন। এক দিকে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতা, এই পরিস্থিতিতে শাসক ও সাধারণ নাগরিকদের মাঝে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতিতে এর চূড়ান্ত রূপ হিসেবে আবার শুরু হয় যুদ্ধ। এই সমগ্র ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল সিসিলির প্রশাসনিক কাঠামো। এখান থেকে জন্ম নিল নতুন এক দ্বন্দ্বময় পরিচয়, যেখানে সিসিলিয়ান মুসলিম ও আফ্রিকান মুসলিমরা ধীরে ধীরে ভিন্ন সত্তায় দাঁড়িয়ে গেল। দ্বীপের ইতিহাসে এটি হয়ে উঠল দীর্ঘ অস্থিরতার এক অনিবার্য ভূমিকা।

নবম শতকের শেষ ভাগের সুশৃঙ্খল ফাতিমি শাসনের ভিত দশম দশকের শুরুতে এসে টলতে শুরু করল। সিসিলি তখন আর আগের মতো একক ক্ষমতার অধীনে নেই; বরং দ্বীপজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক অদৃশ্য অস্থিরতা। স্থানীয় আরব, বার্বার ও দাস-সেনাদের (সাকালিবা) মধ্যে শুরু হলো তীব্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অনেক সময় এসব সেনাপতি বা গভর্নর ছিলেন খোঁজা বা প্রাক্তন দাস, যারা ধীরে ধীরে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ফলাফল এক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জায়গায় তৈরি হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক প্রভুত্ব।

এই সময় সিসিলির রাজনীতিতে আবির্ভূত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রভাবশালী নাম, যাদের একজন ইবনে আল-থুমনা আর অন্যজন আল-আখল। একদিকে তারা ফাতিমিদের আনুগত্য দাবি করতেন, অন্যদিকে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারে লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে বিরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ফাতিমি শাসনের মূল কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেয়। কায়রাওয়ানের দূর থেকে ফাতিমি খলিফারা তখন কেবল নামমাত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন।

এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নেয় বাইরের শত্রুরা। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, যাদের একসময় সিসিলি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, তারা আবার সক্রিয় হয়ে

ওঠে। সমুদ্রপথে আক্রমণ শুরু হয়, এবং দক্ষিণ ইতালির উপকূল-কালাব্রিয়া ও আপুলিয়া ধীরে ধীরে তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হতে থাকে। বাইজান্টাইন নৌবহর আবারও ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্তে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়।

ফাতিমিরাও নিশ্চুপ ছিলেন না। ৯৬০ দশকে তাদের নৌবাহিনী একাধিকবার বাইজান্টাইন বন্দর ও উপকূলজুড়ে তীব্র আক্রমণ করে। সিসিলির বন্দর থেকে জাহাজ রওনা হয় প্রতিশোধের অভিযানে। তবুও স্থলভাগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরেনি। স্থানীয় আমিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দাসসৈন্যদের বিদ্রোহ আর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতা সব মিলিয়ে সিসিলি তখন যেন আগুনের নিচে রাখা এক পাত্র, যার ভেতরে ফুঁসে উঠছিল ক্ষমতার লড়াই ও অস্থিরতার গর্জন।

ওদিকে আফ্রিকাতে ফাতিমিদের জন্য তখন পরিস্থিতি ছিল ভয়ংকর। হঠাৎই আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়া একদল খারিজি[২২] বিদ্রোহ করে বসে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল বার্বার বিদ্রোহী আবু ইয়াজিদ। তার এই বিদ্রোহ এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, এই অঞ্চলে ফাতিমি সাম্রাজ্য প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। ৯৪৫ সালের পুরোটা সময় এক অজানা আতঙ্কের মধ্যে কাটে যে, প্রধান নগরী মাহদিয়ার যেকোনো সময় পতন হতে পারে। তবে ভাগ্যক্রমে ৯৪৮ সালে পরিস্থিতি কিছুটা বদলায়। ফাতিমিরা এই অঞ্চলের রাজধানী ও প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র মাহদিয়া থেকে সরিয়ে কায়রাওয়ানের নিকটবর্তী এক শহরে স্থাপন করে। আর নতুন সেই শহরকে “মানসুরিয়া”[২৩] নামে নামকরণ করা হয়। একদিকে সিসিলির পালেরমতোতে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, আর অন্যদিকে আফ্রিকার রাজধানী কাঁপছে অনিশ্চয়তায়। ঠিক তখনই আরব-আফ্রিকান ‘বানু ল-কালব’ পরিবারকে সিসিলির শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

---

[২২] খারিজি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক রাজনৈতিক-ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার সিফফিন যুদ্ধের সালিশ প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে পৃথক হয়ে যায়। তাদের মূল বিশ্বাস ছিল যে নেতৃত্ব কেবল বংশ বা গোত্র নয়, বরং তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত, এবং যে কেউ বড় গোনাহ করবে তাকে তারা ইসলামের বাহিরে বলে বিবেচনা করত। নীতিগতভাবে অত্যন্ত কঠোর এই গোষ্ঠী পরে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট আন্দোলন ও বিদ্রোহের জন্ম দেয়, যা ইসলামি রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলে।

[২৩] মানসুরিয়া ছিল ফাতিমি খলিফাদের নবনির্মিত রাজধানী, যা ৯৪৮ সালে খলিফা আল-মানসুর বিল্লাহ কায়রাওয়ানের নিকটে প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রই নয়, বরং ফাতিমি সাম্রাজ্যের নতুন শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক ছিল। পরিকল্পিত প্রাসাদ, প্রশাসনিক দপ্তর, মসজিদ ও বাগাননগরী ঘিরে গড়ে ওঠা মানসুরিয়া সেই সময় উত্তর আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। এখান থেকেই ফাতিমিরা সিসিলি ও সমগ্র পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে তাদের শাসন পরিচালনা করত, যতদিন না তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র মিশরের কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়।

৯৪৭ সালে পালেরমোতে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তা একটি গভীর সমস্যার প্রতিফলন। সিসিলিয়ান আরব জ্ঞানী ও অভিজাতরা তখন ইতালিয় উপকূলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত। দক্ষিণ ইতালির বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি (হুদনা) কার্যকর ছিল, যার ফলে স্থানীয় অভিজাত পরিবারগুলো সরাসরি যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ না নিলেও আর্থিক সুবিধা পেত। কিন্তু হঠাৎ করেই বাইজেন্টাইনরা তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ (মাল আল-হুদনা) দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সিসিলির আমিরও এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিলেন না। ফলে জুন্ডদের অর্থাৎ সৈন্যদেন প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অচিরেই অসন্তোষ রূপ নেয় অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহে। ৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে, রমজানের শেষ ভাগে, পালেরমোর গভর্নর ও তাঁর সৈন্যদের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন ফেটে পড়ে।

এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল শক্তিশালী পরিবার 'বানু ল-ঈবারি'। নাম থেকেই বোঝা যায়, তাদের পূর্বপুরুষরা আব্বাসিদের পূর্ব প্রদেশ থেকে এসেছে এবং পুরনো আঘলাবিদ সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

বিদ্রোহ দমন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আল-হাসান ইবনে আলীকে, যিনি তিউনিসের প্রাক্তন গভর্নর এবং বানু ল-কালবের আরব বংশোদ্ভূত একজন সদস্য। তিনি ইতিমধ্যেই আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ দমনকালে নিজের সামরিক দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন, যা ইমাম-খলিফা আল-মানসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৯৪৮ সালের বসন্তে তিনি মাজারায় পৌঁছে তার দায়িত্ব নেন। জুন্ড ও কুতামা (সেনাবাহিনীর দুইটি শাখার নাম) সৈন্যদের পাশে নিয়ে তিনি সিসিলির শাসনভার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে ৯৬০ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনিই দ্বীপের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন। তাঁর হাতেই সিসিলির আমিরত্ব একটি বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

৯৫০ সালে কালবিদদের সঙ্গে বাইজেন্টাইনদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ইতালিতে বাইজেন্টাইন সামরিক সম্প্রসারণের মোকাবিলায় ফাতিমি-কালবিদ বাহিনী ক্যালাব্রিয়ায় অভিযান চালায়। এটি প্রমাণ করে, ইসলামিক সিসিলির শীর্ষ ক্ষমতার সময়েও আমিররা প্রায়ই আফ্রিকার সামরিক সহায়তার ওপর নির্ভর করত।

এইসব অভিযানের ফলাফল ছিল মিশ্র। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে রেজ্জিওতে। ইবনে আল-আসীর বর্ণনা করেন, আল-হাসান শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করান। এর এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল উঁচু মিনার। বাইজেন্টাইনদের শর্ত দেওয়া হয়, মুসলিমরা এখানে নিরাপদে নামাজ আদায়

করবে, মসজিদের পবিত্রতায় খ্রিষ্টানরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, আর কোনো মুসলিম বন্দি এখানে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ থাকবে। যদি খ্রিষ্টানরা এর একটি পাথরও নষ্ট করে, তবে সিসিলি ও আফ্রিকার প্রতিটি গির্জা ধ্বংস করা হবে। বিস্ময়করভাবে, বাইজেন্টাইনরা এই সব শর্ত বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়।

রেজ্জিওর এই ঘোষণা কেবল কোনো প্রতিকী ঘোষণা ছিল না; বরং ইতালিয় উপদ্বীপের প্রান্তে মুসলিম ধর্মীয় উপস্থিতিকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার সাহসী ঘোষণা। অথচ এই শহর ৯১৮ থেকে ৯৩০ সালের মধ্যে অন্তত পাঁচবার অবরোধের মুখোমুখি হয়েছিল। মসজিদটি তাই একাধারে ধর্মীয় প্রতীক ও সামরিক সাফল্যের অন্যতম স্মারক।

৯৫০-এর দশকে এই ধারাবাহিক সাফল্য কালবিদদের সিসিলির সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত আরব গভর্নর পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ বংশানুক্রমিক ক্ষমতা আরও দৃঢ় হয় আল-হাসানের পুত্র আহমদের (৯৫৩-৯৬৯/৭০) শাসনকালে। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামিক সিসিলি আরও স্থিতিশীলতা, শক্তি ও সম্পদের ভিত্তি গড়ে তোলে। এদিকে পালেরমোতে নগরায়ণ বাড়তে থাকে। নতুন করে নির্মিত দুটি শহরের গেট নির্মাণ করা হয়, সড়ক যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়।

তবে রেজ্জিওর মসজিদ নির্মাণ, যেটা মুসলিম ক্ষমতার এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে ছিল, তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। ৯৫৫-৯৫৬ সালে বাইজেন্টাইনরা ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদটি ধ্বংস করে ফাতিমিদের ঘোষিত 'শর্ত' ভেঙে দেয়।

পরবর্তী বছরগুলোতে কালবিদ ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে যুদ্ধ, ছোটখাটো সংঘর্ষ, অস্থির শান্তিচুক্তি চলতেই থাকে। কখনো বিজয়, কখনো ভয়াবহ ক্ষতি, তবুও এ সবকিছু মিলেই সিসিলিকে পরিণত করেছিল মুসলিম ও খ্রিষ্টান শক্তির টানাপোড়েনের এক অনন্য মঞ্চে।

৯৬৯ সালের গ্রীষ্মে। সেখানে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় "ফাতিমিরা মিসর জয়" করে এবং প্রতিষ্ঠা করে তাদের নতুন রাজধানী, "আল-কাহিরা", অর্থাৎ কায়রো। নীলনদের তীরে গড়ে ওঠা এই শহর শুধু ফাতিমি সাম্রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক হৃদয়ই নয়, পুরো ইসলামি বিশ্বের এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিজয়ের সাফল্যের আড়ালেই সিসিলির ভাগ্যে নেমে আসে একধরনের দূরত্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় দিক থেকেই।

কায়রাওয়ান ও মানসুরিয়া থেকে ক্ষমতার কেন্দ্র যখন কায়রোয় সরে যায়, তখন সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকা রয়ে যায় নতুন সাম্রাজ্যের প্রান্তভূমিতে। কায়রোর খলিফারা দ্বীপের শাসনে সরাসরি মনোযোগ দিতে পারতেন না, ফলে "সিসিলির গভর্নররা ক্রমে স্বায়ত্তশাসিত" হয়ে ওঠেন। তারা নামমাত্র ফাতিমিদের আনুগত্য বজায় রাখলেও, বাস্তবে স্থানীয় আরব ও বার্বার গোষ্ঠীর ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করেই শাসন পরিচালিত হতো।

এই দুর্বল প্রশাসনিক সংযোগের মধ্যেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আবারও সুযোগ খুঁজে পায়। ৯৭২ সালে, তারা পূর্ব সিসিলিতে নতুন করে প্রতি-আক্রমণ চালায়। মুসলিম বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু যুদ্ধের অভিঘাতে দ্বীপের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আরও নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় আমিরদের মধ্যে ক্ষমতার টানাপোড়েন বাড়ে, আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে আলগা হতে থাকে।

ফাতিমিদের জন্য কায়রোর উত্থান যেমন ছিল গৌরবের প্রতীক, তেমনি সিসিলির জন্য তা ছিল এক নীরব বিচ্ছিন্নতার সূচনা একসময়কার ভূমধ্যসাগরীয় শক্তিধর দ্বীপ তখন ধীরে ধীরে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে।

দক্ষিণ ইতালিতে বাইজেন্টাইনদের প্রভাব, যা আগে কেবল ক্যালাব্রিয়া আর আপুলিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নবম শতকের শেষভাগ থেকে দশম শতকের ষাটের দশকে আবারও প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করে। ৯৬১ সালের মার্চে, বহু বছরের অবরোধের পর মুসলিম আমিরাত ক্রেটের পতন ঘটে। এ অবরোধের নেতৃত্বে ছিলেন উদ্যমী গ্রিক সেনাপতি দ্বিতীয় নিকেফরোস ফোকাস যিনি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সম্রাট হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আছেন। তাঁর অদম্য সামরিক দক্ষতার সামনে মুসলিম ক্রেটের সামরিক শক্তি ভেঙে পড়ে। আর মাত্র চার বছর পর বাইজেন্টাইনরা ৯৬৫ সালে সাইপ্রাস দখল করে, যার ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মুসলিমদের নৌ-শক্তি কার্যত ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

এই সময় ফাতিমিয়-কালবিদ শাসকেরা সিসিলি থেকে মূল ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে দক্ষিণ ইতালিতে প্রভাব বিস্তার করলেও ক্যালাব্রিয়ার গ্রিকরা নিরাপত্তার জন্য উঁচু পাহাড়ে গড়ে তোলে দুর্গনগরী। তবুও সিসিলি থেকে চালানো মুসলিমদের আকস্মিক হামলা দক্ষিণ ইতালির মানুষের কাছে এক স্থায়ী আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাগদাদের খলিফা আল-মুঈজ্জ (৯৫৩-৯৭৫) যথাসময়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে না পারায় মুসলিম ক্রেট রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্রেট, সাইপ্রাস[২৪] ও সিসিলি-

---

২৪ ক্রেট (Crete): ক্রেট দক্ষিণ গ্রিসে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের পঞ্চম বৃহত্তম দ্বীপ। এর আয়তন প্রায় ৮,৩৩৬ বর্গকিলোমিটার এবং রাজধানী হলো হেরাক্লিয়ন। দ্বীপটি প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার জন্য বিখ্যাত,

মধ্যযুগীয় মুসলিম মানচিত্রে তিনটি জ্বলজ্বলে নক্ষত্র পরপর ফাতিমিদের হাতছাড়া হতে থাকে। এই ধাক্কাই সিসিলিতে সরাসরি বিজয় নিশ্চিত করার জন্য মুসলিম শাসকদের চোখ ফেরাল।

উল্লেখ্য যে, সাইপ্রাস ও ক্রেট ছিল ভূমধ্যসাগরের কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দ্বীপ, যেগুলো ইতিহাসে মুসলিম ও খ্রিষ্টান শক্তির দ্বন্দ্বের মূলে অবস্থান করেছে। মুসলিম শাসনামলে এই দ্বীপগুলোর গুরুত্ব বোঝা যায় সামরিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে। প্রথমত, এগুলো ছিল নৌ-অভিযানের ঘাঁটি। মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাস বা ক্রেট দখল করে এজিয়ান সাগরে আক্রমণ চালাতে পারত এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নৌ শক্তিকে চাপে রাখত। দ্বিতীয়ত, কৃষিজ উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে এগুলো ছিল অর্থনৈতিকভাবে আকর্ষণীয়। সাইপ্রাস তামা, চিনি ও কৃষিজ পণ্যের জন্য পরিচিত ছিল; ক্রেটের উর্বর ভূমি অলিভ তেল ও আঙুর উৎপাদনে সহায়ক ছিল। তৃতীয়ত, ভূমধ্যসাগরে মুসলিম উপস্থিতি প্রতীকী অর্থেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ দ্বীপগুলোর মাধ্যমে ইসলামিক শক্তি খ্রিষ্টান বিশ্বের কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পেত।

উল্লেখ্য যে সপ্তম শতাব্দীতে উমাইয়া খলিফাদের সময় সাইপ্রাস মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আসে। ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের (রা.) নেতৃত্বে মুসলিম নৌ-বাহিনী প্রথম দ্বীপ আক্রমণ করে। যদিও বলা হয়ে থাকে খলিফা হজরত ওসমান (রা.) সর্বপ্রথম সাইপ্রাস অভিযানের জন্য নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করেন। কিন্তু, মুসলিম মিল্লাতে অস্থিরতা, বিদ্রোহ আর তার নির্মম শাহাদাতের পর সে অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। সাইপ্রাস সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শাসনের অধীনে না থাকলেও প্রায় তিন শতাব্দী ধরে এটি বাইজেন্টাইন ও মুসলিমদের যৌথ নিয়ন্ত্রণে ছিল। দ্বীপটি একপ্রকার সামরিক ঘাঁটির মতো কাজ করত, যেখান থেকে মুসলিমরা

যা ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ক্রেট রোমান, বাইজেন্টাইন, ভেনেশিয়ান এবং অটোমান শাসনের অধীনে ছিল। অবশেষে ১৯১৩ সালে এটি গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে ক্রেটের অর্থনীতি মূলত কৃষি বিশেষত অলিভ তেল, আঙুর ও সাইট্রাস ফল উৎপাদন-এবং পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল।

সাইপ্রাস (Cyprus): সাইপ্রাস পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ, যার আয়তন প্রায় ৯,২৫১ বর্গকিলোমিটার। এর রাজধানী হলো নিকোসিয়া। দ্বীপটির ইতিহাস সমৃদ্ধ এবং এতে ফিনিশীয়, গ্রিক, রোমান, বাইজেন্টাইন, ভেনেশিয়ান, অটোমান ও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব রয়েছে। ১৯৬০ সালে সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করে, তবে ১৯৭৪ সালের রাজনৈতিক সংকটের পর থেকে এটি বিভক্ত হয়ে আছে। দক্ষিণাংশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রিপাবলিক অব সাইপ্রাসের নিয়ন্ত্রণে, আর উত্তরাংশ তুরস্কের সমর্থিত উত্তর সাইপ্রাসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যেটি শুধু তুরস্ক স্বীকৃত করেছে। আজকের দিনে সাইপ্রাসের অর্থনীতি মূলত পর্যটন, বাণিজ্য, আর্থিক খাত এবং জাহাজ চলাচলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে

এজিয়ান অঞ্চলে অভিযান চালাত। তবে ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট নিকিফোরোস-ফোকাস সাইপ্রাস পুনর্দখল করলে মুসলিম শক্তির নৌ অভিযান দুর্বল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে ক্রেট মুসলিম শাসনের অধীনে আসে নবম শতকে। আন্দালুসিয়া থেকে আগত মুসলিমরা দ্বীপটি দখল করে ক্যান্ডিয়া (বর্তমান হেরাক্লিয়ন) রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলে। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে ক্রেট ছিল মুসলিম ও নৌবাহিনীর ঘাঁটি। এখান থেকে তারা এজিয়ান সাগরের গ্রিক উপকূল আক্রমণ করে বাইজেন্টাইনদের বিপর্যস্ত করে রাখে। তবে ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে নিকিফোরোস ফোকাস কঠিন যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রেট পুনর্দখল করে। এ ঘটনা মুসলিমদের জন্য একটি বড় আঘাত ছিল, কারণ তারা পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি হারায়।

তবে মুসলিম উপস্থিতি এখানেই শেষ হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আবারও ভূমধ্যসাগরে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। ১৫৭০-৭১ সালে অটোমানরা সাইপ্রাস দখল করে নেয়, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভেনেশিয়ানদের পরাজিত করে দ্বীপটিকে অটোমান প্রদেশে রূপান্তরিত করে। সাইপ্রাস তখন মুসলিম প্রশাসন ও বসতির নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং চার শতাব্দী ধরে অটোমান শাসনের অধীনে থাকে।

ক্রেট অটোমানদের হাতে আসে কিছুটা পরে। ১৬৪৫ থেকে ১৬৬৯ পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ বছর ধরে ভেনিস ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলে, যা ইতিহাসে "ক্রেট যুদ্ধ" নামে পরিচিত। অবশেষে ১৬৬৯ সালে অটোমানরা ক্রেট সম্পূর্ণভাবে দখল করতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিম শাসন আবারও দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি প্রায় দুই শতাব্দী ধরে অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তি ও স্থানীয় খ্রিষ্টান বিদ্রোহীদের উত্থানের ফলে অটোমানরা ধীরে ধীরে এসব দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। ১৮২১ সালের গ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ক্রেটে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অটোমান শাসন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৯৮ সালে ক্রেট কার্যত অটোমানদের হাতছাড়া হয় এবং ১৯১৩ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত হয়। সাইপ্রাসও ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ প্রভাবের অধীনে আসে এবং ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, যদিও নামমাত্র এটি অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশরা দ্বীপটি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করে নেয়।

সাইপ্রাস ও ক্রেটের হাতছাড়া হওয়া মুসলিম বিশ্বের জন্য গভীর প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। একসময় যেসব দ্বীপ থেকে মুসলিম নৌবাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় শক্তিকে চাপে রেখেছিল, সেগুলো হারানো মানে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম প্রভাবের অবসান। রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে এগুলো হারানো মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে, আর মানসিকভাবে এটি ছিল সামুদ্রিক শক্তির একটি সোনালি অধ্যায়ের সমাপ্তি। এই দ্বীপগুলোর দখল ও হাতছাড়া ইতিহাসে প্রমাণ করে, ভূমধ্যসাগরের ভূরাজনীতি গড়ে ওঠে কেবল মহাদেশীয় শক্তির দ্বন্দ্ব নয়; বরং দ্বীপসমূহের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও।

৯৬৩ সালের আগস্টে, উত্তর-পূর্ব সিসিলির শেষ খ্রিষ্টান ঘাঁটি রোমেত্তাও অবরোধে পড়ে। এ যেন দ্বীপের নিয়ন্ত্রণের জন্য চূড়ান্ত সংঘর্ষ। নতুন সম্রাট নিকেফরোস ফোকাস বিশাল বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, সম্ভবত সিসিলি পুনর্দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বাইজেন্টাইনরা মেসিনায় অবতরণ করে সাফল্যের সঙ্গে শহর ও আশপাশের এলাকা দখল করে নেয়। কিন্তু রোমেত্তার দুর্গে গিয়ে তারা ভয়াবহ পরাজয়ের শিকার হয়। শেষমেশ ৯৬৫ সালে 'প্রণালি যুদ্ধ'[২৫] (ওয়াকিআত আল-মাজাজ)-এ বাইজেন্টাইন সেনারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

এই বিপর্যয় কনস্ট্যান্টিনোপলের জন্য ছিল ভয়ংকর আঘাত। তারা যখন পূর্ব সীমান্ত ও থ্রেসে তাদের প্রধান সামরিক শক্তি নিয়োজিত রেখেছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে এই ব্যয়বহুল পরাজয় ফাতিমিদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনে। শান্তি চুক্তি

---

[২৫] ৯৬৫ সালের প্রণালি যুদ্ধ মূলত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও মুসলিম আরব বাহিনীর মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সংঘটিত একটি নৌ-সংঘর্ষ। তখন খ্রিষ্টীয়জগতে বাইজেন্টাইন সম্রাট নিকিফোরোস ফোকাস ক্ষমতায় আছেন, যিনি ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে আরবদের দখলে থাকা অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করার চেষ্টা করছিলেন। সাইপ্রাস দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি ছিল এবং এখান থেকে আরব নৌবাহিনী এজিয়ান ও আনাতোলিয়ার উপকূলে আক্রমণ চালাত। নিকিফোরোস এই দ্বীপ দখল করে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করতে চান। প্রণালি যুদ্ধের সময় বাইজেন্টাইন নৌবাহিনী বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে আরবদের মোকাবিলা করে। এ যুদ্ধে "গ্রিক ফায়ার" নামে পরিচিত এক ধরনের অগ্নি অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা শত্রু জাহাজে নিক্ষেপ করলে জাহাজ আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যেত। এই অস্ত্র আরবদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক প্রমাণিত হয়। ফলস্বরূপ আরব নৌবাহিনী পরাজিত হয় এবং সাইপ্রাস মুসলিম প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে। এই যুদ্ধের পর থেকে সাইপ্রাস ধীরে ধীরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং মুসলিম নৌ-অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

৯৬৫ সালের এই সংঘর্ষ কেবল একটি নৌযুদ্ধ ছিল না, বরং ভূমধ্যসাগরের শক্তির ভারসাম্যে একটি মোড় পরিবর্তনের ঘটনা। মুসলিমরা যেভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে এ অঞ্চলে দাপট দেখিয়েছিল, সাইপ্রাস ও আশপাশের প্রণালি হারানোর মাধ্যমে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আবারও তাদের সামুদ্রিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই প্রণালি যুদ্ধ তাই ইসলামি ইতিহাসে এক ধরনের পশ্চাদপসরণ এবং খ্রিষ্টীয় ভূমধ্যসাগরীয় শক্তির পুনর্জাগরণের প্রতীক।

স্বাক্ষরিত হয়, যা ফাতিমিদের মনে ধারণা জন্ম দেয় যে বাইজেন্টাইনরা তাদের আসল শক্তির চেয়ে দুর্বল। অথচ বাস্তবতা ছিল উল্টো: মেসিনা হারানো মুসলিমদের কাছে এক সতর্কবার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সেটিই ছিল মূল প্রবেশদ্বার।

মধ্য দশম শতকে ফাতিমিদের বিজয় ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দক্ষিণ সিসিলিকে নতুনভাবে রূপ দিতে শুরু করে। তাওরমিনা, রোমেত্তা ও অছি এই খ্রিষ্টান শহরগুলো মুসলিম শাসনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। একই সময়ে ফাতিমিদের ক্ষমতার কেন্দ্র আফ্রিকা থেকে মিশরে স্থানান্তরের প্রস্তুতি চলছিল। তাই সিসিলির প্রশাসনিক কাঠামো মজবুত করার চেষ্টা শুরু হয়। ৯৬৭ সালে খলিফা আল-মুঈজ্জ পালেরমোর প্রাচীর নতুন করে গড়ে তোলার নির্দেশ দেন, প্রতিটি প্রদেশে একটি সুরক্ষিত নগরী নির্মাণের আহ্বান জানান যেখানে থাকবে মসজিদ। এটি প্রমাণ করে যে প্রাদেশিক প্রশাসন তখনও কিছুটা অগোছালো ছিল, এবং দ্বীপের শহরগুলিতে জুমা মসজিদের অভাব মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিকাশকের বাধা হিসেবে ইঙ্গিত করছিল।

৯৬৯ সালে আমির আহমদ তার পরিবার নিয়ে আফ্রিকা ফিরে যান। তখন ফাতিমিরা দ্বীপটিকে যথেষ্ট নিরাপদ ভেবে স্থানীয় প্রশাসন এক কালবিদ নিয়ন্ত্রিত ইয়াহিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু খুব দ্রুত পালেরমো ও সিরাকিউজে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ৯৭০ সালে খলিফা আল-মুঈজ্জ ইয়াহিশকে সরিয়ে দিয়ে কালবিদ আবু-ল-কাসিমকে দ্বীপের নতুন আমির নিযুক্ত করেন।

তার শাসনামলে (৯৭০-৯৮২) সিসিলির রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়। আবুল কাসিম এর বিভিন্ন সংস্কার ও পদক্ষেপের ফলে সিসিলি দ্বীপে কালবিদ শাসনে স্থিতিশীলতা ও শক্তি ফিরে পায়। এই সময়ই মুসলিম সিসিলি পৌঁছায় তার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শীর্ষবিন্দুতে।

তবে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য ও ইতালির নতুন সামুদ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির উত্থান সিসিলিকে এক নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের মুখে দাঁড় করায়। পালেরমো, যা ৯৭৩ সালে ইবনে শাওকালের চোখে চূড়ান্ত জৌলুশে পৌঁছেছিল, তখনও বৃহত্তর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণে তেমন কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি।

“রোম” খ্রিষ্টানজগতের বৃহৎ ও গর্বিত নগরী, যেখানে বসবাস করতেন “পোপ”[২৬]। মুসলিম লেখকদের কল্পনায় এই নগরীকে আঁকা হতো এক নিখুঁত বৃত্তাকার শহর

[২৬] পোপ হলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ নেতা এবং ভ্যাটিকান সিটির সার্বভৌম শাসক। ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পদের উৎপত্তি যীশু খ্রিষ্টের প্রেরিত বা শিষ্য সেন্ট পিটার থেকে, যাকে যীশু খ্রিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং যিনি রোমের প্রথম বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন

হিসেবে, যেন ইসলামি বিশ্বের সুবিন্যস্ত শহরগুলো যেমন ফাতিমিদের আল-মানসুরিয়া কিংবা আব্বাসিদের মহিমান্বিত বাগদাদ। কিন্তু এই সাদৃশ্য ছিল কেবল বাহ্যিক। ভেতরে প্রবেশ করলে বোঝা যেত, রোমে ছিল না সেই সমন্বয় কিংবা সাদৃশ্য যা ইসলামি আদর্শে স্বাভাবিক। বরং তাকে চিত্রিত করা হতো এক অদ্ভুত গোলকধাঁধার মতো দুর্গ হিসেবে-প্রবেশ আর প্রস্থানের জন্য কেবল একটি পথ, যার ভেতরে ঢুকে পড়লে আর সহজে বের হওয়া যায় না। আল-বিরুনি ভুলক্রমে তাঁর 'ভারতের ইতিহাস'-এ (১০৩০) রোমকে হিন্দুদের লঙ্কার দুর্গের সঙ্গে মিলিয়েছিলেন, আর মুসলিম কল্পনায় এটি হয়ে উঠেছিল ইয়াভনা-কোটি বা 'ইউরোপীয়দের দুর্গ' হিসেবে।

অন্যদিকে, কালবিদ শাসনের অধীনে পালেরমো ছিল একেবারে ভিন্ন। পুরনো বাইজেন্টাইন নগরীর ভেতরেই নতুন করে প্রসারিত হয়ে এটি ধীরে ধীরে আয়তাকার আকৃতি রূপ নেয়। যার ভেতর দিয়ে মৌসুমী স্রোতের দুটি নদী দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব অক্ষ বরাবর শহরকে ভাগ করে দিয়েছিল। আঘলাবিদ ও ফাতিমিদের সময়ে এর চারপাশে গড়ে উঠতে লাগল নতুন শহর ও জনপদ-ট্রাপানি, মার্সালা, মাজারা, শিয়াক্কা, আগ্রিজেন্টো। উর্বর নদীপথে নতুন বসতি উঠল, বিশেষত পশ্চিম সিসিলিতে, যেখানে খ্রিষ্টানদের উপস্থিতি প্রায় বিলীন। আর পূর্ব সিসিলির শহরগুলো সিরাকিউজ, কাটানিয়া, মেসিনা তেমন উত্থান ঘটাতে পারল না, পাহাড়ি দুর্গনগরী তাওরমিনা ও রোমেত্তা কেবল খ্রিষ্টান প্রতিরোধের নামেই আলোচনায় থাকল।

এই কারণে ইসলামি বিশ্বের ভ্রমণকারীরা প্রায় সবাই পালেরমোকেই বেছে নিতেন। ৯৭৩ সালে, খলিফা আল-মুঈজ্জ মিশরে স্থানান্তরের কিছুদিন পরেই, বিখ্যাত নকশাকার, ব্যবসায়ী ও ফাতিমিদের গুপ্তচর ইবনে শাওকাল এসে দাঁড়ালেন এই ব্যস্ত নগরে। তিনি দেখলেন প্রাণবন্ত, দৃষ্টিনন্দন আরব-মুসলিম শহর, কিন্তু তাঁর লেখায় ছিল কেবল সমালোচনার সুর। মালিকি আলেম ও শিক্ষিত সমাজকে তিনি বিদ্রুপ করলেন, তাদের জ্ঞানকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দেখাতে চাইলেন। হয়তো এর কারণ ছিল পালেরমো ইতিমধ্যেই শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল মুসলিম বিশ্বের মহানগরগুলোর সঙ্গে।

করেছিলেন। 'পোপ' শব্দটি গ্রিক শব্দ pappas বা 'বাবা' থেকে এসেছে। প্রথমদিকে এটি সাধারণ যাজকদের জন্য ব্যবহৃত হলেও, ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে এটি শুধুমাত্র রোমের বিশপের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে পোপের পদমর্যাদা ক্যাথলিক মণ্ডলীর সর্বজনীন প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি লক্ষ করলেন, শহরজুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মসজিদ, যা কেবল কোর্ডোবার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবুও, সিসিলি তাঁর চোখে সব সময় ছিল ইসলামি বিশ্বের প্রান্তভূমি-জনসংখ্যার মিশ্রণ, চলাফেরার বৈচিত্র্য, আর বাইজেন্টাইন উপাদান, যা মনে করিয়ে দিত খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুর উপস্থিতি। এগুলো একদিকে ছিল বিজয়ের সাক্ষ্য, অন্যদিকে দ্বীপটিকে সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করত।

আরেক বিস্ময় ছিল দর্শন ও বিজ্ঞানের নিদর্শন। ইবনে শাওকাল লিখেছেন, কীভাবে অ্যারিস্টটলের মূর্তি যেন অদ্ভুতভাবে টাঙানো ছিল পালেরমোর প্রধান মসজিদের কাঠের বিমে, যা মুসলিম দুনিয়ায় বিরল সম্মানের চিহ্ন। তবে সিসিলি কখনো শিক্ষার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি বা গ্রিক-লাতিন জ্ঞানের প্রধান সেতুবন্ধন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তবে কিছু অনুবাদ হয়েছিল, যেমন ১০৪৩ সালে লুকের সুসমাচার, যা দ্বিভাষার উপস্থিতি প্রমাণ করলেও তা সীমিত পরিসরে রয়ে গিয়েছিল।

তবুও সামাজিক চিত্রটি স্পষ্ট শহরের ছেলেরা ছিল মুসলিম, অথচ মেয়েদের অনেকেই খ্রিষ্টান। যেমনটা পরবর্তীতে আমরা অটোমান শাসনামলে বলকানের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে আলবেনিয়ার দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখতে পাই যেখানে পুরুষরা ছিল মুসলিম আর মহিলারা ছিল খ্রিষ্টান। ইবনে শাওকাল এই বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছিলেন। এতে ফুটে ওঠে দীর্ঘকালীন সংস্কৃতি ও ধর্মের মিশ্রণের জটিল ছবি, যা সিসিলিকে করে তুলেছিল এক অনন্য সীমান্তভূমি, যেখানে সভ্যতা, বিশ্বাস আর ইতিহাস একসঙ্গে মিশে আছে।

ঐতিহাসিক আল-মুকাদ্দেসী সিসিলিকে বলেছিলেন এক সীমান্ত ভূমি, এক অন্তহীন জিহাদের মঞ্চ। দ্বীপটি তখনও বহন করছিল যুদ্ধের দাগ-পরিত্যক্ত গ্রাম, ভাঙা ঘরবাড়ি, নিঃশব্দ জমি। রাজধানীর বাইরে গেলেই চোখে পড়ত ধ্বংসের সেই সাক্ষ্য। এই যুদ্ধমুখী অবস্থানই আঘলাবি শাসনকালে জন্ম দিলো ‘রিবাত’ নামের সামরিক দুর্গগুলির, যা একদিকে ছিল সৈন্যদের আবাস ও সীমান্তের প্রহরী, অন্যদিকে ধার্মিক দাতাদের আকর্ষণের কেন্দ্র।

সুসের সেই বিখ্যাত রিবাত, যেখান থেকে ৮২১ সালে সিসিলির অভিযাত্রীরা রওনা দিয়েছিল, দ্বীপের জয়ের আগমুহূর্তে সংস্কার করা হয়েছিল। এই নকশা, এই স্থাপত্যরীতি ধীরে ধীরে চলে আসে সিসিলিতে। উত্তরের উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা সেই দুর্গগুলো ছিল যেন সতর্কবার্তার মশাল, বাইজেন্টাইন আক্রমণের আভাস

দিলেই পালেরমোকে সজাগ করত। পাশাপাশি, এগুলো বাণিজ্য আর যোগাযোগকেও নিরাপদ করেছিল, আর মানুষের দান ও ধর্মীয় সম্পত্তি তাদের করে তুলেছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু সময়ের স্রোত 'রিবাতকে' পাল্টে দিলো। ফাতিমি শাসনের সময়কার পর্যবেক্ষক ইবনে শাওকাল দেখলেন, এই দুর্গগুলো আর আগের মতো নয়, সেগুলো হয়ে উঠেছে অলস, বেকার আর ভণ্ড লোকদের আশ্রয়স্থল। যোদ্ধার আস্তানা থেকে সরে গেছে ধর্মীয় আশ্রমে। সিসিলির উপভাষায় তখন "মুরাবিতু" শব্দের মানে দাঁড়াল এমন মানুষ, যে মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছে, যেন সামরিক স্মৃতি মুছে গিয়ে বাকি রইল কেবল তপস্যার ছাপ।

মুসলিম সভ্যতায় আত্মরক্ষা ও বিস্তারের জন্য সামরিক শক্তি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ভাঙন, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজে একটি প্রবণতা তৈরি করে অস্ত্রধারণ ও সামরিক প্রতিরোধের পরিবর্তে তপস্যা, জিকির এবং ব্যক্তিগত সাধনায় ঝুঁকে যাওয়া। এই পরিবর্তনের প্রভাব ইতিহাসে একাধিক স্থানে দৃশ্যমান।

পরবর্তীতে বাগদাদের পতন এক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ। ১২৫৮ সালে মঙ্গোলরা যখন আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ আক্রমণ করে, তখন ইসলামি বিশ্বের কেন্দ্র দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খলিফার দরবারে বিলাসিতা ও আধ্যাত্মিক জগতে নিমগ্ন থাকা অভিজাতরা বাস্তব সামরিক প্রতিরক্ষায় খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ফলে মুসলিমরা মঙ্গোলদের সামনে একত্রিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। বাগদাদ শুধু সামরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিল না এমন আক্রমণ প্রতিহত করতে। এর ফলে শহরটি ধ্বংস হয় এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র হারিয়ে যায়।

মুসলিম সিসিলির শেষ দিনগুলোতেও একই রকম প্রবণতা দেখা যায়। নবম শতক থেকে মুসলিমরা সিসিলি দ্বীপে শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা অভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজের একাংশ জিহাদি (এখানে জিহাদ মানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধ) মনোভাবের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবনে মনোযোগী হয়ে ওঠে। ভেনেসিয়ান ও নর্মানদের মতো শত্রুরা যখন ক্রমে শক্তি বাড়িয়ে সিসিলির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন মুসলিম নেতৃত্ব সমন্বিত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও দরবারি

বিলাসিতা সামরিক শৃঙ্খলার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলস্বরূপ দ্বীপটি একসময় খ্রিষ্টান নর্মানদের হাতে চলে যায়।

অস্ত্র ছেড়ে সুফি ও তপস্যার দিকে ঝুঁকে যাওয়া মুসলিম সমাজে একধরনের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়েছিল সুফিবাদ[২৭] প্রসারিত হয়েছিল, সাহিত্য ও দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাইরের আক্রমণকারীরা যখন সুসংগঠিতভাবে আঘাত হানে, তখন প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বাগদাদের মতো বিশ্বনগর ধ্বংস হয় এবং সিসিলির মতো কৌশলগত দ্বীপ হাতছাড়া হয়।

এভাবে বোঝা যায়, আধ্যাত্মিকতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক যদি সামরিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা সভ্যতার স্থায়িত্বকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে। ইসলামি ইতিহাসে বাগদাদের পতন ও সিসিলির হারানো তার অন্যতম প্রমাণ। এ কারণে নর্মানর বিজয়ের সময়, ১০৬১ সালের পর, 'রিবাত' বা 'দুর্গগুলো' আর কোনো কার্যকর সামরিক ভূমিকা রাখতে পারেনি।

স্পেনের পর্যটক ইবনে জুবায়র যখন ১১৮৪ সালে সিসিলিতে এলেন, তিনি রাত কাটালেন কাসর সাঈদে, সম্ভবত আজকের কাস্তেলো সোলান্তো।[২৮] তিনি লিখলেন, "এটি এখনো কার্যকর রিবাত বা দুর্গ–উঁচু প্রাচীর, শক্ত লোহার দরজা, মসজিদ, আবাসস্থল আর নিজস্ব ইমামের অধিষ্ঠান। চারপাশে ছিল কবর আর সেই রহস্যময় ঝরনা-আয়ন আল-মাজনুনা, 'পাগলী নারীর উৎস', যেখান থেকে মানুষ বরকত নিতে আসত।"

[২৭] "সুফিবাদ" ইসলামি আধ্যাত্মিকতার এমন এক ধারা, যেখানে অন্তরের পরিশুদ্ধি, প্রেম, ও আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা সর্বাগ্রে স্থান পায়। এটি বাহ্যিক আচারের চেয়ে অন্তরের অনুভূতি ও আত্মসমর্পণকে গুরুত্ব দেয়। সুফিরা বিশ্বাস করেন, সত্যিকার জ্ঞান ও ঈমান অর্জন সম্ভব কেবল হৃদয়ের জাগরণ ও ধ্যানের মাধ্যমে। ফাতিমি যুগে ও পরবর্তীকালে সুফিবাদ সিসিলি, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের মানবিক ও নন্দনচেতনার এক গভীর সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যেখানে জিকির, সংগীত, ও কবিতার মাধ্যমে মানুষ খুঁজে পেত আল্লাহর সান্নিধ্য।

[২৮] "কাস্তেলা সোলান্তো (Castello di Solanto)": সিসিলির উত্তর উপকূলে পালেরমোর নিকটে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দুর্গ, যা মধ্যযুগে উপকূলীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সমুদ্রের ধারে গড়ে ওঠা এই দুর্গটি একসময় আরব-নর্মান যুগে সামরিক প্রহরীচৌকি ও বাণিজ্যিক নজরদারি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর কৌশলগত অবস্থান পালেরমোর বন্দররক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী শতাব্দীতে সোলান্তো স্পেনীয় ও সিসিলীয় অভিজাতদের গ্রীষ্মকালীন আবাসে রূপ নেয়, তবুও প্রাচীন পাথরের দেয়ালে আজও লুকিয়ে আছে ইসলামি শাসনকালীন সামুদ্রিক কৌশল ও ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের প্রতিধ্বনি। সিসিলির সান্তা ফ্লাবিয়া ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ভিট্টোরিও এমানুয়েল রাস্তা ধরে একটু অগ্রসর হয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করলে এই দুর্গে পৌঁছা যায়। সমুদ্রের ভিতর দিকে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক দুর্গটি।

পালেরমোতেও দেখা যায় রিবাতের ছায়া। নর্মান আমলে সি কাস্টেল কিংবা সান জিওভান্নি দেই লেব্রোসি চার্চ, যা আমাতুস চাস্তেল জেহান নামে উল্লেখ করেছিলেন, সম্ভবত একসময়ের রিবাত। এসব স্থাপনার পাশে ছিল কবর, মাজার, কুব্বা ছোট গম্বুজওয়ালা মাজারঘর। প্যাটার্নোর সীমান্ত বর্ণনায় মুসলিম কবরস্থান, কুব্বা বা গুম্বুজ ও রিবাতের প্রাচীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছু কুব্বা আজও টিকে আছে, যেমন মিনেওর কাপুচিন গির্জার অংশ, যা আসাদ ইবনে আল-ফুরাতের স্মৃতিকে বহন করে, যিনি সিরাকিউজ অভিযানে মৃত্যুর পর সৈন্যদের সঙ্গে এখানে চিরসমাধিস্থ হন। [*তবে সিসিলির মিনেও শহরের কাপুচিন গির্জায় আসাদ ইবনে ফুরাতের কবর আছে-এমন একটি স্থানীয় ঐতিহ্য প্রচলিত থাকলেও এর ঐতিহাসিক প্রমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল ও বিতর্কিত। বেশ কিছু সিসিলীয় লোককথা ও মধ্যযুগীয় ক্রনিকলে বলা হয়েছে যে, ৮২৮ সালে সিরাকিউজ অবরোধের সময় মৃত্যুর পর তাকে ওই অঞ্চলে দাফন করা হয়েছিল। তবে ইসলামি ঐতিহাসিক সূত্রগুলো ইঙ্গিত করে যে তাঁর দাফনের সম্ভাব্য স্থান ছিল তিউনিসিয়ার সোস (Sousse), যেখানে আজও তাঁর নামে একটি মাজার ও স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। মিনেওর কাপুচিন গির্জায় যে সমাধিটিকে তাঁর বলে জনশ্রুতি আছে, সেটি বর্তমানে একটি সাধারণ পাথরের কবর ও পুরনো সমাধিফলকের মতো রয়ে গেছে, কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন নেই। ফলে সেটি এখন ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির সংযোগস্থল হিসেবে টিকে আছে-নিঃশব্দ, অপ্রচারিত, কিন্তু একটি বৃহৎ বিজয় ও সভ্যতা-সংযোগের স্মারককে মনে করিয়ে দেয়।*]

সেখানে কিছু কুব্বা পরে নির্মিত হয়। কোনটি ব্যবহৃত হয়েছে পানিসংক্রান্ত কাজে, কিন্তু তাদের মূল ছাপ রয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্গ থেকে এই সকল দুর্গ হয়ে উঠল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, যেখানে মিলিত হলো সীমান্তরক্ষার ঐতিহ্য ও ধর্মীয় শ্রদ্ধা। রিবাত ও কুব্বার এই বিবর্তন সিসিলির ইসলামি ইতিহাসে রেখে গেল এক অমোচনীয় দাগ-যুদ্ধ, বিশ্বাস, সমাজ ও স্থাপত্যের এক জীবন্ত দলিল।

৯৭০-এর দশকের সিসিলি ছিল এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা দ্বীপ। এখানে যারা যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে চাইত, তারা কালবিদ শাসকদের কাছে নির্দিষ্ট কর প্রদান করেই যেন সেই দায়িত্ব থেকে রেহাই পেত। ইবনে শাওকাল এই চর্চাকে খানিকটা তিরস্কার করে লিখেছিলেন "মানুষ যেন আল্লাহর প্রদত্ত পবিত্র দায়িত্বটাকেই (বায়া) বাজারে বেচে দিয়েছে। জিহাদের পবিত্র অঙ্গীকারকে তারা কেবল আক্রমণেই সীমাবদ্ধ করেছে, কিন্তু নতুন কোনো ভূখণ্ডকে ইসলামের পতাকার তলে আনার জন্য স্থায়ী সংগ্রামে তারা আর অগ্রসর

হয়নি।” মজার বিষয় হলো, ‘বায়া’[২৯] শব্দটির মধ্যে বাণিজ্যিক মানে যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক অর্থও। এর মূল সুরেই লুকিয়ে আছে চুক্তি, শপথ আর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি।

ইতিহাসের অদ্ভুত পরিহাস, মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে কালবিদ ক্ষমতা এতটাই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ল যে, পালেরমোর শেষ আমির হলেন ইবনে আল-বায়াব, যিনি নিজে আদতে একজন বিদেশি ব্যবসায়ী। শহরের পতনের প্রহর গোনার আগমুহূর্তে তাঁর ক্ষমতায় আরোহণ যেন ইবনে শাওকালের তীক্ষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণীকেই সত্য প্রমাণ করেছিল।

দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর অস্থিরতার মাঝেও নবম শতকের শেষ দিকে পালেরমো ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছিল এক সমৃদ্ধ আরব-ইসলামি নগরীতে। ইবনে শাওকাল নিজে যেটিকে বর্ণনা করেছিলেন প্রাণবন্ত শব্দচিত্রে, আর কায়রোর জেনিজা নথিপত্র দিয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ। ব্যবসায়ী, উৎপাদক, দালাল সবাই মিলে গড়ে তুলেছিল শহরের প্রাণশক্তি। কর, মূল্য, ওজন, পরিমাণ সবকিছুর হিসাব-নিকাশ নিয়ে তাদের কোলাহল চলত সকাল থেকে সন্ধ্যা। আর এভাবেই মিটত স্থানীয় বাজারের চাহিদা, আবার দূরের বন্দর ও জনপদের চাহিদাও।

সিসিলির অর্থনীতি ছিল এমন এক জটিল অথচ সমন্বিত কাঠামো, যেখানে গ্রামাঞ্চলের মাঠঘাটের সরবরাহ সরাসরি মিশে যেত শহরের আড়তদার ও বিদেশি ব্যবসায়ীর প্রয়োজনের সঙ্গে। শহরের আশেপাশের বাজারগুলোর চিত্র একেবারেই চোখে দেখার মতো। কোথাও জলপাই বিক্রেতার হাঁকডাক, কোথাও আটা

---

[২৯] “বায়া’” (বাইআহ / البيعة) অর্থ হলো আনুগত্যের অঙ্গীকার বা শপথ। এটি মূলত নেতৃত্ব, শাসন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং তার ন্যায়বিচার ও ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার প্রতিশ্রুতি। কুরআনে বায়া’ সরাসরি এসেছে

أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يَدُ ۚ اللَّهَ يُبَايِعُونَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الَّذِينَ إِنَّ

“নিশ্চয় যারা আপনাকে বায়াত করছে, তারা আল্লাহকেই বায়াত করছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত।” - সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১০

এটি হুদাইবিয়া চুক্তির সময় রিদওয়ানের বায়া’, যেখানে সাহাবারা প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা.)-এর পাশে থাকার শপথ করেছিলেন।

আরও একটি আয়াতে:

الشَّجَرَةِ تَحْتَ يُبَايِعُونَكَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللَّهُ رَضِيَ لَقَدْ

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমাকে বায়াত করেছিল।” - সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১৮

ব্যবসায়ীর গুদাম, আবার কোথাও নকশাকার ও ফার্মাসিস্টদের দোকান। পাশাপাশি লোহাকার, পালিশকারী, শস্যের বাজার, মাছ-মাংসের আড়ত, মসলার দোকান, ফল-সবজির বাজার, মৃৎশিল্পী, দড়ি ও পাত্র তৈরির কারিগর, কাঠমিস্ত্রি, চামড়ার কারিগর, জুতোর ব্যবসায়ী সবাই মিলে গড়ে তুলেছিল নগরজীবনের এক বর্ণময় চিত্র।

এ সবকিছুর কেন্দ্রে ছিল মুদ্রা বিনিময়কারীদের বাজার। তারা শুধু অর্থ অদলবদল করত না, তারা মূলত অর্থনীতির শিরায়-উপশিরায় তরলতার প্রবাহ জোগাতো। সিসিলির অর্থনীতি ছিল এক দৃঢ় দ্বিমুদ্রা ব্যবস্থা রুপা ও স্বর্ণ উভয়েরই ব্যবহার ছিল সমানভাবে প্রচলিত।

অর্থনৈতিক জীবনে ছিল আরেকটি দারুণ ব্যবস্থা কিরাদ, যা লাতিন কমান্ডার সমতুল্য। বিনিয়োগকারীর অর্থ, রাষ্ট্র কিংবা কর্মকর্তার মূলধন এসবের সঙ্গে যুক্ত হতো ব্যবসায়ীর দক্ষতা ও পরিশ্রম। লাভ যেমন ভাগ হতো, তেমনি ঝুঁকিও। এভাবে অর্থনীতি পেত নতুন উদ্যোগের শক্তি, আবার রাজনীতি ও বাণিজ্য একে অপরের সঙ্গে গেঁথে যেত। সত্যিই, রাজনৈতিক স্থিতি ছাড়া সমৃদ্ধ অর্থনীতি কল্পনাই করা যেত না। নতুন বাজারের দ্বার খুললেই আসত অঢেল অর্থ, আবার করের বোঝা কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতা হলে বাজার মুখ ফিরিয়ে নিতো মুহূর্তে।

মুদ্রার কথায় আসা যাক। আঘলাবিদরা যখন সিসিলিতে স্বর্ণ দিনার চালু করতে ব্যর্থ হলো, তখন ফাতিমিরা উদ্ভাবন করল নতুন স্বর্ণমুদ্রা-তারি। ছোট আকারের হলেও এই মুদ্রা দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। লাতিনে একে বলা হতো তারেনুস, গ্রিকে তারিয়ন, আরবিতে রুবায়া। প্রথমে এটি পালেরমোর মণ্ট থেকেই চালু হয়েছিল। দশম শতকের জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য এটি ছিল ভীষণ উপযোগী।

তারির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে আমালফি, সালেরনো আর নেপলসেও। যদিও এর সঙ্গে মুসলিম দুর্গ গারিগ্লিয়ানোর সম্পর্ক ছিল, তবু প্রকৃত অর্থে এটি ছিল আমালফি উপকূলের বাণিজ্যের চালিকাশক্তি। তারি এতটাই কার্যকর ছিল যে নর্মান থেকে স্টাউফেন পর্যন্ত এর প্রচলন চলেছিল, এমনকি আঞ্জেভিন শাসনের আগপর্যন্ত। ছোটখাটো লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হতো কাচের জেটন নামে এক নব্য মূদ্রা ব্যবস্থা-এ যেন প্রকৃতির আদিম বিনিময় প্রথার জায়গা নিচ্ছিল নগদ অর্থব্যবস্থা।

তবে এই বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও শহরের অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল সীমিত। আসল আয়ের উৎস ছিল শাসকদের কাস্টমস, কর, শুল্ক আর নানা

দশমিক কর। খুমস বা পঞ্চমাংশ, উৎপাদন কর, মদ কর, জন কর, সমুদ্র কর, সাধারণ খাজনা, এমনকি মাছ ধরার শুল্ক সব মিলে ভরে উঠত রাষ্ট্রীয় ভান্ডার।

অন্যদিকে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঘটছিল এক 'সবুজ বিপ্লব'। নতুন প্রযুক্তি আর উন্নত সেচব্যবস্থা ফসল ফলাত বহুগুণে। নদী, ঝরনা, কূপ, খাল সবকিছুই কাজে লাগত জমি সেচে, বসতি ও বাজারের বাগান সজীব রাখতে। কানাত পদ্ধতির ভূগর্ভস্থ জলচ্যানেল এখনো পালেরমোর চারপাশে চোখে পড়ে। এ প্রযুক্তির প্রভাব সিসিলিয়ান উপভাষায়ও রয়ে গেছে গাত্তুসো, সায়া, জেব্বিয়া এসব শব্দে তার সাক্ষ্য মেলে।

ইসলামি শাসনের হাত ধরে নতুন ফসল আসতে শুরু করল সাইট্রাস ফল, খেজুর, তুলা, হেনা, আখ। পালেরমোতে পাপিরাসের চাষ হতো, যা দিয়ে তৈরি হতো দড়ি ও উৎকৃষ্ট কাগজ। বলা যায়, এটাই মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রথম কাগজ নথি।

শুধু কৃষিই নয়, দ্বীপে সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদও ছিল-অ্যান্টিমনি, রুপা, লোহা, সীসা, অ্যালাম, সবুজ ভিট্রোল। উপকূলে চলত টুনা ও তলোয়ার মাছ ধরার বিশাল শিল্প, পাহাড়ি চত্বরে চলত পশুপালন। উর্বর ভূমি শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাত না, বরং ইউরোপ-আফ্রিকার বাজারে কাঁচামাল সরবরাহ করত। কখনো কখনো সেই কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে রফতানি হতো আরও বেশি দামে।

সিসিলির ব্যবসায়ীরা মূলধন ঘুরিয়ে বেড়াতেন সমগ্র ভূমধ্যসাগরে স্পেন, আফ্রিকা ও মিশর। কর ও শুল্ক দিতেন, ঝুঁকি নিতেন, পণ্য কখনো হারাত, কখনো বাজেয়াপ্ত হতো। তবু জেনিজা নথি প্রমাণ করে, এই বাণিজ্যই ছিল জীবনের স্পন্দন চিকিৎসা ও শিল্পজাত উদ্ভিদ, মূল্যবান ধাতু, খাদ্য ও মসলা, কাপড়ের জোগান এই দ্বীপ থেকেই যেত চারদিকে।

সিসিলির গ্রামীণ ক্ষেতের উৎপাদনই ছিল এই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাই ফাতিমি ও কালবিদ প্রশাসন বন্দরগুলোতে রফতানি-আমদানির ওপর কঠোর কর বসাত। রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসার এই মিশ্রণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শাসকরাই জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্যবসায়। আফ্রিকার প্রশাসক জাওধার ছিলেন কাঠ ব্যবসায়ী, আর আমির ইয়ুসুফ রাখতেন তেরো হাজার পশু। জাহাজ তৈরিতে কাঠ যেমন প্রয়োজন, তেমনি বহরের ভার টানতে পশুও অপরিহার্য। আধুনিক সময়কার সিন্ডিকেট ব্যবসার মতোই প্রশাসক ও আমীর–উভয়ের এই ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

তবুও সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল ফসল-ধান। বিপুল পরিমান আফ্রিকান স্বর্ণের বিনিময়ে সিসিলির মাঠে ফলানো সোনালি ধান বিক্রি হতো আফ্রিকার বাজারে। এই সব ব্যবসার গুরুত্ব শুধু বাণিজ্যিক নয়, রাজনৈতিকও ছিল। কারণ কৃষিতে সিসিলি ছিল আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশি উর্বর ও সমৃদ্ধ। তাই ১০০০ সালের পর থেকে আফ্রিকার অর্থনীতি ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সিসিলির ফসল আর সম্পদের ওপর।

ছবি- Palermo Cathedral- সিসিলিতে মুসলিম শাসন (৮২৭-১০৯১ খ্রি.) এবং পরবর্তী নরম্যান যুগে মুসলিম কারিগর, স্থপতি ও শিল্পীদের অবদানে এমন স্থাপত্যশৈলী গড়ে ওঠে। এখানে ইসলামী স্থাপত্যের খিলান, জ্যামিতিক নকশা ও অঙ্গনভিত্তিক পরিকল্পনার প্রভাব দেখা যায়।

في الأرض التي حكمها المسلمون، لم يكن الهدوء مطلقًا، إذ غالبًا ما كانت الصراعات الداخلية تهدد وحدة الأمة واستقراره

“যে ভূমিতে মুসলিমরা শাসন করেছিল, শান্তি কখনো সম্পূর্ণ ছিল না; কারণ অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রায়ই জাতির ঐক্য এবং স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলত।”

অস্থিরতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব

৯৯০-এর দশকে (late Kalbid) সিসিলি অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এই শক্তি অত্যন্ত সংবেদনশীল ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করছিল। "কিউরিওসিটিজ"[৩০] গ্রন্থ অনুসারে, সিসিলির ওপর সিংহ নক্ষত্রাংশের ঢালু অবস্থান একধরনের শুভাশুভ প্রভাব ফেলে, যা দ্বীপের জনগণকে বিদ্রোহী এবং শাসনপ্রবণ করে তোলে। এই জ্যোতিষশাস্ত্রগত ধারণা, যদিও আংশিকভাবে রূপক, প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। কালবিদ মুসলিম শাসনের প্রথম প্রজন্মের সাফল্য সিসিলিকে দক্ষিণ ইতালিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে ফাতিমিদের ৯৭০-এর দশকে মিশরে স্থানান্তরের ফলে সিসিলি রাজনৈতিকভাবে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই সাথে, অর্থনৈতিক শক্তি পূর্ব দিকে সরিয়ে যাওয়ায় দ্বীপের বাণিজ্য ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে যায়। কালবিদ আমিররা, যাঁরা ফাতিমিদের আনুগত্য রক্ষা করতেন, দ্বীপের সম্পদকে প্রধানত কর সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং সামরিক অভিযান বা শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতেন।

১০০০ সালের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। আমিররা দ্বীপের উৎপাদন কেন্দ্র ও গ্রামীণ অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। গ্রামীণ প্রধান, চাষি এবং কৃষকদের ওপর নিয়মিত কর আদায় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বড় ও ছোট উভয় ধরনের বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহগুলো কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নাড়া দেয় না, বরং আমিরদের ক্ষমতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ সৃষ্টি করে। বন্দর ও বাজারে কর বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক কার্যক্রমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে, পালেরমোতে ব্যবসায়ীরা স্বল্পসময়কালের জন্য স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যদিও প্রাথমিক সূত্রগুলো এই সংকটের সূচক খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছে, তবে তারা প্রধানত সেনাবাহিনী, গ্রামীণ অঞ্চল এবং দ্বীপের বাইরের সংঘর্ষের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে।

কালবিদরা যেমনি কখনো সাম্রাজ্যবাদী মনোভোবে বিশ্বাসী ছিলেন না। তেমনি তারা সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কৌশলগত ব্যবস্থাপনায়ও

---

[৩০] এটি ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কন এবং জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে বিশ্বের কিছু প্রাচীন মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত আছে

তেমন আগ্রহী ছিল না। ২৫ বছরের মধ্যে তারা তিনটি গুরুতর বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হয়, দুইটি বড় গ্রিক-নেতৃত্বাধীন আক্রমণ, বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান অভিবাসীর আগমন এবং প্রবল শত্রু জিরিদ সেনার উপস্থিতি মোকাবিলা করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে, ১০৬১ সালের নর্মান বিজয় ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের চোখে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি কালবিদদের শক্তির অবক্ষয়ের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিকতা ছিল।

কালবিদ আমির ইউসুফের সময়কাল (৯৯০-৯৯৮) দ্বীপে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। তিনি ফাতিমিদের পক্ষ থেকে "রাষ্ট্রের আস্থা" উপাধি পান এবং শান্তিপূর্ণ শাসন বজায় রাখেন। তবে ৯৯৮ সালে তার পঙ্গুত্বগ্রস্ত হওয়ার পর, তার সন্তানরা ক্ষমতা গ্রহণ করলে দ্বীপ ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। ইউসুফের সময় থেকেই রাজকীয় জীবনযাপন ও কর সংগ্রহে ভাটা পড়ে।

ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাফর আমির হিসেবে নিযুক্ত হন এবং কায়রো থেকে "তাজ আল-দাউলা, সাইফ আল-মিল্লা" ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। জাফরের আমিরত্বকালেও দুটি বড় বিদ্রোহ ঘটে, যা কালবিদ সেনাবাহিনী ও দ্বীপের রাজনৈতিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একই সময়ে সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে, জিরিদদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য আফ্রিকান প্রভাব সিসিলিতে প্রবেশ করে।

১০১৫ সালের জানুয়ারিতে পালেরমোর বাইরে জাফরের ভাই আলী বিদ্রোহের সূচনা করেন। অভিযোগ ছিল, তিনি আফ্রিকান বার্বার ও স্থানীয় দাসদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ খুব দ্রুত ব্যর্থ হয়। আলীর বাহিনী পরাজিত হয় এবং পরবর্তীতে তাকে ও তার বার্বার পরিবারের সদস্যদের দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হয়। বিদ্রোহী দাসদের সঙ্গে আলীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবুও কিছু বার্বাররা দ্বীপে থেকে যায়, যা প্রমাণ করে যে বিতাড়ন মূলত কুতামা সৈন্যগোষ্ঠীকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এর ফলে সেনাবাহিনী ছোট হয়ে যায় এবং দ্বীপের স্থানীয় জনগণকে নিয়েই সেনা গঠন করা শুরু হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণে সিসিলিয়ান জনগণের অসন্তোষ বাড়তে থাকে, যা ধীরে ধীরে কালবিদ আমিরদের ক্ষমতা দুর্বল করে তোলে। তারা আর পুরো দ্বীপের ওপর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম ছিল না এবং রাজনৈতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে সেনা নিয়োগের সমস্যা আরও প্রকট হতে থাকে। ফাতিমিদের মিশরে যাত্রার পর থেকেই সিসিলির জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রতি একধরনের অনীহা জন্ম নেয়। অনেকে সেনায় যোগ দেওয়ার পরিবর্তে কর প্রদান করে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেন। শিক্ষকতাকে তখন একটি নিরাপদ পেশা হিসেবে দেখা হতো, যা সেনা-দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ দিত। মূল ভূখণ্ডের অভিযানে সৈন্য পলায়নের ঘটনাও দেখা যেত। কালবিদ শাসনের শেষ দিকে এসে আফ্রিকার সাহায্য ছাড়া সিসিলির ভেতর থেকে কার্যকর সেনা সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ সময় ভূমধ্যসাগরের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। বিশেষত উত্তর দিকের সার্ডিনিয়া দ্বীপ কৌশলগত গুরুত্ব অর্জন করে। বাইজান্টাইন ও প্রাথমিক মুসলিম যুগের পর দ্বীপটির সঙ্গে আফ্রিকান স্থলভাগের সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়লেও সার্ডিনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ-রুপা, কাঠ ও উর্বর ভূমি-এর গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। ৯০২ সালে বেলেয়ারিক দ্বীপ মুসলিম দখলে যাওয়ার পর এবং দশম শতকের মধ্যভাগে পূর্ব আইবেরিয়ান উপকূল শক্তিশালী হওয়ার পর সার্ডিনিয়া মধ্যভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসে।

এই প্রেক্ষাপটে ১০১৫-১৬ সালে আবুল জয়শ মুজাহিদ আলআমির, যিনি দাস থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষমতায় উঠেছিলেন, তিনি বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে সার্ডিনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। তার লক্ষ্য ছিল দ্বীপটি দখল করা। কিন্তু পিসান ও জেনোভিয়ান যৌথ নৌবাহিনী তার অভিযান প্রতিহত করে। ফলে সার্ডিনিয়া মুসলিম নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায় এবং প্রায় তিনশ বছর ধরে লিগুরিয়ান প্রভাবের অধীনে চলে যায়। এ সময় থেকে মুসলিম নৌবাহিনীর প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে এবং দ্বীপে খ্রিষ্টান সংস্কৃতি ও চার্চ স্থাপনার সূচনা হয়।

যদিও ফাতিমিদের যুগে মুসলিম নৌবাহিনী জেনোয়া ও সার্ডিনিয়ার ওপর হামলা চালাতে সক্ষম ছিল, তবুও তাদের কার্যক্রম ছিল সীমিত। অন্যদিকে পিসান ও জেনোভিয়ান বাণিজ্য দ্রুত দক্ষিণে সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং সিসিলি ও আফ্রিকান উপকূলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তার করছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১০৬৩ সালে পালেরমোর ওপর আক্রমণ এবং ১০৮৭ সালে মাহদিয়ার ওপর যৌথ আক্রমণ সংঘটিত হয়।

অবশেষে দ্বাদশ শতকে নর্মান শাসনের সময় উত্তর ইতালিয় ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-মধ্যভূমধ্যসাগরে শক্তিশালী উপস্থিতি গড়ে তোলে এবং বাণিজ্যিক রুটগুলোর ওপর

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের সম্পদ উত্তর ইতালির দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং সিসিলির মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, মুসলিম শাসনামলে সিসিলি ছিল সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও বিস্তৃত কৃষিকাজের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রচুর চাষাবাদের কারণে সাধারণ মানুষ কখনো অভুক্ত থাকতেন না। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা যেত পূর্ব আফ্রিকায়, যেখানে একের পর এক ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষ মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনত। বিশেষত ১০০৪-০৫ সালের দুর্ভিক্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের মানুষ পর্যন্ত সিসিলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই দুর্ভিক্ষই জিরিদ শাসনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা করে।

একাদশ শতকে আফ্রিকায় ধারাবাহিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর ফলে ক্রমশ অর্থনৈতিক দুর্বলতা রাজনৈতিক অখণ্ডতাকেও ক্ষয় করতে থাকে। কৃষি ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যের চক্র জিরিদ শাসকদের ভান্ডার খালি করে দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই সংকটের পেছনে জমিদারি ব্যবস্থার ভাঙনও বড় ভূমিকা রাখে। আরব বিজয়ের পর থেকে আঘবালিদের সময়ে বড় জমিদারির বিলোপ ঘটে এবং ছোট একক ও ভাগাভাগির জমিব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু অতিরিক্ত চাষ এবং মালিকি আইনে উত্তরাধিকার বিভাজনের কারণে জমি দ্রুত অযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে যাযাবর পালকবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তীব্রতর হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১০১৬ সালে শিশু আল-মুআজ্জিজ জিরিদ শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। তার শাসনকালের শুরুতে কায়রাওয়ানে ব্যাপক দাঙ্গা ও অভ্যুত্থান ঘটে। যদিও তিনি রক্ষা পান, তবুও ইসমাইলি-বিরোধী হত্যাযজ্ঞ মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিকভাবে ফাতিমিদের সঙ্গে সম্পর্ক ১০৪০-এর দশক পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল, তবে গ্রামীণ অর্থনীতি ধীরে ধীরে মন্দার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এই অস্থির প্রেক্ষাপটে ক্ষুধার্ত ও অস্থির আফ্রিকার মানুষদের সঙ্গে জোটবেঁধে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে কালবিদ সিসিলিতে প্রভাব বিস্তার করাই আল-মুআজ্জিজের লক্ষ্য ছিল।

এই সময়েই ঘটে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১০১৯ সালে জাফরের সচিব হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-বাঘাঈর কর সংস্কারের ওপর নতুন এক প্রস্তাব দেন। এতে ফসলের ওপর প্রচলিত দশমাংশ ('ওশর') কর বাতিল করে শতকের ভ্যারিয়েবল রেট চালুর কথা বলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি ও করব্যবস্থার আধুনিকীকরণ,

কিন্তু এতে দ্বীপের জনগণের ক্ষোভ বাড়ে। সিসিলির সাধারণ মানুষ ও শহরের নেতৃস্থানীয়, বড়ো ও ছোটো উভয়েই, বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েন। তারা পালেরমোর কালবিদ রাজপ্রাসাদে হামলা চালিয়ে রাতভর সংঘর্ষে প্রাসাদের একটি অংশ ধ্বংস করে। প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে জাফরের পিতা ইউসুফ বিদ্রোহীদের কাছে জীবনভিক্ষা চান এবং জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর জাফরের ভাই আহমদ আল-আকাল ক্ষমতায় বসেন।

এই বিদ্রোহে জাফরের রাজনৈতিক অবস্থান ভেঙে পড়ে এবং তার ব্যক্তিগত জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার প্রাসাদ লুট হয়, আর জনরোষের মুখে তার সচিব হাসান নিহত হন। বিদ্রোহ দমনের পর করব্যবস্থা আগের মতো স্থির রাখা হয়, কিন্তু স্থানীয় জনগণ রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইতিহাসে জাফরকে প্রায়শই অপচয়কারী ও ব্যর্থ শাসক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তার ব্যর্থ সেনা অভিযান, ব্যয়বহুল যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকট দ্বীপের অবস্থাকে দুর্বল করে তোলে। তবে তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে তার শাসনকাল কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে।

নতুন শাসক আহমদ আল-আকাল (১০১৯-১০৩৬) দক্ষতার সঙ্গে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু বাইরের অভিযানের মাধ্যমে নয়; বরং সিসিলির খ্রিষ্টান জনগণের ওপর অভ্যন্তরীণ অভিযানের মাধ্যমেও কালবিদ শাসনের ক্ষমতা মজবুত করেন। এর ফলে উত্তরের খ্রিষ্টান অঞ্চলগুলো পুনরায় মুসলিম শাসনের আওতায় আসে এবং দ্বীপে ধর্মীয় ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

১০২০-এর দশকে ইতালির দক্ষিণাঞ্চলেও ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়। একদিকে নতুন শক্তি হিসেবে নর্মানদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, আর অন্যদিকে পুরনো শক্তি বাইজেন্টাইনরা আবার আপুলিয়া ও কালাব্রিয়ায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। মুসলিমরা প্রায় দুই শতক ধরে নিয়মিতভাবে এ অঞ্চলে অভিযান চালালেও সিসিলির ওপর সরাসরি আক্রমণের আশঙ্কা তখনও তেমন ছিল না। ৯৬০-এর দশকে বাইজেন্টাইনদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সিসিলির মুসলিমদের কাছে আত্মরক্ষা তেমন অগ্রাধিকার পায়নি; তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছোট ছোট অভিযান। তবে ১০২০-এর দশকে বাইজেন্টাইন শক্তি দক্ষিণ ইতালিতে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০১৭-১৮ সালে বেরি নগরের লোম্বার্ড বিদ্রোহী মেলুস ব্যর্থ হওয়ার পর বাইজেন্টাইন কাতেপান বাসিল বোইয়ান্নেস আপুলিয়ায় একের পর এক দুর্গনগরী ট্রোইয়া,

ফিওরেন্তিনো, মন্টেকরভিনো, দ্রাগোনারা ও চিভিতা গড়ে তোলেন এবং সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। একই সময়ে পূর্ব ইউরোপে বুলগারদের পরাজিত করার পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১০২০-এর মাঝামাঝি তারা সিসিলি পুনর্দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই প্রেক্ষাপটে কালবিদ শাসক আহমদ আল-আকাল আপুলিয়ার বিদ্রোহী নেতা রায়কার সঙ্গে জোট বাঁধেন। আপুলিয়ার ইতিহাস লেখক লুপাস প্রোটোস্পাথারিয়ুস সংক্ষেপে এসব অভিযানের উল্লেখ করেছেন, আর বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ জন স্কাইলিটস আল-আকালকে বিকৃতভাবে 'আপোলাফার' নামে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ও আপুলিয়ান বিদ্রোহীদের এই যৌথ অভিযানে ১০২৩ সালে কালাব্রিয়ার বিসিনিয়ানো দখল হয়, বেরির দেয়ালের সামনে পর্যন্ত তারা পৌঁছে যায় এবং ১০২৯ সালে অব্বিয়ানো, এমনকি ১০৩১ সালে কাসসানো পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

এদিকে ১০২৫ সালে সম্রাট বাসিল দ্বিতীয় বিশাল বাইজেন্টাইন সেনা নিয়ে সিসিলি আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুসলিম মেসিনার দিকে রওনা দেনকিন্তু সে বছরের শেষেই সম্রাটের মৃত্যু হলে অভিযান ভেঙে পড়ে। তবে বাইজেন্টাইনদের এই প্রচেষ্টা কালবিদ শাসকদের আতঙ্কিত করে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা ইফরীকিয়ার জিরিদ শাসক আল-মুয়িজ্জের সঙ্গে প্রতিরক্ষা জোট গঠন করে। এই মৈত্রী প্রায় এক দশক স্থায়ী ছিল। গ্রিক সূত্রে জানা যায়, ১০৩২ সাল পর্যন্ত থ্রেস ও করফু অঞ্চলেও নৌ-আক্রমণ চালানো হয়।

তবে তার এই বন্ধুত্ব ও মৈত্রি সিসিলির রাজনীতিতে নতুন অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। দ্বীপের বিভিন্ন দল এখন চাইলে জিরিদদের সহায়তা নিতে পারত, ফলে কালবিদ-জিরিদ সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। প্রথমদিকে ইফরীকিয়ার সহায়তা আল-আকালকে কিছুটা স্থিতিশীলতা দিলেও ১০৩০-এর দশকের মাঝামাঝি কনস্ট্যান্টিনোপলের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সিসিলি ও ইফরীকিয়ার সম্পর্ক শীতল হয়ে যায়। এরপর জিরিদরা আর কালবিদদের শক্তি বাড়ানোর পরিবর্তে তাদের দুর্বল করতে ভূমিকা নিতে শুরু করে। ফলে আল-আকাল বাধ্য হন ইতালির মূল ভূখণ্ডেই নতুন মিত্র খোঁজার দিকে মনোযোগ দিতে। এরপরের সময়গুলোই মুসলিম সিসিলির রাজনৈতিক জীবনে বড় দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে সাম্রাজ্যকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত করে।

১০৩০ সালের পরবর্তী কয়েক বছরে সিসিলি রাজনীতিতে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। আরবি ও গ্রিক ইতিহাসে এই সময়ের বিবরণ কখনো এলোমেলো, কখনো নাটকীয়, আবার কোথাও অসম্পূর্ণ হলেও, সব মিলিয়ে বোঝা

যায় যে দ্বীপটি এক অস্থির সময় পার করছিল। এ সময় আল-আখালের পুত্র জাফর, যিনি তৃতীয় জাফর নামে পরিচিত, ভূমি কর সংস্কারের ঘোষণা দেন। তিনি দ্বীপের জনগণকে ডেকে পাঠিয়ে প্রস্তাব দেন যে, চাইলে তিনি আফ্রিকার লোকদের সিসিলি থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, কারণ তারা স্থানীয়দের জমি ও সম্পদের অংশীদার হয়ে উঠেছে।

এদিকে বাইরের শক্তি ও ভেতরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সিসিলিকে আরও জটিল অবস্থায় ফেলে। গ্রিক ইতিহাসকার স্কাইলিটস উল্লেখ করেন, আল-আখাল, যাকে তিনি 'আপোলাফার মুশুমেত' নামে অভিহিত করেন, নিজের ভাই আবু হাফসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। আবু হাফস তখন ইফরীকিয়ার জিরিদ শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বিপর্যস্ত অবস্থায় আল-আখাল আশ্রয় খোঁজেন বাইজেন্টাইনদের কাছে। বাইজেন্টাইনরা তাকে "মাগিত্রোস" উপাধি দেয়, তার ছেলেকে কনস্টান্টিনোপলে পাঠানো হয়, আর জেনারেল জর্জ মানিয়াকেসকে পাঠানো হয় দক্ষিণ ইতালিতে।

অন্যদিকে আরবি সূত্র জানায়, সিসিলির কিছু দল জিরিদ শাসক আল-মুয়িজ্জের কাছে দূত পাঠায় এবং আনুগত্য প্রদর্শনের প্রস্তাব দেয়। আল-মু'ইজ এই সুযোগ নেন এবং নিজের অল্পবয়সী ছেলে আবদুল্লাহকে সেনাদলসহ সিসিলিতে পাঠান। ফলে আল-আখাল খালিসার প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

এই অবস্থায় আল-আখালের ভাই হাসান, যিনি "সামসাম আল-দাওলা" অর্থাৎ "রাষ্ট্রের যুদ্ধকুঠার" নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি পালেরমোতে ক্ষমতার দায়িত্ব নেন। তিনি খলিফার নামে মুদ্রা চালু করে কায়রোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু কার্যত ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের হাতে, যারা নিজেদের মধ্যে একধরনের পরিষদ গঠন করে। বহু প্রভাবশালী পরিবার রাজধানী ত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় শাসন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে দ্বীপ রক্ষার একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে জিরিদ সেনাবাহিনী। তবে সিসিলির পতনের আসল কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও ক্ষমতার লড়াই। এর সঙ্গে যোগ হয় বাইরের নতুন শক্তির হুমকি। ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে উঠে আসা নর্মানরা ধীরে ধীরে ভূমধ্যসাগরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ তখন আর কেবল সম্ভাবনা নয়, অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছিল।

বাইরের চাপ আর ভেতরের দ্বন্দ্ব মিলে দ্বীপটিকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছিল অরাজকতার দিকে। এর মধ্যেই মঞ্চে প্রবেশ করলেন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সেনাপতি-জর্জ মানিয়াকেস।

মানিয়াকেসের নেতৃত্বে সম্রাট কনস্টান্টিনোপল থেকে পাঠানো হয় বিপুল সেনাদল ও নৌবহর। উদ্দেশ্য একটাই সিসিলিকে পুনর্দখল করে বাইজেন্টাইন শাসনের আওতায় আনা। নৌবহর দ্বীপের উপকূলে ভিড়তেই সিসিলির মুসলিম জনপদগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। কালবিদ শাসকদের জন্য এই বাহিনীর মোকাবিলা করা সহজ ছিল না, কারণ ভেতরের বিভাজন তখন চরমে পৌঁছেছিল।

আল-আখালের হাতে কার্যকর ক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। দ্বীপে মানুষ তখন বিভক্ত একদল 'সিসিলির মানুষ', অন্যদল 'ইফরীকিয়ার মানুষ'। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরোধ ক্ষমতার কেন্দ্রকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কেউ বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে আঁতাত করছিল, কেউ আবার জিরিদদের কাছে ভরসা খুঁজছিল। আল-আখাল নিজেও বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই সম্পর্ক ছিল ভঙ্গুর এবং কেবল স্বার্থসিদ্ধির ওপর দাঁড়ানো।

মানিয়াকেসের বাহিনী দ্বীপে প্রবেশ করলে কিছু স্থানীয় গোষ্ঠী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মুসলিম সিসিলির বিদ্রোহী দলগুলো বাইজেন্টাইন শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য। কিন্তু এতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ার বদলে দ্বীপের রাজনীতি আরও জটিল ও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র আর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্যে দ্বীপে নেমে আসে গৃহযুদ্ধের ছায়া। আল-আখাল অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন পালেরমোতে। একসময় তার নিজেরই অনুগত বলে পরিচিত 'সিসিলির মানুষদের' একটি অংশ বিদ্রোহ করে বসে। শহরের রাস্তায় রক্ত ঝরে, প্রাসাদের ভেতরে চক্রান্ত চলতে থাকে, আর বাইরে মানিয়াকেসের সৈন্যরা গ্রামাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

শেষ পর্যন্ত আল-আখাল নিজের প্রজাদের হাতেই নিহত হন। তার মৃত্যু শুধু একজন শাসকের পতন ছিল না; এটি ছিল মুসলিম সিসিলির রাজনৈতিক ঐক্যের চূড়ান্ত ভাঙন। এর পর থেকে দ্বীপের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও নেতাদের হাতে। কেউ বাইজেন্টাইনদের দিকে ঝুঁকল, কেউ জিরিদদের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করল, আবার কেউ নিজেদের প্রভাববলয় গড়ে তুলল।

মানিয়াকেসের অভিযান পুরোপুরি সফল না হলেও তার প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। বাইজেন্টাইনরা স্থায়ীভাবে সিসিলি দখল করতে পারেনি, কিন্তু দ্বীপে তারা রেখে গেছে গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত থেকেই জন্ম নেয় বিশৃঙ্খলা, যা শেষ পর্যন্ত সিসিলিকে নর্মানদের আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

এভাবেই মানিয়াকেসের অভিযান শুধু বাইরের আক্রমণের আশঙ্কা বাড়ায়নি, বরং ভেতরের বিভাজনকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করেছিল। যে ভূমি একসময়

মুসলিম ঐক্য ও শক্তিতে উজ্জ্বল ছিল, তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে শুরু করল ভেতর থেকে। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হলো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে।

৯ম শতাব্দীতে আরব-বার্বার বাহিনী যখন সিসিলি জয় করে, তখন পালেরমো দ্বীপের রাজধানী হিসেবে দ্রুত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কালবিদ আমিরদের শাসনে এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যতম প্রধান নগরী হয়ে দাঁড়ায়। শহরে সমৃদ্ধ বাজার, জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, অসংখ্য মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাগান ও খালের কারণে পালেরমোকে "পূর্বের কন্যা" বলা হতো। কিন্তু ১০ম শতাব্দীর শেষে এসে সেই সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে।

কালবিদ শাসনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল পতনের প্রথম ধাপ। আমিররা প্রায়ই ভাই-ভাই বা পিতা-পুত্রের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তেন। জনগণের অসন্তোষ বেড়ে যায়, বিশেষত করসংক্রান্ত সংস্কার ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে। আফ্রিকা ও সিসিলির মুসলিম গোষ্ঠীগুলো আলাদা পরিচয় দাবি করতে শুরু করে। এই বিভাজনকে কাজে লাগায় বাইরের শক্তিগুলো।

সিসিলির মুসলিম শাসনের অন্তিম সময়ের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ছিল ১০৭১-৭২ সালের পালেরমোর অবরোধ। রাজধানী পালেরমো তখন আগের মতো শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল না। বহু বছরের রাজনৈতিক বিভাজন, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং বাইরের সহায়তার অভাব শহরটিকে দুর্বল করে তুলেছিল। এই সুযোগে রবার্ট গিসকার্ড ও তার ভাই রজার নর্মান বাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। তারা একদিকে স্থলপথে নগরকে ঘিরে ফেলে, অন্যদিকে নৌবাহিনী বন্দর অবরুদ্ধ করে দেয়। এর ফলে শহর ধীরে ধীরে খাদ্যাভাব ও সংকটে ডুবে যায়।

শহরের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসে সাধারণ জনগণ, সৈন্য এবং স্থানীয় নেতারা। পালেরমোর প্রাচীর তখনও মজবুত ছিল, এবং প্রাথমিকভাবে কিছু সময় টিকে থাকার মতো খাদ্য মজুদও ছিল। কিন্তু মূল সমস্যা ছিল ঐক্যের অভাব। নগরের প্রভাবশালী পরিবারগুলো একে অপরের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল, ফলে প্রতিরক্ষায় সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। কেউ বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল, কেউ আবার ইফরীকিয়ার শাসকদের সহায়তা চাইতে চেয়েছিল, কিন্তু কার্যত কোনো কার্যকর সাহায্য এসে পৌঁছায়নি। ইফরীকিয়ার জিরিদরা তখন নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকটে ব্যস্ত ছিল এবং ফাতিমি খলিফারা উত্তর আফ্রিকার বাইরে শক্তি ব্যয় করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই পালেরমো কার্যত একা হয়ে পড়ে।

কয়েক মাস ধরে অবরোধ চলতে থাকে। নগরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। অবশেষে ১০৭২ সালের জানুয়ারিতে নগরের নেতারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। নর্মানদের সঙ্গে সমঝোতায় স্থির হয় যে মুসলিম অধিবাসীরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে এবং সম্পদের ওপর সীমিত অধিকার থাকবে, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নর্মানদের হাতে চলে যাবে।

এভাবে পালেরমোর পতন শুধু রাজধানীর দখল নয়; বরং মুসলিম সিসিলির রাজনৈতিক হৃদয়ের অবসান। দ্বীপের অন্য কিছু অঞ্চল পরবর্তী কয়েক দশক প্রতিরোধ চালালেও রাজধানী হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসনের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। নর্মানদের জন্য এটি ছিল এক বিশাল বিজয়। পালেরমো তাদের নতুন রাজধানী হয় এবং এখান থেকেই তারা শক্তিশালী নর্মান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। মুসলিমদের প্রশাসনিক দক্ষতা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতিকে তারা নিজেদের কাজে লাগায়, ফলে পুরনো ঐতিহ্য নতুন শাসনব্যবস্থার ভেতর ভিন্ন রূপে টিকে থাকে। যদিও দ্বীপের পশ্চিম অংশে (বিশেষত ট্রাপানি ও এননা অঞ্চলে) মুসলিম প্রতিরোধ আরও কয়েক দশক ধরে টিকে ছিল, কিন্তু রাজধানী হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সিসিলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও শেষ হয়ে যায়।

তবে পতন সত্ত্বেও মুসলিম পালেরমোর ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। নর্মান শাসকরা মুসলিম স্থপতি, প্রশাসক ও কারিগরদের ব্যবহার করে শহরের নতুন রূপ গড়ে তোলে। ফলস্বরূপ, পালেরমো এক বহুজাতিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যেখানে আরবি, ল্যাটিন ও গ্রিক ঐতিহ্যের মিশেল পাওয়া যেত।

এইভাবে ১০৭১-৭২ সালের পালেরমো অবরোধ সিসিলির ইতিহাসে এক মোড় ঘোরানো অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। এটি ছিল বহু শতাব্দীর মুসলিম শাসনের অবসান এবং ইউরোপীয় নর্মান শক্তির উত্থানের সূচনা।

সিসিলিতে মুসলিমদের রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটলেও তাদের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উত্তরাধিকার সিসিলির ইতিহাসে অমলিন থেকে যায়। নর্মান বিজয়ের পরও দ্বীপজুড়ে টিকে থাকে "আরবি প্রশাসনিক রীতি ও করব্যবস্থা", যা নতুন শাসকেরা কেবল গ্রহণই করেননি; বরং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরও করেছিলেন। আদালতের দলিল, রাজস্ব হিসাব, এমনকি স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ভাষাতেও আরবির প্রভাব বজায় থাকে আরও প্রায় দুই শতাব্দী।

স্থাপত্যকলায় ফাতিমিদের নান্দনিকতা আরও গভীরভাবে মিশে যায় সিসিলির শহর ও প্রাসাদে। গম্বুজ, খিলান, জ্যামিতিক অলংকরণ ও বাগাননির্ভর প্রাসাদনির্মাণের এই ধারা পরে “Arab-Norman style” নামে পরিচিত হয়, যার অনুপম নিদর্শন আজও দেখা যায় পালেরমো, চেফালু ও মনরেয়ালের বিভিন্ন স্থাপনায়।

শুধু প্রশাসন বা স্থাপত্য নয়, ফাতিমিদের যুগের “বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সেতুবন্ধন” ও ছিল এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। মুসলিম পণ্ডিতদের হাত ধরে সিসিলিতে ছড়িয়ে পড়ে “ইসলামি কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞান”, যা পরবর্তীকালে ইতালি হয়ে সমগ্র ইউরোপে প্রবাহিত হয়। এভাবেই সিসিলি হয়ে ওঠে “রেনেসাঁর এক অঘোষিত পূর্বসূত্র”, যেখানে পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানের মিলনে গড়ে ওঠে ইউরোপের নবজাগরণের বীজ।

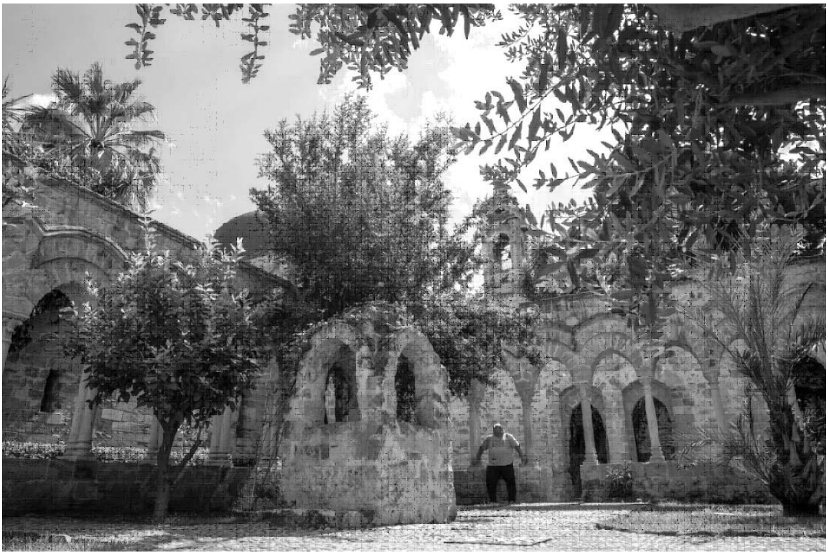

বাগান প্রসাদ, আজও সিসিলি ও পালেরমোর বিভিন্ন শহরে দেখা যায়

“This Arab-Muslim heritage in Italy represents a masterpiece of human creative genius and a cultural bridge between the two shores of the Mediterranean.”- Arch. Francesco Lo Piccolo, a Sicilian architect and scholar specializing in Mediterranean cultural heritage.

ইতিহাসের মোড় ঘোরা সময়

অভ্যন্তরীণ সংঘাত আর গৃহযুদ্ধের মধ্যেও ভূমধ্যসাগরের হৃদয়ে অবস্থিত আধুনিক ইতালির সিসিলি দ্বীপ ছিল মুসলিম সভ্যতার দীপ্ত রত্ন। এখানে বলে রাখি, মুসলিম ইতালি ও সিসিলি নিয়ে রচিত অধিকাংশ বই–ই ইতালি ও পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের লেখা, যেখানে মুসলিম এবং মুসলিম শাসকদেরকে আক্রমণকারী, লুণ্ঠনকারী এবং জবরদস্তকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখি যে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া মুসলিম বিজয়ের ধারা নবম শতকে দ্বীপটিকে মুসলিম শক্তির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ দেয়। এখানে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ নগরী, মহিমান্বিত মসজিদ ও প্রাসাদ, উর্বর ভূমিতে বিকশিত হয় কৃষি ও সেচব্যবস্থা, সমুদ্রপথে প্রসারিত হয় বাণিজ্য। মুসলিম সিসিলি কেবল সামরিক শক্তির কেন্দ্রই ছিল না, বরং ছিল জ্ঞান, সংস্কৃতি ও বহুজাতিক সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম বড় নির্মম। যে শক্তি কখনো সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়, সেই শক্তিই ভেতরের ফাটল আর দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে। সিসিলির মুসলিমরাও এর ব্যতিক্রম নন। শুরুতে যে ঐক্য তাদের বিজয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল, সময়ের প্রবাহে সেই ঐক্য ক্ষয়ে যায়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীগত বিভাজন, ক্ষমতার লড়াই আর ঈর্ষা-বিদ্বেষ ধীরে ধীরে দ্বীপের মজবুত ভিতকে দুর্বল করে তোলে। ‘সিসিলির মানুষ’ আর ‘ইফরীকিয়ার মানুষ’ নামে পরিচিত দুটি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; বাইরের শক্তিগুলো বাইজেন্টাইন, পরে নর্মান এই ভাঙনের সুযোগ নিতে এক মুহূর্তও দেরি করেনি।

সিসিলির পতনের কাহিনি কেবল এক দ্বীপের রাজনৈতিক বিপর্যয়র ইতিহাস নয়; বরং এটি এক শাশ্বত শিক্ষা। এখানে যেমন আছে মুসলিমদের অর্জনের মহিমা- শিল্প, স্থাপত্য, জ্ঞান, কৃষি ও বাণিজ্যের সাফল্য, তেমনি আছে ভেতরের দ্বন্দ্ব আর হানাহানির বেদনাদায়ক পরিণতি। ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়, বাহ্যিক শত্রু যতই প্রবল হোক, ভেতরের বিভাজনই আসলে পতনের প্রকৃত কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

একাদশ শতকের ষাটের দশক থেকে নর্মানদের সিসিলি অভিযান ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১০৭২ সালে মুসলিম পালেরমোর পতন, ১০৯১ সালে দ্বীপের সম্পূর্ণ দখল এবং ১১৩০ সালে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির একীভূত রাজ্য এই ধারাবাহিক ঘটনা শুধু রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তন করেনি, মুসলিমদের দীর্ঘ উপস্থিতিকেও ক্রমে প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। প্রায় তিন শতাব্দী মুসলিম জনসংখ্যা রাজ্যের অংশ হয়ে থাকলেও তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৩০২ সালের ক্যালটাবেলোত্তার সন্ধি সিসিলির রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ করে, আর ঊনবিংশ শতকে রিসর্গিমেন্টোর জোয়ারের সময় দ্বীপটি ঐক্যবদ্ধ ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়।

নর্মানদের মুখোমুখি শক্তি ছিল মুসলিম সৈন্যবাহিনী। তবুও তাদের অভিযান সাধারণভাবে কোনো ক্রুসেড হিসেবে ধরা হয় না। একদিকে এটি প্রথম ক্রুসেডের আহ্বানের (১০৯৫) পূর্ববর্তী ঘটনা, অন্যদিকে নর্মানদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভূখণ্ড দখল, ধর্মীয় উদ্দীপনা নয়। সংঘাত যদিও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হলেও এটি ধর্মযুদ্ধের রূপ নেয়নি। তারপরও দুই শতাব্দীর দীর্ঘ অভিযানের ফলে খ্রিষ্টান সমাজে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রকার ধর্মীয় ন্যায্যতা গড়ে ওঠে, যা নর্মানদের জন্য সুবিধাজনক ভূমিকা রাখে।

নর্মানরা বাইজেন্টাইন সেনাপতি মানিয়াকেসের মতো পবিত্র স্থান পুনরুদ্ধারে আগ্রহ দেখাননি। সিসিলি তখনও তীর্থযাত্রার কেন্দ্র নয় এবং উল্লেখযোগ্য গ্রিক গির্জাও খুব কম ছিল। বরং পাপাল নীতি নতুন লাতিন গির্জা প্রতিষ্ঠা করা এবং গ্রিক রীতির গির্জাগুলোকে রোমের কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করায় বেশি মনোযোগী ছিল। মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার কোনো প্রাথমিক পরিকল্পনা দেখা যায়নি। তবুও পাপাল প্রভাব, হারানো খ্রিষ্টান ভূমি পুনর্দখলের ধারণা এবং নর্মানদের খ্রিষ্টান পরিচয় এই বিজয়ে এক প্রকার ধর্মীয় আবরণ তৈরি করে। মুসলিমরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় “অন্য” হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে, যা নর্মানদের ক্ষমতাকে দক্ষিণ ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

ইতিহাসবিদরা প্রায়শই প্রশ্ন করেন, নর্মানরা কতটা “নর্মান” ছিলেন। প্রথম প্রজন্ম যারা দক্ষিণ ইতালিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে নর্ম্যান্ডি[৩১] থেকে

---

[৩১] “নর্মান্ডি” (Normandy) ছিল উত্তর ফ্রান্সের এক প্রদেশ, যা নবম শতকে স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাইকিংদের বসতি হিসেবে গড়ে ওঠে। ৯১১ সালে ভাইকিং নেতা “রোলো” ফরাসি রাজা চার্লস দ্য সিম্পলের কাছ থেকে অঞ্চলটির শাসনাধিকার পান এবং এখান থেকেই “নর্মান” বা “উত্তরবাসী” শব্দটির উৎপত্তি। পরবর্তীকালে এই নর্মানরাই ফরাসি সংস্কৃতি ও সামরিক কৌশল গ্রহণ করে ইউরোপজুড়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একাদশ শতকে নর্মান্ডি থেকেই “রবার্ট গুইস্কার্ড” ও “রজার দ্য হাউটভিল” সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি

আগত। কিন্তু প্রজন্মান্তরে তারা স্থানীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে একীভূত হয়ে নতুন চরিত্র গড়ে তোলে। তাই পালেরমো কেন্দ্রিক রাজ্যকে কখনো "নর্মান রাজ্য" না বলে বরং "সিসিলীয় রাজ্য" বলা যথাযথ মনে হয়।

মুসলিম সূত্রে নর্মানরা, যাদের "ফ্রাঙ্ক" বলা হতো, প্রায় অচেনা শক্তি হিসেবে হাজির হয়। তাদের প্রকৃত ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সিসিলির মুসলিমরা অবগত ছিল না। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীপে প্রবেশ করেনি, ততক্ষণ মুসলিমরা নর্মানদের কৌশল ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রকৃত শক্তি বুঝতে পারেনি। ১১শ শতকের শেষের দিকে নর্মানদের দ্বীপে দখল শুধু শক্তি প্রদর্শন নয়, মুসলিম সিসিলির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে একরাশ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সিসিলি নর্মানদের হাতে আসে। মুসলিমরা যদিও শারীরিকভাবে দ্বীপে ছিলেন, তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমে কমে যায় এবং স্থানীয় নর্মান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয়ে নতুন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা গড়ে ওঠে। এই সময়ে সিসিলি ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা মধ্যযুগীয় ভূমধ্যসাগরের শক্তি ও রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে ধরা হয়।

দক্ষিণ ইতালির অশান্ত ও ভঙ্গুর রাজনৈতিক বাস্তবতায় নর্মানরা খুব দ্রুত নিজেদের জায়গা করে নেয়। বাইজেন্টাইনদের নিয়ন্ত্রিত আপুলিয়া ও ক্যালাব্রিয়ার উত্তরে অবস্থিত ডিউকিদের জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করার ফলে তাদের সাহসিকতা ও সফলতার কারণে সহজেই নিজেদের এক শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

নর্মানদের শক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে তিন ধাপের একটি স্পষ্ট ক্রম লক্ষ করা যায়, যা দক্ষিণ ইতালির এক প্রাথমিক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হিসেবে মনে করা হয়। ১০১৭-১৮ সালের ব্যর্থ মেলুস বিদ্রোহের সময় তারা কখনো লোম্বার্ড আবার কখনো বাইজেন্টাইন সেনার পক্ষে লড়াই করে। ১০৩০-এর দশকে নেপলসের ডিউকের পক্ষেও তারা ক্যাপুয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে, আর ১০৩৮ সালে নর্মান নেতা রেনলফকে অ্যাভেরসার কাউন্ট উপাধি দেওয়া হয়, যা তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি

দখল করেন, আর "উইলিয়াম দ্য কনকারার" ইংল্যান্ড জয় করেন। তাই নর্মান্ডি ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে নর্মান শক্তির জন্মভূমি ও প্রসারের সূতিকাগার।

করে। এই একই বছরে ৩০০ নর্মান অশ্বারোহী মানিয়াকেসের অভিযানে অংশ নিয়ে প্রথমবারের মতো সিসিলিতে প্রবেশ করে নিজেদের অবস্থান জানান দেন। কিন্তু এই অভিযানের ব্যর্থতার ভারে বাইজেন্টাইনদের অর্থনৈতিক চাপ বাড়ে এবং আপুলিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে (১০৪০-৪১), যার পরিণামে উইলিয়াম অব হাউটেভিলের নেতৃত্ব আরও দৃঢ় হয়। তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে 'আয়রন আর্ম' উপাধি পান এবং পরের বছর আপুলিয়ার কাউন্ট নিযুক্ত হন। সেখান থেকেই শুরু হয় হাউটেভিল পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, যা ভবিষ্যতে আপুলিয়া ও ক্যালাব্রিয়ার কাউন্ট, আন্তিওকের প্রিন্স, আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে সিসিলির রাজা হিসেবে নিজেকে তৈরি করে।

১০৪০-এর দশক থেকে নর্মানরা আর বিচ্ছিন্ন শক্তি ছিল না। অ্যাভেরসা ও আপুলিয়ার সাফল্য তাদের একটি আলগা কিন্তু অভিন্ন স্বার্থনির্ভর গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে। ১০৫৩ সালে সিভিতাতের যুদ্ধে তারা পাপাল[৩২] ও বাইজেন্টাইন সেনাদের জোটকে পরাজিত করে। এর পর পাপালভিত্তিক নীতি বাস্তববাদী হয়ে ওঠে এবং নর্মানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে মেনে নেয়। পোপদের সঙ্গে এ জোট নর্মানদের বৈধতা দেয়, আর পোপদের সংস্কারকামী উদ্দেশ্য পূরণের পথও উন্মুক্ত করে।

উইলিয়াম হাউটেভিলের মৃত্যুর পর তার দুই ভাই, রবার্ট (মৃত্যু ১০৮৫) ও রজার (মৃত্যু ১১০১), প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রবার্টকে 'গিসকার্ড' বলা হতো, যার অর্থ 'চালাক বা কৌশলী'। প্রখর সামরিক শক্তির কারণে তিনি ক্যালাব্রিয়া ও আপুলিয়ায় বাইজেন্টাইন প্রদেশগুলো দখল করে ফেলেন, আর ১০৬০ সালের মধ্যে রেজ্জিওসহ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তার অধীনে আসে। ১০৭১ সালে বারির পতনের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন শক্তির অবসান ঘটে। এ সময় নর্মানরা ক্যাপুয়াও জয় করে নেয়।

১০৫৯ সালে মেলফির সিনডে রবার্ট গিসকার্ড পোপ নিকোলাস দ্বিতীয়ের কাছে আনুগত্যের শপথ নেন এবং এর বিনিময়ে তিনি বিভিন্ন উপাধি ও স্বীকৃতি আদায়

[৩২] ১০৫৩ সালের সিভিতাতে যুদ্ধ (Battle of Civitate) ছিল নর্মানদের সঙ্গে পোপ, বাইজেন্টাইন ও লোম্বার্ডদের সম্মিলিত বাহিনীর সংঘর্ষ। এখানে "পাপাল সেনা" বলতে বোঝানো হচ্ছে পোপের পক্ষের সেনাবাহিনী, অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা পাপাসির অধীনে সংগঠিত সৈন্যবাহিনী। বিশেষ করে তখনকার পোপ ছিলেন পোপ লিও নবম (Pope Leo IX, ১০৪৯-১০৫৪)। তিনি নর্মানদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও স্থানীয় লোম্বার্ড শাসকদের সঙ্গে জোট গড়েছিলেন। এই কারণে তার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সিভিতাতে নর্মানদের মুখোমুখি হয়।

করে নেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, তখনও সিসিলি বিজিত হয়নি, তবুও তাকে "ভবিষ্যতের সিসিলির ডিউক" বলা হয়। এর অর্থ হলো, সিসিলি দখলের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই রোমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গৃহীত হয়েছিল। তারও আগে ১০৫০ সালে সিসিলির জন্য হুমবার্ট নামের এক আর্চবিশপ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যদিও তা ছিল কেবল তাত্ত্বিক নিযুক্তি। এসব পদক্ষেপ প্রমাণ করে, সিসিলি তখন ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতে এক কৌশলগত ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

যদিও রবার্ট গিসকার্ডের মৃত্যু বাইজেন্টাইনবিরোধী অভিযানের সময় হয় (১০৮৫), তার ভাই রজার ছিলেন সিসিলি দখলের প্রকৃত নায়ক। "দ্য গ্রেট কাউন্ট" নামে পরিচিত রজার প্রথম পালার্মোর পতনের পর থেকে ১১০১ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীপে নর্মান শক্তিকে সংহত করেন। তার উত্তরসূরিরাই সিসিলির প্রথম রাজা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

তবে বলা যায় না যে, নর্মানরা সিসিলি বিজয়ের আগেই পুরো দক্ষিণ ইতালিকে একীভূত করেছিল। অঞ্চলটি তখনও বিভক্ত ও গৃহযুদ্ধপ্রবণ ছিল। কিন্তু তাদের হাতে লোম্বার্ড ও বাইজেন্টাইন নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো যথেষ্ট রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে, যার ফলে মুসলিমদের দুর্বল শাসন আরো টালমাটাল হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সিসিলির অভ্যন্তরীণ গৃহকলহ এবং উত্তর আফ্রিকার ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, যা শেষ পর্যন্ত মুসলিম সিসিলিকে ইতিহাসের পাতায় পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

এদিকে ১০৪০-এর দশকের শেষ দিকে জিরিদ শাসক[৩৩] আল-মু'ইজ সাহসী কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ফাতিমিদের আনুগত্য ত্যাগ করে আব্বাসীয় খলিফার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। এই পদক্ষেপের ফলেই মধ্যযুগীয় উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত ঘটনার জন্ম হয় প্রসিদ্ধ "হিলালীয় আক্রমণ।"

ইবনে খালদুনসহ অনেক ঐতিহাসিক ও পরবর্তীকালের লোককাহিনিতে এই ঘটনাকে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিংবদন্তির আঙ্গিকে 'বানু-হিলাল' গোত্রকে উপস্থাপন করা হয় এক দুর্বিনীত মরু, যাযাবর হিসেবে, যাদেরকে ফাতিমিরা প্রতিশোধের অস্ত্র বানিয়ে মিসর থেকে আফ্রিকার দিকে ঠেলে দেয়।

---

[৩৩] জিরিদ শাসক" বলতে বোঝানো হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার ইফরীকিয়া (আধুনিক তিউনিসিয়া, আলজেরিয়ার পূর্ব অংশ এবং লিবিয়ার পশ্চিমাংশ) ভিত্তিক জিরিদ রাজবংশের শাসকদের।

ইবনে খালদুন এমনকি এই আক্রমণকে তুলনা করেছিলেন "ফসলের মাঠে নেমে আসা পঙ্গপালের ঝাঁক"-এর সঙ্গে।

তবে বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন ছিল। 'বানু-হিলাল' মূলত মিসরের পশ্চিমাঞ্চলের মরূদ্যানভিত্তিক আধা যাযাবর আরব গোত্র। প্রথমে তারা আল-মু'ইজের সেনাদলে ত্রিপোলিতানিয়ায় দেখা দিলেও শিগগিরই তার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করে। ১০৫২ সালের এপ্রিল মাসে হায়দারান নামক স্থানে জিরিদ সেনাদলকে বড় এক যুদ্ধে পরাজিত করে। একই বছরের শীতে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জিরিদদের বিশাল নৌবহর পানতেরিয়ার কাছে ডুবে যায়, যা সিসিলি অভিমুখী ছিল দ্বীপ থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য রওনা হয়েছিল। ইবনে আল-আসিরের মতে, এই বিপর্যই জিরিদদের সামরিক শক্তিকে ভেঙে দেয় এবং তাদের আর হিলালীয়দের মোকাবিলা করার সামর্থ্য থাকে না।

পরিস্থিতির চাপে জিরিদরা ১০৫৪-৫ সালে আবারও ফাতিমি কায়রোর সঙ্গে সম্পর্ক নবায়ন করে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ১০৫৭ সালের শেষ নাগাদ তাদের শক্তি কার্যত ভেঙে পড়ে। আল-মু'ইজ ও তার পুত্র তামীম বাধ্য হয়ে মাহদিয়া দুর্গে আশ্রয় নেন। আর হিলালীয়রা কারওয়ান শহর লুট করে, যা একসময় প্রারম্ভিক ইসলামি বিশ্বের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ১০৬২ সালে আল-মু'ইজের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জিরিদরা আফ্রিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে সিসিলিতে নর্মানদের বিজয়যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী শতকে আফ্রিকার নগরীগুলোতে জিরিদ নিয়ন্ত্রণ অনিশ্চিত ও দুর্বল অবস্থায় টিকে ছিল। এদিকে হিলালীয় বিভিন্ন গোত্র স্থানীয় নগর-রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়।

হিলালীয়দের উপস্থিতিকে শুধু সামরিক বা রাজনৈতিক ঘটনাই মনে করা হয়নি। উত্তর আফ্রিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গেও তাদের নাম জড়িয়ে গেছে। তাদের যাযাবর চরিত্রকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে পশুপালননির্ভর অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরের এক চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে দেখা হয়। একই সঙ্গে তারা আরব গোত্র হওয়ায় আফ্রিকার ভাষাগত পরিবর্তনেরও এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়-বারবারি ভাষা ক্রমে আরবির কাছে স্থান হারাতে থাকে।

সিসিলি দখলে নর্মানদের ভূমিকা নিয়ে আরবিতে যতগুলো সূত্র আছে তা অতি সীমিত ও বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় দেখা যায় যে ঘটনার ধারাবাহিকতা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়। এমনকি ইংরেজি ও ইতালিয়ান ভাষায় যেসব তথ্য ও উপাদান রয়েছে

তাও আবার সম্পূর্ণ এক পেশে ও নিরপেক্ষ হিসেবে মনে করা কষ্ট হয়ে পড়ে। ইবনে আল-আসির দাবি করেন যে, "ইবনে আল-সুমনা ১০৫২ সালেই নর্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, যখন রজার তখনও ফ্রান্সের আল্পস পার হয়নি। তাদের লেখার মাধ্যমেই ১০৬০ থেকে ১০৯৮ সালের মধ্যবর্তী নর্মান বিজয়ের ঘটনাপ্রবাহ, নেতৃত্ব, পোপের সঙ্গে সম্পর্ক, সামরিক অভিযান এবং রাজনৈতিক চালচিত্র তুলনামূলকভাবে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।"

নর্মানদের প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চলা এই দখলযুদ্ধ ছিল কখনো বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর কখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অভিযানের সমষ্টি কোনো দীর্ঘ অবরোধ বা সুবিশাল যুদ্ধ নয়। তাদের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যায় কম হলেও তাদের দৃঢ়সংকল্প ছিল অসাধারণ। তবে মালাতেরার বর্ণনায় দেখা যায় যে এখানে নর্মানদের সাথে মুসলিম মিত্রদের ভূমিকা অনেকখানি অস্পষ্ট। বাধ্য হয়ে, বিশেষ করে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে বহু মুসলিম সৈন্য নর্মান বাহিনীতে যোগ দেন। বাস্তবে দেখা যায় যে মুসলিম ও স্থানীয় খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় অনেক জায়গায় নর্মানদের জয় সহজ করে তোলে।

ইবনে আল-সুমনা ১০৬২ সালে পশ্চিম সিসিলির এনতেল্লা অঞ্চলে এক হামলায় নিহত না হওয়া পর্যন্ত নর্মানদের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। তার কাছে নর্মানরা ছিল শক্তিবৃদ্ধি, যা দিয়ে তিনি তার দীর্ঘদিনের শত্রু ইবনে আল-হাওয়াসকে পরাজিত করতে চাইছিলেন। কিন্তু নর্মানদের কাছে তিনি ছিলেন তাদের দ্বীপ জয়ের অপরিহার্য সহযোগী। তাই তার মৃত্যুর পর নর্মানরা পেত্রালিয়া ও ট্রোয়িনার ঘাঁটি ছেড়ে আবার মেসিনায় ফিরে আসে।

মালাতেরা[৩৪] দাবি করেন, সেই সময় নর্মান সেনাবাহিনীতে মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার, এমনকি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠও ছিল। পরে নর্মান শাসনকালে বহু মুসলিম তাদের সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী থেকে শুরু করে দক্ষ তিরন্দাজ পর্যন্ত এই সেনাবাহিনীর অংশ ছিল। এরা মুসলিম সৈন্যরা এতটাই মূল্যবান ছিল যে, ১১১৩ সালে যখন রজারের বিধবা অ্যাডেলেইড জেরুজালেমের রাজা বাল্ডউইন প্রথমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তিনি

[৩৪] মালাতেরা বলতে বোঝানো হচ্ছে জিওফ্রে মালাতেরা (Geoffrey Malaterra) তিনি ছিলেন ১১শ শতকের শেষ ভাগ ও ১২শ শতকের শুরুতে সক্রিয় এক বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসী এবং ইতিহাসলেখক (chronicler)|

সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মুসলিম ধনুকবিদদের একটি বিশেষ দল, যাদের দক্ষতা অতুলনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

শুধু সিসিলি নয়, নর্মানরা মূল ভূখণ্ড ইতালির নানা অভিযানে মুসলিম সেনাদের ব্যবহার করেছিল ১০৭৬ সালে সালেরনো, ১০৯১ সালে কোসেঞ্জা, ১০৯৪ সালে কাস্ত্রোভিল্লারি এবং ১০৯৬ সালে আমালফির অবরোধে। এসব বাহিনীকে প্রায়ই ভয় আর আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টান শাসকদের হাতে মুসলিম সেনাদের ব্যবহার ছিল বিতর্কিত, কিন্তু তা অব্যাহত থেকেছে দ্বাদশ শতকজুড়ে, এমনকি ত্রয়োদশ শতকেও। লুচেরা শহরের মুসলিম উপনিবেশ তখন কার্যত সামরিক উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছিল।

মুসলিম সিসিলির পতনের শেষ পর্যায়ে প্রতিরোধ ও সহযোগিতার চিত্র ছিল একই সাথে জটিল ও বিক্ষিপ্ত। জিরিদ শাসকদের সর্বশেষ হস্তক্ষেপ ঘটে আমির তামীম ইবনে আল-মু'ইজ (১০৬২-১১০৮)-এর দুই পুত্র আয়্যুব ও আলীর নেতৃত্বে। ১০৬৩ সালে আয়্যুব পালের্মোতে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর আলী নিয়ন্ত্রণে নেন আগ্রিজেন্তো। কিছুদিনের মধ্যেই, সম্ভবত ১০৬৮ সালের আগেই, তিনি ইবনে আল-হাওয়াসের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেন। এতে বোঝা যায়, নর্মানরা সক্রিয় না থাকলেও সিসিলির পশ্চিমাঞ্চল তখনও গভীর অস্থিরতায় নিমজ্জিত ছিল।

অন্যদিকে, দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নর্মানরা ১০৬৩ সালে সেরামির প্রান্তরে এক উন্মুক্ত যুদ্ধে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে। এই বিজয়ের পর পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয় তাদের পাপমোচনও ঘোষণা করেন। তবে এ যুদ্ধে মুসলিমদের নেতৃত্বে কে ছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। মালাতেরা উল্লেখ করেন যে এক বীরদর্পী, লোহার বর্মে আচ্ছাদিত এক মুসলিম সেনাপতি, যাকে তিনি 'আর্কাদিয়ুস' নামে অভিহিত করেন, তিনি এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। বাস্তবে এটি কোনও ব্যক্তিনাম নয়; বরং আরবি শব্দ আল-কায়িদ (অর্থাৎ নেতা) থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এই নেতা কতটা সমন্বিতভাবে অন্য মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তা আজও অজানা।

এরপর ১০৬৮ সালে মিসিলমেরির কাছে মুসলিমদের ভয়াবহ পরাজয় ঘটে এবং জিরিদ সেনারা দ্বীপ ত্যাগ করে ফিরে যায়। এর পর থেকে সিসিলির মুসলিম প্রতিরোধ আরও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রায় পুরোপুরি স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

সিসিলিজুড়ে গ্রিক খ্রিষ্টান জনবসতি কতটা বিস্তৃত ছিল, তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে এটি ছিল অত্যন্ত স্থানীয়কেন্দ্রিক। বিজয়ের পর কালাব্রিয়া থেকে বহু গ্রিক অভিবাসন ঘটায়, ফলে এদের সংখ্যা বাড়ে। বিশেষত ভ্যাল দেমোনে অঞ্চলে তাদের শক্তি সুপরিচিত ছিল। এমনকি আগ্রিজেন্তোর মতো পশ্চিমাঞ্চলেও তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নর্মানদের প্রকাশ্যে সহযোগিতা করেছিল।

কখনো কখনো মুসলিম ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও চোখে পড়ে। যেমন, দোভাষি গুপ্তচরদের কথা আমরা পাই, অথবা পেত্রালিয়ায়, যেখানে মুসলিম ও খ্রিষ্টান মিলিত জনসংখ্যা ছিল, উভয় সম্প্রদায়ই নর্মানদের সঙ্গে আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছিল।

১০৬৮ সালে মিসিলমেরির যুদ্ধ সিসিলির মুসলিম শাসনের ভাগ্য নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। রজার প্রথম ও রবার্ট গিসকার্ডের নেতৃত্বে নর্মানদের অভিযান শুরু হয়েছিল ১০৬১ সালে, যখন তারা মেসিনা দখল করে দ্বীপে প্রথম দৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে নর্মানরা ধীরে ধীরে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের লক্ষ্য ছিল সিসিলির রাজধানী পালেরমো, কিন্তু সরাসরি আক্রমণ চালানোর আগে প্রয়োজন ছিল আশেপাশের মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা।

এ সময় সিসিলির মুসলিম সমাজ ভেতর থেকেই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পালেরমো, কাটানিয়া ও সিরাকিউজ প্রতিটি অঞ্চলের আমিরেরা আলাদা শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। এই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে নর্মানরা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। ১০৬৮ সালে পালেরমোর মুসলিম সেনারা নর্মানদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে এবং মিসিলমেরির কাছে তাদের মুখোমুখি হয়। সংখ্যায় মুসলিম বাহিনী ছিল অনেক বেশি, কিন্তু নর্মানদের ছিল উন্নত যুদ্ধশৃঙ্খলা, সংগঠিত বাহিনী এবং রজার প্রথমের দৃঢ় নেতৃত্ব। তার সঙ্গে ছিল দক্ষিণ ইতালির লোম্বার্ড ও অন্যান্য খ্রিষ্টান যোদ্ধারা, যারা নর্মানদের সঙ্গী হয়ে দ্বীপ পুনর্দখলে অংশ নিচ্ছিল।

মিসিলমেরির যুদ্ধ ছিল রক্তক্ষয়ী। প্রাথমিকভাবে মুসলিম বাহিনী তাদের সংখ্যাগত শক্তির ওপর নির্ভর করে আক্রমণ চালালেও নর্মানদের কৌশলগত চাল তাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে দেয়। যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে। নর্মানরা বিজয় অর্জন করে শুধু একটি যুদ্ধক্ষেত্র দখল করল না, বরং মুসলিম প্রতিরোধের মেরুদণ্ডকেই দুর্বল করে দিলো।

এই বিজয়ের তাৎপর্য ছিল দীর্ঘমেয়াদি। যদিও পালেরমো তখনও নর্মানদের হাতে পড়েনি এবং ১০৭২ সাল পর্যন্ত রাজধানী পতন ঘটেনি, তবুও মিসিলমেরির পর মুসলিম শাসকরা পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে চলে যায়। তাদের মধ্যে বিভাজন আরও প্রকট হয়ে ওঠে, আর নর্মানদের জন্য দ্বীপজয়ের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। মালাতেরা উল্লেখ করেছেন যে, নর্মানদের নিষ্ঠুরতা ও মুসলিমদের ভয় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মেসিনার পতনের সময় এক মুসলিম ব্যক্তি নিজের বোনকে হত্যা করেছিলেন, যাতে তিনি নর্মান সৈন্যদের দয়ার ওপর নির্ভর না করতে পারেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিজয়ী নর্মান সৈন্যরা মুসলিম নারী ও তরুণীদের ব্যাপক হারে ধর্ষণ করে।

সিসিলির মুসলিম শাসনের পতনের সময় জংলী, বন্য ও অসভ্য নর্মান বিজয় কেবল রাজনৈতিক মানচিত্রই বদলে দেয়নি, সঙ্গে এনেছিল মানবিক ট্র্যাজেডি ও ভয়াবহতা। যুদ্ধ সব সময়ই সাধারণ মানুষের জন্য দুর্যোগ বয়ে আনে, আর নারীরা এর সবচেয়ে অসহায় শিকার হয়ে ওঠে। নর্মানদের অগ্রযাত্রা যখন মুসলিম গ্রাম ও শহরে ধ্বংস ডেকে আনে, তখন অসংখ্য মুসলিম মেয়ের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় অন্ধকার।

ধর্ষণ ছিল তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের এক নির্মম হাতিয়ার। জয়ী সেনারা শুধু শত্রুর জমি ও সম্পদ দখল করেই থামেনি; তারা শত্রুর সম্মান ভেঙে দিতে নারীদের দেহকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়েছিল। মুসলিম মেয়েদের ওপর সংঘটিত এই নির্যাতন ছিল নিছক ব্যক্তিগত পাপ নয়; বরং পরিকল্পিত ভয় দেখানোর উপায়। পরিবারগুলো ভেঙে পড়েছিল, সমাজের ভেতরে তৈরি হয়েছিল ভয় ও হতাশার এক গভীর ক্ষত। অনেক নারী লাঞ্ছনার ভয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, আবার অনেক পরিবার তাদের কন্যাদের আগেই আত্মগোপনে পাঠিয়ে দিত।

এই ভয়াবহতার সামাজিক প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। মুসলিম সমাজে নারীর সম্মানকে পরিবারের মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হতো, তাই ধর্ষণের ঘটনাগুলো শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টিগত চেতনাতেও অপূরণীয় আঘাত হানে। একসময়ের সমৃদ্ধ মুসলিম সিসিলি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে। শিশুরা, যারা এমন ভয়াবহ পরিবেশে বড় হচ্ছিল, তারা দেখেছিল কীভাবে তাদের মা-বোনেরা লাঞ্ছিত হচ্ছে; তাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল পরাজয়ের অপমান। এ ধর্ষণের মাত্রা ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে বিস্তৃত, মর্মান্তিক ও ধারাবাহিক।

ঠিক এই সময় পালের্মোয় মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির শূন্যস্থান থেকে উঠে এলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল-রহমান, খ্যাত ইবনে আল-বাবা'। তিনি প্রধানত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শায়খদের সহায়তায় শহর শাসন করতেন। ইবনে আল-বাবা'-এর পরিবারের বৃত্তীয় ও বাণিজ্যিক পরিচয় কায়রো জেনিজা দলিল থেকে জানা যায়; তারা সম্ভবত ইসপান থেকে এসেছিলেন এবং স্বর্ণকার ও রত্নকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

সেসময়ে সিসিলির বাণিজ্য ও অর্থনীতি অত্যন্ত বিপর্যয়কর অবস্থায় ছিল। যুদ্ধ, ভাঙচুর ও করের অতিরিক্ত চাপের কারণে পণ্য পরিবহন ও ব্যবসা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ইবনে আল-বাবা' পালের্মোর ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করেন। তিনি স্থানীয় সৈন্য ও ব্যবসায়ীদের সহায়তায় শহরে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এমনকি স্থানীয় জ্যুইশ সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তার পরিচিত ব্যবসায়ী সঙ্গীকে নিয়োগ দেন।

তবে নর্মানদের আগমন এ উত্থানকে শূন্যে ফেলে দেয়। ইবনে আল-বাবা' অথবা শহর ছেড়ে পালিয়ে যান অথবা নর্মানদের হাতে নিহত হন; কোনোভাবেই ১০৭২ সালের আগে তিনি আর সিসিলির রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেননি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নর্মান বিজয়ের সঙ্গে মুসলিমদের প্রতিরোধ কেবল সামরিক নয়; বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা স্তরে সংঘটিত হয়েছিল।

১১শ শতকের মাঝামাঝি, নর্মানরা ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। রজার এবং তার বড় ভাই রবার্ট গুইসকার্ডের নেতৃত্বে নর্মানরা কৌশলে মুসলিমদের প্রতিরোধকে দুর্বল করে ধীরে ধীরে দ্বীপ দখল করতে শুরু করে। ১০৬১ সালে মেসিনার এলাকা থেকে নর্মান আগ্রাসন শুরু করে, যেখানে ছোট-ছোট লড়াই ও আক্রমণ চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলো দখল করে। নর্মানদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, তবে তাদের নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা এবং সজ্জিত সামরিক প্রযুক্তি তাদেরকে নিরন্তর বিজয় অর্জনে সক্ষম করে।

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মুসলিম প্রতিরোধ তখনও কোথাও কোথাও কিছুটা সংঘবদ্ধ তবে তার কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। পালের্মোর অন্তত কিছু অঞ্চল, যেমন পশ্চিম ও দক্ষিণ সিসিলি, তখনও বিভিন্ন মুসলিম এবং স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত ছিল। বিশেষ করে ইবনে আল-সুমনা, যিনি পূর্বের সিসিলিয়ান ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন, তিনি নর্মানদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছিলেন। তার মৃত্যু (১০৬২) নর্মানদের সামরিক অগ্রগতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত করলেও, স্থানীয় মুসলিম অংশীদারদের

সাথে তারা দ্রুত নতুন সমঝোতা স্থাপন করে। এভাবে নর্মানরা মাত্র কয়েক শ সৈন্য নিয়ে দ্বীপের বড় অংশে নিজেরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল বিভক্ত। কিছু শহরে স্থানীয় মুসলিম এবং খ্রিষ্টানরা নর্মানদের সাথে যৌথভাবে কাজ করত, আবার কোথাও তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলত। উদাহরণস্বরূপ, ট্রোইনার শহরে নর্মানদের প্রাথমিক আগমনে স্থানীয় মুসলিম এবং খ্রিষ্টানরা আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানায়। কিন্তু পরে, কিছু অনৈতিক ও নারীর প্রতি সহিংস আচরণ ও প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটার পর তারা নর্মানদের বিরুদ্ধে যুক্ত হয়ে শহর অবরোধ করে। এই পরিস্থিতি দেখায় যে, দ্বীপের মুসলিম এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় এবং দ্বন্দ্ব উভয়ই চলছিল।

নর্মানরা কৌশলে এই বিভাজন ব্যবহার করেছিল। তারা মুসলিমদের মধ্যে কিছু নেতাকে স্থানীয় প্রশাসন এবং সামরিক কাঠামোর অংশ করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি নিশ্চিত করেছিল যে, বিজয়ী নর্মানরা শুধু ক্ষমতা দখল করলেই নয়; বরং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোও নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

১০৬৮ সালে মিসিলমেরির কাছে নর্মানদের দ্বিতীয় প্রধান যুদ্ধে মুসলিম শক্তির পরাজয় দ্বীপের রাজধানী পালের্মোর বিজয়ের পথ খুলে দেয়। বিজয়ী নর্মানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ করার জন্য বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছিল, যেমন রক্তাক্ত কবুতর পাঠানো, যা পালের্মোর মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের মুসলিম যুবসমাজের অভিজ্ঞতার অভাব এবং নর্মানদের কঠোরতা তাদের আত্মসমর্পণকে প্রায় অনিবার্য করে তোলে।

মিসিলমেরির পর, পালের্মোর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নেতাদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে উঠে আসে ইবনে আল-বাবা'। তার পারিবারিক এবং বাণিজ্যিক সংযোগ পালের্মোর অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তিনি শহরের নেতৃস্থানীয় এবং ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় তার ক্ষমতা কায়েম করেন। কিছু সূত্রে বলা হয়েছে, তার পরিবার সম্ভবত ইহুদি বণিকদের মধ্য থেকে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।

সেসময় শহরের বাণিজ্য বিপর্যস্ত ছিল। যুদ্ধের কারণে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়েছিল, এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব সংগ্রহের পরিবর্তে যুদ্ধ চালাতে ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে ইবনে আল-বাবা' শহরের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, স্থানীয় নেতাদের প্রতি সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে প্রশাসন চালায়, এবং তদ্ব্যতীত নর্মান

আগ্রাসনের সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা ও অনুরোধের মধ্য দিয়ে শহরের স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

১০৭১ সালে নর্মানদের হাতে বারির পতনের পর তারা আবার সিসিলিতে মনোনিবেশ করে। পাঁচ মাসের স্থল ও সমুদ্র অবরোধ শেষে, ১০ জানুয়ারি ১০৭২-এ পালের্মোর মুসলিম রাজধানী আত্মসমর্পণ করে। নর্মানরা শহরের প্রধান মসজিদকে গির্জায় রূপান্তর করে, তবে গণমসজিদে ধর্মান্তর সীমিত ও ব্যতিক্রমী ছিল। কিছু মুসলিম নেতা ধর্মান্তরিত হলেও, নর্মানরা সাধারণভাবে ইসলামের ধর্মীয় প্রথা অক্ষুণ্ন রাখার দিকে মনোযোগী ছিল।

নর্মান শাসন অত্যন্ত কৌশলী ছিল। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু নেতাকে নিয়োগের মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করত। পাশাপাশি স্থানীয় খ্রিষ্টানদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করত। এইভাবে নর্মানরা শুধুমাত্র যুদ্ধ জিতল না, বরং দ্বীপের প্রশাসন, অর্থনীতি এবং সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করল।

পালেরমোর সান্তা মারিয়া দেল আম্মিরালিও'র আরবি ক্যালিগ্রাফী। যার বাংলা অর্থ 'আল্লাহর নামে, যিনি অনেক দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক'।

“The greatest enemy of a nation is not the one who attacks from outside, but the envy and discord that grow within.” (Abu Hamid al-Ghazali, 1058–1111)

মুসলিম সমাজের রূপান্তর

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও ৯ম শতাব্দী থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত কালবিয়ান ও আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে সিসিলি মুসলিম শাসকের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। শাসনকালে তার এর নাগরিক ও বাসিন্দাবেদর জন্য ন্যায্য প্রশাসন, করব্যবস্থা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখে সিসিলির বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

নর্মান বিজয়ীরা শক্তিশালী সামরিক কৌশল এবং দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির মাধ্যমে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিমরা হঠাৎ করে শাসক থেকে অধীনস্থ প্রজা হয়ে যায়, তবে তারা প্রাথমিক কয়েক দশক পর্যন্ত তাদের ধর্ম ও আইন হারায়নি। নর্মানরা আংশিকভাবে পরোক্ষ শাসন বজায় রেখে মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব ধর্ম, আইন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার সুযোগ দেয়। এই প্রক্রিয়ায় মুসলিমরা কর প্রদান এবং শাসকদের প্রতি আনুগত্যের শর্তে নিজেদের সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়।

ফলে নর্মান শাসনের অধীনে মুসলিমরা প্রজা হলেও তারা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই সময়ের সিসিলি ছিল এক জটিল, বহু-ধর্মীয় এবং বহু-সংস্কৃতির সমাজ, যেখানে শাসক ও প্রজার সম্পর্ক শুধু কর্তৃত্ব ও কর প্রদান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, কূটনীতি এবং স্থানীয় নেতৃত্বের সমঝোতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

ইবনে আল-আসীর (মৃত্যু ১২৩৩) সিসিলির নর্মান বিজয়ের ঘটনাকে তাঁর সময় থেকে বহু পরে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে, “রাজা রজার পুরো দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মুসলিমদের সঙ্গে গ্রিক ও ফ্র্যাঙ্কদের বসবাস করিয়েছিলেন; তারা সেখানে কোনো হাম্মামখানা, দোকান, চাকা বা চুল্লি মূল বাসিন্দাদের জন্য ছেড়ে দেননি।” যদিও এই বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়, তবু এতে বিজয়ের পর নতুন ক্ষমতার প্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রান্তিক অবস্থানের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ক্ষমতার স্থানান্তর বোঝার জন্য তাই কেবল ইবনে আল-আসীর নয়; বরং সমসাময়িক উৎস এবং প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশকেও দেখতে হয়।

১০৭২ সালে পালের্মোর পতনের পর সেখানে একটি স্থায়ী নর্মান কসাইখানা স্থাপন করা হয় এবং রবার্ট নামে এক নর্মান নাইটকে শহরের গভর্নর (আরবি আমির) করা হয়। পরে এই পদ গ্রিকরা দখল করে ১১৫৪ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। গুইস্কার্ড ও রজারের মধ্যে ভূখণ্ড ভাগাভাগি নিয়েও সমসাময়িক সূত্রে ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, গুইস্কার্ড পান পালের্মো, মেসিনার এবং ভ্যাল ডিমোনের অর্ধেক শাসনের ক্ষমতা আর বাকিটা রজারের হাতে থাকে থেকে যায়

সিসিলিতে নর্মান বিজয়ের পরও কিছু এলাকা রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে বেশ অস্থির রয়ে যায়, বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত শহরগুলো। এসব অঞ্চলে নর্মানরা পুরনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মেরামত করে বা নতুন দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে নজরদারি জোরদার করে। শহরের প্রাচীর, দুর্গ এবং পাহাড়চূড়ায় গড়ে ওঠা ছোট বসতি (কাসট্রাম বা কাসটেল্লাম) যা সময়কার প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে।

নতুন নির্মাণাধীন নর্মান স্থাপত্যে রোমান ধাঁচের প্রভাব প্রবল ছিল। পাটের্নো, আড্রানো এবং মত্তার দুর্গগুলো এই নতুন ধারা প্রমাণ করে, যেখানে ইসলামি যুগের পুরনো প্রতিরক্ষা কাঠামোর সঙ্গে নর্মান রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

বিজয়ের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল মুসলিম সমাজে। ভূমি, বাণিজ্য ও নগরজীবনের ওপর মুসলিমদের আধিপত্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম ক্বায়েদরা প্রাথমিকভাবে নেতৃত্বে থেকে চুক্তি করতে পারলেও, পরবর্তী সময়ে তাদের অনেককে নির্বাসনে পাঠানো হয় অথবা স্থানীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নর্মানদের ভূমি দান নীতির ফলে মুসলিম কৃষকরা ধীরে ধীরে জমির মালিকানা হারায় এবং প্রভাবশালী খ্রিষ্টান অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। নগর জীবনে মুসলিমদের কারিগরি দক্ষতা ও বাজার নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা চুক্তির মাধ্যমে পেশাগত ভূমিকা ধরে রাখে।

ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলিমরা প্রান্তিক হয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের মসজিদ, আইন এবং সাম্প্রদায়িক কাঠামো বজায় রাখতে পারলেও, ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে এক প্রকার অধীনতা বা জিম্মি অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে তাদের স্বাধীনতা সীমিত হয়, এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমশ খ্রিষ্টান অভিজাতদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

তবে এই রূপান্তর হঠাৎ ঘটেনি। মুসলিমরা দুই শ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিসিলির সমাজ ও অর্থনীতিতে সক্রিয় থেকেছে। তারা কৃষি, সেচব্যবস্থা, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু নর্মান শক্তি দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

মুসলিম সমাজের প্রভাব সংকুচিত হতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত দ্বীপে তাদের উপস্থিতিকে ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়ে পরিণত করে।

১০৭০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১০৮০-এর শুরুতে সিসিলিতে নতুন লর্ডশিপ বা একধরনের ভদ্রলোক-ভিত্তিক শাসনের সূচনা ঘটে। এই সময় রজার নিজের জমি ও প্রজাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে নকশা করছিলেন। তিনি নিজের অনুগত নাইটদের মধ্যে ভূমি, সম্পদ এবং বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ করতেন, যা নতুন সিভিল লর্ডশিপের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

১০৯০-এর দশকে নোটোর শেষ মুসলিম শাসকের আত্মসমর্পণের পর, রজার তার অনুগতদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোককে "জমি এবং বিস্তৃত সম্পত্তি" প্রদান করেছেন। আর বাকীদেরকে "শ্রমের বিনিময়ে বিভিন্ন পুরস্কার" দিয়ে প্রণোদনা দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় মূল ভূখণ্ডের স্থানীয় লর্ডদের ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। incastellamento নামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহরগুলোর চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি করত। স্থানীয় বড় লোকেরা নিজেদের এবং পরিবারের জন্য এমন কেন্দ্র স্থাপন করে রাজনৈতিক সমর্থন বা প্রতিরোধের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করত। দক্ষিণ ইতালিয় উপদ্বীপে এই প্রক্রিয়া নর্মানদের উত্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

তবে, সিসিলিতে এই প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিজয়ের পরও রজার এবং তাঁর উত্তরসূরিরা দ্বীপের বিস্তৃত অংশে সরাসরি শাসন বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সম্ভাব্য বিদ্রোহী অভিজাতদের শক্তি বাড়াতে না দেওয়ার জন্য বড় লর্ডশিপ বিস্তৃতভাবে বিতরণ করা হয়নি। বরং সীমিতসংখ্যক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মধ্যে সাবধানে জমি ও ক্ষমতা বণ্টন করা হয়, এবং বড় চার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শাসন স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে রজারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

যদিও অনেক প্রধান মুসলিম পরিবারই নর্মান শাসনের সময় সিসিলি ত্যাগ করেছিল, তবুও বানে রাজা নামের একটি প্রভাবশালী পরিবার পালার্মোর ধর্মীয় ও প্রশাসনিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চার্টার এবং অন্যান্য বর্ণনামূলক উৎস থেকে জানা যায়, এই পরিবার ১১২০-এর দশক থেকে ১১৬০-এর দশক পর্যন্ত এখানে সক্রিয় ছিল। তিন প্রজন্ম ধরে পরিবারের চার সদস্য পালার্মোর কাজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যেখানে তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

পরিবারের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন আবু আল-হাও', যিনি তরুণ রজারের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। বিশেষ করে অ্যাডেলাইডের মৃত্যুর পর এবং রজারের সিংহাসনে আরোহণের আগে তার প্রভাব প্রকটই ছিল বলে জানা যায়। বানে রাজা পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, সিসিলির মুসলিম অভিজাতরা নতুন নর্মান নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিল এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি অংশ হয়ে উঠেছিল।

আবু আল-হাও'-এর জীবনের তথ্য মূলত তার কবিতা এবং ইমাদ আল-দিন ও জর্জ অফ এন্টিওকের জীবনী থেকে জানা যায়। তিনি জিরিদ ইফ্রিকিয়ার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এদের মধ্যে কেবল সাহিত্যিক সম্পর্কই নয়, প্রশাসনিক সহযোগিতাও দৃঢ় ছিল। ১১২৩ সালে আবু আল-হাও' এবং তার চাচা, পালার্মোর প্রধান কাজি হিসেবে, ক্রিস্টোডুলস এবং একজন ক্যালাব্রিয়ান গ্রিক বিচারকের সঙ্গে মিলে সিমিনা অঞ্চলে অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেছিলেন।

তিনি রজারের কোনো পুত্রের মৃত্যু (সম্ভবত তানক্রেড ১১৩৮-৪২ বা আলফনসো ১১৪৪)-সংক্রান্ত একটা চিঠিতে শোকগাথা লিখেছেন, যা প্রমাণ করে যে আবু আল-হাও' রজারের রাজত্বকালে ক্রাউনকে সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন। বানে রাজা পরিবারের আনুগত্য, প্রভাব এবং প্রশাসনিক অংশগ্রহণ নর্মান রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

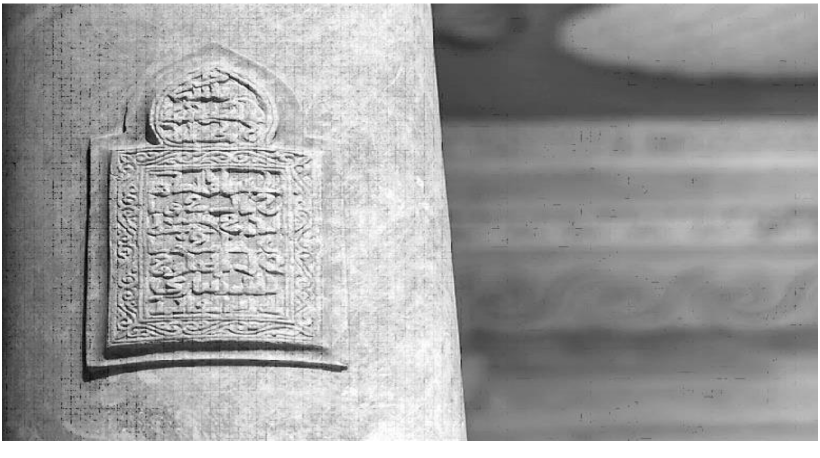

পালেরমো ক্যাথাড্রেলের বাহিরের দিকের বাম পাশের একটা পিলারের গায়ে কুরআনের আয়াত। ওপরের অংশে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ। পরবর্তী অংশ বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেটা কুরআনের কোনো একটা অংশ।

“The Normans did not conquer a united land; they found a fractured Muslim realm, weakened by its own rivalries.” – Alex Metcalfe

নতুন শাসনব্যবস্থার উত্থান ও অভিযোজন

নর্মান বিজয়ের পর সিসিলির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটে, তা ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। ১১শ শতকের শেষ দিকে মুসলিম শাসনের পতন সত্ত্বেও, দ্বীপটির সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইসলামি প্রভাব গভীরভাবে অটুট ছিল। ১২ ও ১৩ শতকে এই প্রভাব এক নতুন রূপে অভিযোজিত হয় যেখানে মুসলিমরা শাসনব্যবস্থার অংশীদার না হয়েও তার ভিতরে সক্রিয় সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করে। যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের রাজনীতিতে কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বীপটি যদিও নর্মান শাসকের অধীনে; এটি ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ইতালি, জার্মান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, প্যাপালতি, ক্রুসেডার রাজ্য[৩৫] এবং ইসলামি বিশ্বের সংযোগস্থল। ইতিহাসকারীরা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তেন যে, নর্মান রাজবংশের উত্তরাধিকার এবং রাজ্য পরিচালনার অধিকার কোথায় স্থাপন হবে। উইলিয়াম দ্বিতীয়'র (১১৮৯ সালে) মৃত্যু প্রায়ই নর্মান যুগের সমাপ্তি হিসেবে ধরা হলেও, প্রকৃত অর্থে এটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

যদিও তখন অনেকেই ধারণা করেছিল যে নতুন শাসনের অধীনে মুসলিমদের ভাগ্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। রজার প্রথম (Roger I) এবং তার উত্তরসূরিরা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পথ না বেছে, বরং এক ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ

---

[৩৫] ১২ ও ১৩ শতকে ক্রুসেডাররা চারটি প্রধান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল—জেরুজালেমের রাজ্য, এডেসার কাউন্টি, আন্তিয়কের প্রিন্সিপ্যালিটি এবং ত্রিপোলির কাউন্টি। এগুলো একসাথে "ক্রুসেডার স্টেটস" নামে পরিচিত। ১০৯৯ সালে জেরুজালেম দখলের পর নর্মান ও ফ্রাঙ্ক যোদ্ধারা এসব রাজ্য গঠন করে। জেরুজালেম ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য, যদিও ১২৯১ সালে আক্রে পতনের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে। এডেসা ছিল প্রথম ও সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলের রাজ্য, যা ১১৪৪ সালে মুসলিম শাসক জেঙ্গির হাতে পতিত হয়। আন্তিয়ক ও ত্রিপোলিও ধীরে ধীরে মামলুকদের হাতে চলে যায়। এসব রাজ্য ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের ধর্মীয় ও সামরিক আধিপত্যের প্রতীক ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিষ্টান ও ইসলামি বিশ্বের সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

করেন, তারা মুসলিম প্রজাদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতাকে রাজ্য পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

নর্মান শাসনের প্রথম পর্যায়ে সিসিলির সামাজিক কাঠামো ও প্রশাসনিক প্রথার গভীরে ইসলামি ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বজায় ছিল। রজার প্রথমের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা এই নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। রাজ্য প্রশাসনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরবি ভাষা ছিল সরকারি ব্যবহারের অন্যতম ভাষা, যা রাজদরবারের নথিপত্র ও কর আদায় ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হতো। মুসলিম আলেম, কাতিব ও উলামারা নর্মান দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই পারস্পরিক সহাবস্থানের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় রজার দ্বিতীয়ের (শাসনকাল: ১১৩০-১১৫৪) রাজত্বে। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী দূরদর্শী ও জ্ঞানানুরাগী এক শাসক, যিনি আরব বিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। রজার দ্বিতীয়ের রাজসভায় মুসলিম পণ্ডিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-ইদ্রিসি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তার নির্দেশে ও আরবীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে আল-ইদ্রিসি রচনা করেন বিশ্ববিখ্যাত ভূগোল ও মানচিত্রগ্রন্থ “নুযহাত আল-মুশতাক ফি ইখতিরাক আল-আফাক” (Nuzhat al-Mushtāq fī Ikhtirāq al-Āfāq), যা লাতিন বিশ্বে পরিচিত “Tabula Rogeriana” নামে। এই গ্রন্থে তিনি সমকালীন বিশ্বের ভূগোল, সংস্কৃতি, জলপথ ও বাণিজ্যপথের বিশদ বিবরণ দেন, যা ইউরোপীয় ভূগোলবিদ্যার ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক।

দেখা যায় যে, ১১০০ থেকে ১১৫৪ সালের নর্মান সিসিলি ছিল এক বিরল সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের উদাহরণ, যেখানে খ্রিষ্টান নর্মান, মুসলিম আরব ও বাইজান্টাইন গ্রিক ঐতিহ্য মিলেমিশে গড়ে তোলে এক নতুন মানবিক ও বৌদ্ধিক পরিসর। এই সময়ে সিসিলি শুধু রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রই নয়; বরং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল সংযোগস্থল হিসেবে বিকশিত হয়েছিল।

তবে ১১৬০-এর দশক থেকে ক্রমেই মুসলিমদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। বিদ্রোহ ও দাঙ্গার কারণে তারা দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যভূমিতে সরে আসে, যেখানে নতুন ল্যাটিন চার্চের অধীনে তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হতে থাকে। উইলিয়াম দ্বিতীয়'র মৃত্যুতে তারা দীর্ঘকাল ধরে বিদ্রোহ করে। অবশেষে ফ্রেডরিক

দ্বিতীয়, মুসলিমদের লুচেরা শহরে[৩৬] স্থানান্তরিত করে, এবং এখানেই তাদের ইতিহাসের চূড়ান্ত অধ্যায় লেখা হয়।

সিসিলিতে মুসলিমরা সম্ভবত ১৩-শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। লুচেরার নিভৃত জীবনেও তারা ইসলামি সমাজের আভাস বজায় রেখেছিল। তারা কৃষি, নগর বাণিজ্য, কারিগরি শিল্প এবং রপ্তানি পণ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। নর্মান শাসনকালে মুসলিমরা নৌ-বাহিনী, পদাদিত সৈন্য, এবং রাজ্য রাজস্ব ও প্রাসাদের প্রশাসক হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজ করেছিল।

মুসলিমদের প্রভাব প্রাসাদ, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও রাজনীতিতেও প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে রজার দ্বিতীয়ের ত্রৈমুখী ও ধর্মীয় রাজতন্ত্রে মুসলিম ও আরবি সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। রাজকীয় প্রাসাদের অনুষ্ঠান, পোশাক, আচরণ এবং সাংস্কৃতিক বিনোদনে তাদের অবদান লক্ষণীয়। রাজা মুসলিম পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যা সিসিলিয়াকে ইসলামিক ও ক্রিস্টিয়ান জ্ঞানের সংযোগস্থলে পরিণত করেছিল।

রজারের রাজত্ব কল্পনা করুন, একদিকে তিনি একজন নৃশংস ক্ষমতাধর শাসক। আর অন্যদিকে তার আশেপাশে মুসলিম ও গ্রিক উপদেষ্টা দ্বারা ভরপুর। ১১৩০ সালে সিসিলিয়ার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময় দ্বীপে কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা স্থায়ী চ্যান্সারি ছিল না। আইন প্রণয়ন, মুদ্রা সংস্কার এবং শাসকের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তবে ১১৩০-এর পরপরই শাসন কাঠামো দ্রুত ও দৃশ্যমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা নতুন রাজ্যের অন্যতম চিহ্ন।

এদিকে উত্তর ইতালি এবং অ্যাপুলিয়ায় নর্মান শাসনের জন্য ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছিল। বিদ্রোহীরা ল্যাটিন নৃশংসতা, বাইজেন্টাইন আগ্রাসন বা জার্মান সাম্রাজ্যের হুমকির সুযোগ নিতে পারত। ১১৩৭ সালে জার্মান সম্রাট লোথার তৃতীয়ের আক্রমণে রজারের ক্ষমতা ও শাসন কঠিন পরীক্ষা সম্মুক্ষিন হয়ে পড়ে। তাদের আক্রমণে বারি ও সালেরনোর পতন হয়। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

---

[৩৬] ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের সিসিলির কাছাকাছি আপুলিয়া অঞ্চলে অবস্থিত “লুচেরা (Lucera)” শহরটি মধ্যযুগে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। নর্মান ও পরে ফ্রেডেরিক দ্বিতীয় (Frederick II)-এর শাসনামলে এটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৩শ শতকে ফ্রেডেরিক সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি থেকে বহু মুসলিমকে এখানে পুনর্বাসন করেন, ফলে “Lucera dei Saraceni” নামে এটি পরিচিত হয়। শহরটিতে মুসলিমদের বসতি, মসজিদ, বাজার ও সেনাদল গঠিত হয়েছিল, যা ইউরোপে এক বিরল ইসলামি সম্প্রদায়ের নিদর্শন ছিল। তবে ১৩০০ সালের দিকে চার্লস দ্বিতীয় (Charles II) মুসলিম জনসংখ্যাকে জোরপূর্বক বিতাড়িত বা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন, এবং মসজিদগুলো গির্জায় রূপান্তরিত হয়। আজ লুচেরা সেই মিশ্র ইতিহাসের সাক্ষী, যেখানে আরব-নর্মান ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ঐতিহ্য একত্রে মিশে আছে। লুচেরা নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

অঞ্চল অ্যাপুলিয়াও ডাচি কাউন্ট রাইনুলফের হাতে চলে যায়। যদিও পরবর্তীতে ১১৩৯ সালে তীব্র পাল্টা আক্রমণ ও কৌশলের মাধ্যমে রজার তার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মুসলিম সৈন্য ও প্রশাসকরা রজারের জন্য অপরিহার্য ছিলেন। রজারের এই দুর্বল মুহূর্তে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম অবলম্বন ছিলেন।

নর্মান প্রাসাদ লা কুবা (La Cuba)-এর ওপরের অংশে একটি আরবি শিলালিপি খোদাই করা আছে, যা ভবনের বহিঃপ্রাচীরের শীর্ষে দেখা যায়। এই প্রাসাদটি উইলিয়াম দ্বিতীয় (William II) ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। এটি মূলত আরবি স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত "জিসা প্রাসাদ (Zisa Palace)"-এর অনুকরণে তৈরি, যেখানে ইসলামি ও নর্মান নান্দনিকতার এক চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়।

“Injustice, rivalry, and internal strife are the surest signs of a civilization’s decay.” – Ibn Khaldun, Muqaddimah

আফ্রিকার মাটিতে নর্মান শাসনের বিস্তার

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়টা ভূমধ্যসাগর ছিল এক প্রবল পরিবর্তনের মঞ্চ। এই সময় সিসিলির নর্মান রাজ্য অভ্যন্তরীণ শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক পরিপক্বতার মধ্য দিয়ে নিজেকে এক আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছিল। দ্বিতীয় রজার ও তাঁর প্রধান আমির জর্জ অব অ্যান্টিয়কের নেতৃত্বে রাজ্য ধীরে ধীরে একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামোতে রূপ নেয়। সিসিলি কেবল দ্বীপের সীমানায় আবদ্ধ ছিল না; উত্তর দিকে আব্রুজ্জো পর্বত পর্যন্ত তাদের অগ্রযাত্রা এবং দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলীয় নগর মাহদিয়্যা (বর্তমান তিউনিশিয়া) দখলের মাধ্যমে রাজ্যের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিস্তৃতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

এই সময়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরজুড়ে ক্রুসেডের আবহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১১৪৪ সালে এডেসার পতন ইউরোপে দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেয়। সিসিলি সরাসরি এই অভিযানে অংশ নেয়নি, কিন্তু রজার ও বাইজান্টাইন সম্রাট মানুয়েল কোমনেনোসের আলোচনার ভাঙন সিসিলীয় নৌবাহিনীকে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। ধর্মীয় বৈরিতা তখন আর কেবল জেরুজালেম রক্ষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং খ্রিষ্টীয় ইউরোপে প্রচারিত হচ্ছিল বিশ্বাস, নৈতিক অবস্থান, এমনকি ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চর্চার বিরুদ্ধেও শত্রুতার ধারণা।

অন্যদিকে পশ্চিম মাগরিবে (বর্তমান মরক্কো) আবির্ভূত হয়েছিল আলমোহাদ আন্দোলন। হাই অ্যাটলাস পর্বত থেকে আগত বার্বার মাসমুদা উপজাতিরা আবদ আল-মুমিনের নেতৃত্বে আল-মোরাবিদদের পরাজিত করে তাদের স্থান দখল করে। তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে আইবেরীয় উপদ্বীপে কাদিস, জেরেজ ও সেভিয়া দখল করে নেয়। একই সময়ে খ্রিষ্টীয় শক্তি উত্তর থেকে লিসবন (বর্তমান পর্তুগালের রাজধানী) দখলের মতো স্থায়ী সাফল্য অর্জন করছিল। ১১৫২ সালের পর আল-মোহাদরা পূর্ব দিকে ধাবিত হয়ে আফ্রিকা (আধুনিক তিউনিশিয়া ও পূর্ব আলজেরিয়া) দুর্বল নগর-রাষ্ট্রগুলোকে আক্রমণ করে। এই সময় নর্মানদের পুনঃপুন আক্রমণ আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

সিসিলির দৃষ্টি তাই স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরে নিবদ্ধ হয়। তবে সমসাময়িক ইতিহাসে নর্মানদের আফ্রিকায় সম্প্রসারণকে প্রায়শই ছোটো পরিসরে দেখা হয়েছে। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছে এটি উদ্বেগজনক ছিল-জার্মানি ও কনস্টান্টিনোপল মনে করত যে নর্মানরা রোমান ও বাইজান্টাইন আফ্রিকার পুরনো ভূখণ্ডে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। সিসিলির অভ্যন্তরে তখনও অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল-জর্জ অফ অ্যান্টিয়ক (মৃত্যু ১১৫১) ও রজার দ্বিতীয় (মৃত্যু ১১৫৪)-এর মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর হুমকি তৈরি হয়। তবুও নর্মানদের আফ্রিকা অভিযান এক ঐতিহাসিক বাঁক চিহ্নিত করে এটি উত্তর আফ্রিকা ও ইতালির মধ্যে এক রাজনৈতিক সীমারেখা স্থাপন করে দেয়, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকে।

এদিকে আফ্রিকার মুসলিম সমাজ নিজেও তখন বহুধা বিভক্ত। উদাহরণস্বরূপ, জারবা দ্বীপ ছিল খারিজি ইবাদিদের কেন্দ্র, যা সমসাময়িক মুসলিম ভৌগোলিকদের কাছে জলদস্যুতা ও বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কৃষিকাজের সীমাবদ্ধতা, পানির সংকট এবং দীর্ঘকালীন উপজাতীয় বিদ্রোহ দ্বীপটিকে বহিরাগতদের আক্রমণের মুখোমুখি করেছিল। রজার ১১৩৫ সালে জারবার বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং ১১৫৩ সালে আবার বিদ্রোহ দমনে দ্বীপবাসীদের জিজিয়া দিতে বাধ্য করেন, এমনকি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে রাজকীয় অধীনতায় নিয়ে আসেন।

এই ঘটনাগুলোর পাশাপাশি কায়রো ও পালেরমোর মধ্যে কূটনৈতিক চিঠিপত্রও ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। ১১৩৭ সালের শীতে ফাতিমি খলিফা আল-হাফিজ ও রজারের মধ্যে পত্রালাপে ভূমধ্যসাগরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভিন্ন স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। এসব পত্র এও দেখায় যে, সিসিলির আরবি প্রশাসন ইসলামি বিশ্বের জটিল কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে সক্ষম ছিল।

তবুও বাস্তবতার কঠিন মুখ সবার সামনে আসে ১১৪০-এর দশকে, যখন দুর্ভিক্ষ আফ্রিকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অনেক গ্রামীণ জনগণ সিসিলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক চাপে জিরিদ আমির আল-হাসান ইবনে আলি অবশেষে রজারের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এর ফলে নর্মান বাহিনী উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় নগরগুলিতে একের পর এক অভিযান চালায় জিজিলি (বর্তমান জিজেল), ব্রাস্ক (বর্তমান সিদি ব্রাহিম), কারকেন্নাহ দ্বীপ, এবং অবশেষে ১১৪৬ সালে ত্রিপলি তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই সামরিক বিস্তারের দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ছিল দ্বিমুখী। একদিকে নর্মানদের উপস্থিতি আফ্রিকায় স্বল্পকালীন খ্রিষ্টীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে, যা কয়েক শতাব্দীর

মুসলিম আধিপত্যে এক ক্ষণস্থায়ী ভিন্ন ছাপ ফেলে। অন্যদিকে, নর্মানদের পতনের পর ইসলাম আরও পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং তিউনিশিয়া, পূর্ব আলজেরিয়া ও পশ্চিম লিবিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে নতুন করে এক র‍্যাডিক্যাল ইসলামি ধারা প্রভাব বিস্তার করে।

ত্রিপলি (আরবিঃ ত্রাবুলুস, বর্তমান লিবিয়ার উপকূলে অবস্থিত রাজধানী শহর) আফ্রিকার (আজকের তিউনিশিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) পশ্চিমাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র ছিল। এটি বহু দশক ধরে বানু খাজরুন গোত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে নর্মান সিসিলির শক্তি ক্রমশ ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে বিস্তৃত হলে নগরটির ভেতরকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও গোত্র-সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে পতনের পথ প্রশস্ত করে। নগরটি দখলের পর নর্মানরা সেখানে এক শক্তিশালী গ্যারিসন স্থাপন করে, শহরের প্রাচীর নতুন করে মজবুত করে এবং প্রতিরক্ষার জন্য একটি গভীর পরিখাও খনন করে। ছয় মাসব্যাপী এই পুনর্গঠন নগরটির রাজনৈতিক মানচিত্রে নর্মানদের স্থায়ী উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

এক আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপলির শাসন কাঠামো নতুনভাবে সাজানো হয়। শহরের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন স্থানীয় আরব গোত্রপ্রধানদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে নর্মানরা একজন ওয়ালী (গভর্নর) নিয়োগ করে আবু ইয়াহইয়া, যিনি বানু মতরুহ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি পালেরমো থেকে আনুষ্ঠানিক নিযুক্তির দলিল ও সম্মানসূচক পোশাক লাভ করেন। একই সঙ্গে স্থানীয় বার্বার জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একজন বিশিষ্ট আলেমকে কাজি (প্রধান বিচারক) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, নর্মানরা সরাসরি শাসন চাপিয়ে না দিয়ে প্রথাগত সামাজিক কাঠামোকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ইবনে আল-আসীরের বর্ণনা অনুযায়ী, বিজয়ের পর ত্রিপলি দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরে পায় এবং অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ শুরু হয়। নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সিসিলি থেকে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের পাঠানো হয়েছিল। এদের পরিচয় স্পষ্ট নয়; কিছু সূত্রে ইঙ্গিত মেলে যে সিসিলির খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সেখানে বিশেষ সুবিধা নিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। আবার অন্য ধারণা অনুযায়ী, পূর্বে আফ্রিকা থকে সিসিলিতে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের একটি অংশকে রজার পুনর্বাসন করেছিলেন। যে যাই হোক, নগরটির সামাজিক বিন্যাসে এক নতুন ধারা সূচিত হয়।

ত্রিপলি বিজয়ের প্রকৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল চুক্তিভিত্তিক এক দখল, যেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারগুলোকে বহাল রাখা হয়েছিল, শর্ত ছিল তারা

কর প্রদান করবে এবং পালেরমোর নির্দেশ মেনে চলবে। সিসিলীয় দিওয়ান নিয়মিতভাবে খাজনা আদায় করত, আর নগরের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো স্থানীয় শক্তিশালী নেতারা প্রায় স্বাধীনভাবেই পরিচালনা করতেন। একে একধরনের "পরোক্ষ শাসন" বলা যায়।

ত্রিপলি দখলের কিছুকাল পরেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় গাবেসে (আরবি: কাবিস)। একাদশ শতকের শেষ ভাগে এই নগরটি জিরিদ শাসন থেকে বেরিয়ে আসে এবং বানু জামি' নামক একটি গোত্র ক্ষমতায় আসে। তাদের উত্থান বানু হিলালের প্রভাবশালী কিছু অংশের সহায়তায় হয়েছিল। ১১২০-এর দশক থেকে রুশায়দ ইবনে কামিল নগরের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন, যা তার স্বতন্ত্র শাসনকাঠামোর প্রতীক।

১১৪৬-১১৪৭ সালে রুশায়দের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র মু'আম্মার ও মুহাম্মদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত চরিত্র-রুশায়দের এক মাওলা (ক্লায়েন্ট) ইউসুফ-সুযোগ নিয়ে মু'আম্মারকে উৎখাত করে নগরের শাসন দখল করে। মু'আম্মার তৎক্ষণাৎ জিরিদ আমির আল-হাসানের সাহায্য চান, আর ইউসুফ সিসিলির রজারের কাছে আনুগত্য ঘোষণা করেন। পালেরমো তিনি আনুষ্ঠানিক নিযুক্তির দলিল ও পোশাক লাভ করেন। এতে গাবেসও কার্যত ত্রিপলির মতো এক "পরোক্ষ নর্মান শাসন" ব্যবস্থায় প্রবেশ করে।

কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১১৪৭-১১৪৮ সালে জিরিদ শাসক আল-হাসান, বানু কুররা গোত্র এবং স্থানীয় জনগণ একত্র হয়ে ইউসুফকে উৎখাত করে হত্যা করে। নৃশংসভাবে তাকে নির্যাতন করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ প্রতিক্রিয়ার পেছনে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাও ভূমিকা রেখেছিল বলে ইঙ্গিত মেলে। ইউসুফের ভাই ঈসা তখন পালেরমোতে অবস্থান করে রজারের সহায়তা চান। কিন্তু এর ফলে তাকে জিরিদ শাসকরা গ্রেপ্তার করে মহদিয়্যায় নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে অপমানজনক প্রদর্শনীর পর হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত গাবেস আবার জিরিদ শাসনের অধীনে আসে, মু'আম্মারকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

এ সময় নর্মান সিসিলির কাছে সামরিক হস্তক্ষেপের এক সুস্পষ্ট অজুহাত তৈরি হয়। রজারের নৌবহর তখন সমুদ্রে সক্রিয় ছিল, এবং জর্জ অব অ্যান্টিয়ক ১১৪৮ সালের গ্রীষ্মে মাহদিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। গাবেসে প্রো-সিসিলীয় শাসক নিযুক্ত হওয়ায় মাহদিয়া প্রায় রক্তপাত ছাড়াই পতিত হয়। বিজয়ের পর নর্মানরা বিপুল সম্পদ, ধনরত্ন ও প্রাসাদের ভান্ডার লুট করে পালেরমোতে নিয়ে যায়।

এ সময় আফ্রিকার দুর্দশা নর্মান অভিযানের সাফল্যে বড় ভূমিকা রেখেছিল। ১১৪৭-১১৪৮ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে অঞ্চলটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক মানুষ পালিয়ে সিসিলিতে আশ্রয় নেয়। ইবনে আল-আসীরের মতে, রজার এই পরিস্থিতিকে নিখুঁতভাবে কাজে লাগান। একই সময়ে, জর্জ অফ অ্যান্টিয়কের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাও সক্রিয় ছিল তিনি একসময় জিরিদ শাসকদের হাতে প্রাণহানির মুখে পড়ে পালিয়ে বাঁচেন।

জিরিদ আমির আল-হাসান ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত মরক্কোর মারাকেশে আলমোহাদ খলিফা আবদ আল-মুমিনের কাছে আশ্রয় নেন। এখান থেকেই নর্মানবিরোধী এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

নর্মানরা দক্ষিণ ইতালি বা সিসিলির মতো খ্রিষ্টীয় জমিদারি কাঠামো প্রবর্তন করেনি। বরং স্থানীয় আলেম, প্রভাবশালী পরিবার বা নগর কাউন্সিলকে ক্ষমতায় রেখে দূরবর্তী শাসন চালায়। উদাহরণস্বরূপ, সুউস ও স্ফাক্সে স্থানীয় নেতাদেরই ক্ষমতায় রাখা হয়েছিল, তবে তাদের পরিবারের কাউকে জিম্মি হিসেবে পালের্মোতে পাঠানো হয়।

এই স্বল্পকালীন নর্মান শাসনের প্রভাব ছিল দ্বিমুখী। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য ও বাণিজ্য পুনরুদ্ধার হয়, নগরগুলো মাহদিয়ার প্রাধান্য থেকে আংশিক স্বাধীনতা পায়, এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়ে নতুন আশা জাগে। অন্যদিকে, সমসাময়িক ভূগোলবিদ আল-ইদ্রিসি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নর্মান আক্রমণই আফ্রিকার শহরগুলোর জনশূন্যতা ও দুর্বলতার প্রধান কারণ। জিজিলি, মারসা আল-জাইতুনা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত; স্ফাক্স ছিল জনসংখ্যা ও সম্পদহীন; বুনা ছিল করুণ অবস্থায়; ত্রিপলির পুরুষদের গণহত্যা করা হয়, আর জারবার বন্দিদের তিনি স্বচক্ষে পালেরমোতে বন্দি অবস্থায় দেখেছিলেন।

অবশেষে প্রায় সব নগরই রজারের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং বার্ষিক খাজনা দিতে সম্মত হয়। ১১৪৮ সালে পোপ ইউজেনিয়াস তৃতীয় আফ্রিকার জন্য একজন আর্চবিশপ ঘোষণা করেন যদিও এটি বাস্তবে একটি ভঙ্গুর পদক্ষেপ ছিল, তবে স্পষ্ট যে দীর্ঘস্থায়ী হলে খ্রিষ্টীয় উপনিবেশ বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হতো।

আগেই বলেছি, সিসিলীয় নর্মানরা আফ্রিকায় শাসন কায়েম করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তা ছিল তুলনামূলকভাবে “পরোক্ষ প্রশাসন।” উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনগণকে শাসনের সঙ্গে যুক্ত রেখে বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমিয়ে আনা। ঠিক যেভাবে পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানেরা বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা

করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে এক বৃহৎ শক্তি তখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল- আলমোহাদ খিলাফত। খলিফা (আমিরুল মুমিনিন) আবদুল মুমিনের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকার মধ্যাঞ্চল ও প্রধান উপকূলীয় নগরীগুলো ক্রমান্বয়ে দখল করছিল। ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্ম শেষে হাম্মাদিদ রাজবংশের প্রধান দুর্গ বুজাইয়া পতিত হয়। পরের বছর এপ্রিল মাসে সেতিফের যুদ্ধে স্থানীয় সেনারা চূর্ণবিচূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং হাম্মাদিদ শক্তি ভেঙে পড়ে। ফলে নর্মান-অধিকৃত আফ্রিকার শহরগুলো আলমোহাদ আক্রমণের সরাসরি মুখোমুখি হয়।

তবে প্রাথমিক সাফল্যের পর আবদুল মুমিন পশ্চিম মাগরিবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনে মনোযোগ দেন। এ সুযোগে সিসিলির নর্মানরা কৌশলগতভাবে এগিয়ে যায়। ১১৫৩ সালের শরতে তারা বোনা (আধুনিক আলজেরিয়ার আনাবা) আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে একজন প্রো-সিসিলীয় শাসক বসানো, যিনি স্থানীয় জনগণের সমর্থন নিয়ে এবং সিসিলির সামরিক সহায়তায় ভবিষ্যৎ আলমোহাদ অগ্রযাত্রার মোকাবিলা করতে পারবেন। তাই শহরের মানুষের আস্থা অর্জন করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। এজন্য যখন ফিলিপ “অফ মাহদিয়া”র নেতৃত্বে সিসিলি থেকে সৈন্য এসে পৌঁছায়, তখন আরবি ও লাতিন উভয় সূত্রই উল্লেখ করেছে যে লুণ্ঠন বা ধ্বংসযজ্ঞ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। শহরটি হাম্মাদিদ বংশের এক স্থানীয় গভর্নরের অধীনে সমর্পিত হয়।

কিন্তু ফিলিপের ভাগ্যে অন্য এক মোড় অপেক্ষা করছিল। পালেরমো ফিরে আসার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ধর্মত্যাগের অভিযোগ আনা হয়।

ফিলিপ ছিলেন রাজকীয় দরবারের বহু খোঁজাদের (eunuchs) একজন, যিনি অল্প বয়স থেকেই রাজা রজারের ঘনিষ্ঠ অনুগত হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা হয়, তিনি ও তার সহকর্মীরা বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের দাবি করলেও অন্তরে ইসলামের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাই তার বিচার ও মৃত্যুদণ্ড শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় সম্পর্কেরও গভীর প্রতিফলন বহন করে।

রোমুয়াল্ড অফ সালার্নোর Chronicon-এ এক দীর্ঘ টীকা আকারে এই ঘটনার বর্ণনা সংরক্ষিত আছে, যা মূল গ্রন্থের তুলনায় নাটকীয় ও আলাদা শৈলীর। এখানে বলা হয়েছে, জীবনের শেষ পর্যায়ে রাজা রজার ইহুদি ও মুসলিমদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ফিলিপের মৃত্যুদণ্ডও সেই নীতিরই প্রতিফলন হতে পারে।

ফিলিপের বিচারের বিবরণে বলা হয়, তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল মুসলিমদের রীতিনীতি গোপনে মেনে চলার অভিযোগে। বলা হয়, তিনি মসজিদের প্রদীপের জন্য তেল সরবরাহ করেছেন, মদিনায় নবি মুহাম্মদের (সা.) কবরস্থানে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন এবং খ্রিষ্টান স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। যদিও রজার নিজে অশ্রুসিক্ত হয়ে তার পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করেন, রাজ্যের কাউন্ট, ন্যায়পাল ও বিচারকরা শেষ পর্যন্ত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে।

তারপর ফিলিপকে ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ঘোড়ায় বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর প্রাসাদের বাইরে এক চুনের ভাটায় জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হয়। এ শাস্তি মুসলিম দর্শকদের কাছে আরও বিভীষিকাময় ছিল, কারণ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে আগুনে শাস্তি দেওয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার।

ইবনে আল-আসীরের বর্ণনায় আবার ভিন্ন দিক উঠে এসেছে। তার মতে, বোনায় ফিলিপ যে অতিরিক্ত নরম ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, সেটিই তার পতনের মূল কারণ। তিনি তার মৃত্যুদণ্ডের সঠিক তারিখও উল্লেখ করেছেন ৫৪৮ হিজরির রমজান (২০ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১১৫৩), অর্থাৎ রজারের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। এখানে শুধু ফিলিপ নন, রাজপ্রাসাদের আরও কয়েকজন খোঁজাকেও অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এভাবে লাতিন ও আরবি উভয় সূত্রেই ফিলিপের বিচার, দোষারোপ ও মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে। ইতিহাসবিদদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু একজন সামরিক নেতার পতনের কাহিনি নয়; বরং সিসিলির মুসলিম সমাজের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা ইবনে আল-আসীর যেমন সতর্কভাবে মন্তব্য করেছিলেন, “এটাই ছিল সিসিলির মুসলিমদের ওপর নেমে আসা প্রথম দুর্বলীকরণের আঘাত।”

ফিলিপের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড সিসিলি এবং আফ্রিকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্রমবর্ধমান মুসলিম-খ্রিষ্টান দ্বন্দ্বের গভীর প্রতিফলন বহন করে, বিশেষত রাজপ্রাসাদের ভেতরে। অ্যান্টিওকের জর্জের মৃত্যুর পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে তার উত্তরসূরি মায়ো অব বারির হাতে, যিনি উচ্চবংশীয় নন, বরং সাধারণ লাতিন বংশোদ্ভূত। তিনি রাজপ্রাসাদের প্রশাসনে খোঁজা ও মুসলিম উৎস থেকে আগত কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। অন্যদিকে, সিসিলির লাতিন অভিজাতরা নিজেদের ক্ষমতাহীন ও বঞ্চিত মনে করছিল। তাদের অসন্তোষ আরও ঘনীভূত হয় ভূমধ্যসাগরের সীমান্ত অঞ্চলে চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে।

এক্ষেত্রে রোমুয়াল্ড যে বর্ণনা দিয়েছেন কেবল ধর্মীয় আবেগে নয়; বরং লাতিন অভিজাতদের সঙ্গে রাজা ও প্রাসাদীয় কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্বের আলোকে দেখা যায়। আফ্রিকায় নগর দখল করলেও, নর্মান রাজা নতুন লর্ডশিপ প্রতিষ্ঠা করেননি বা পুরোনো ক্ষমতার ভিত্তি সম্প্রসারণ করেননি। বরং স্থানীয় মুসলিম অভিজাতদের হাতে প্রশাসন অর্পণ করেছিলেন, যারা সরাসরি রাজা ও প্রাসাদের খোঁজাদের মাধ্যমে পালের্মোর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখত। এই বাস্তবতা লাতিন অভিজাতদের ক্রমশ আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে, বিশেষত ১১৫৬ সালে আফ্রিকায় বিদ্রোহ শুরু হলে এবং সিসিলির পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা সম্ভব না হলে।

রজার দ্বিতীয়ের জীবনের শেষ প্রান্তে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। তার প্রচলিত আইন অনুযায়ী খ্রিষ্টান ধর্মত্যাগ গুরুতর অপরাধ হলেও, বাস্তবে তার রাজপ্রাসাদে মুসলিম অনুগতদের জায়গা ছিল। ফলে ফিলিপের বলি আসলে কোনো ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রকাশ ছিল না, বরং লাতিন অভিজাতদের কাছে রাজনৈতিক ছাড় দেওয়া। এতে তারা রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজনীতির কাঠামো নিজেদের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এই বিচার প্রমাণ করে যে সিসিলির বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় শুধু আলাদা আলাদাই নয়; বরং শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে স্থাপিত ছিল। ইসলামি সমাজে যেমন রীতি, শাসকের ধর্মে রূপান্তর মর্যাদাপূর্ণ; কিন্তু একবার রূপান্তরের পর পুনরায় পেছনে ফিরে যাওয়া ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ, যার কোনো ক্ষমা নেই। সিসিলি তখন ধর্মীয় রূপান্তরের এক জটিল সময় পার করছিল, যেখানে মুসলিম সমাজ একদিকে দ্রুত আত্মীকরণ, ধর্মান্তর ও দেশত্যাগের চাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল, অন্যদিকে প্রতিরোধী একটি কোর গড়ে উঠছিল যারা এ চাপের বিরোধিতা করছিল।

আইনগতভাবে, সিসিলির মুসলিমরা নিজেদের কাজ নিজেদের কাজি দ্বারা নিষ্পত্তি করত, তবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারা রাজকীয় বিচারের অধীন ছিল। আফ্রিকায় এর চেয়েও বেশি দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল, কারণ সব শহরে একই নীতি চালু ছিল না। যেমন, ত্রিপোলিতে খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের কোনো মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মুসলিম কাদীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; গুরুতর অপরাধ বা আন্তঃধর্মীয় মামলাগুলো রাজকীয় আদালতে যেতে পারত। অর্থাৎ, এখানেও তারা সিসিলির "জিম্মি"দের মতোই-আংশিক স্বাধীন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকীয় কর্তৃত্বাধীন।

করব্যবস্থায়ও ভিন্নতা ছিল। সিসিলিতে দিওয়ানের কর্মকর্তা সরাসরি জিজিয়া সংগ্রহ করতেন। আফ্রিকায় স্থানীয় গভর্নরের মাধ্যমে কর তোলা হতো, পরে তা

পালের্মোর দিওয়ানে পৌঁছাত। সব শহরে সমভাবে জিজিয়া আরোপিত হয়নি। ত্রিপোলি, মাহদিয়া ও জারবার ক্ষেত্রে জিজিয়ার উল্লেখ থাকলেও অন্যত্র নেই। এটি মূলত রাজনৈতিক কারণে-অত্যধিক চাপ দিয়ে স্থানীয় বিদ্রোহ উসকে না দিতে সচেতনভাবে এই শব্দ পরিহার করা হয়েছিল।

রাজকীয় উপাধির বিষয়েও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। রজার দ্বিতীয় ও তার উত্তরসূরি উইলিয়ামকে কখনো কখনো "আফ্রিকার রাজা" (Malik Ifriqiya) বলা হয়েছে। মাহদিয়ায় তাদের নামে মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই উপাধি পাওয়া গেছে। এমনকি ১১৪৯ সালে পালের্মোতে এক বহুভাষিক (লাতিন, গ্রিক, আরবি, জুডিও-আরবি) শিলালিপিতে রজারকে "আফ্রিকার রাজা" বলা হয়েছিল। তবে এই শিরোনাম সর্বত্র গৃহীত হয়নি, সম্ভবত কূটনৈতিক কারণে। ফাতিমীয় মিসরের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট না করার জন্য রজার এমন দম্ভপূর্ণ দাবিকে পরে সীমিত করে আনেন।

নর্মানদের আফ্রিকা, সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে শাসন প্রতিষ্ঠা প্রথম দিকে অনেকটাই সফল মনে হলেও শিগগিরই তা বিদ্রোহ, অস্থিরতা ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের এক ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পালেরমোর রাজদরবারে সামরিক অভিযান ও বিজয়ের ধরণ নিয়েই যখন রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধছে, তখন আফ্রিকার উপকূলীয় শহরগুলোতেও নর্মান কর্তৃত্ব নিয়ে অসন্তোষ জমতে থাকে। নর্মানরা সরাসরি দমননীতি গ্রহণ না করে বরং স্থানীয় শহরগুলোতে বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করে, তবে এই নীতিও জনগণের অন্তর্গত ক্ষোভকে চাপা রাখতে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে ১১৫৬ সালে, যখন স্ফাক্সে বিদ্রোহ শুরু হয়। ইবনে খালদুনের মতে, সেখানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানরা, যারা ছিল স্থানীয় ও নবাগত ব্যবসায়ী-মুসলিমদের ওপর নানা ক্ষতি আরোপ করেছিল। কেউ কেউ এটিকে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করলেও, অনেকেই মনে করেন যে নর্মান শাসন কর আদায়কে আরও কঠোর করে তুলেছিল। স্ফাক্সের নেতা উমর আল-ফুররিয়ানী বিদ্রোহের ডাক দিলে তা স্থানীয় অসন্তোষকে ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে শক্তিশালী রূপ ধারণ করে।

এমন একসময়ে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যখন নর্মান রাজা উইলিয়াম প্রথম দক্ষিণ ইতালিতে ভয়াবহ চাপে ছিলেন। জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা রোম পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে অভিষিক্ত হন, বাইজান্টাইন সেনারা আপুলিয়ায় প্রবেশ করে, পোপ এড্রিয়ান চতুর্থ শত্রুতাপূর্ণ অবস্থান নেন, আর স্থানীয় ব্যারনরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েন। রাজা উইলিয়াম অসুস্থ হয়ে পড়লে মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বারি, ত্রানি, ব্রিন্ডিসি ও তারান্তোর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়।

এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আফ্রিকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে স্ফাক্স থেকে ত্রিপোলি ও গাবেস পর্যন্ত।

আফ্রিকার ফাতিমীয় ও জিরিদ রাজধানী মাহদিয়ায় বিদ্রোহের ভিন্ন রূপ দেখা যায়। উপদ্বীপীয় অংশে ছিল নর্মান প্রাসাদ ও প্রশাসন, আর মূল ভূখণ্ডের জাওয়ালা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত। এখানকার বিদ্রোহে জাওয়ালাবাসীরা স্থলপথে অবরোধ করে, স্ফাক্স থেকে আগত জাহাজ সমুদ্রপথে ঘেরাও দেয়। যদিও প্রথমে ব্যর্থ হয়, তবুও এর মাধ্যমে নর্মান শাসনের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা প্রকাশ পায়। বিদ্রোহীদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে দমন করা হলেও তারা পরবর্তীতে আলমোহাদ নেতা আবদুল মুমিনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

১১৫৯ সালে আলমোহাদরা আফ্রিকায় প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ অবরোধ শেষে ১১৬০ সালের জানুয়ারিতে মাহদিয়া পতিত হয়। এর মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় নর্মান অধ্যায়ের অবসান ঘটে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে মুসলিম শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

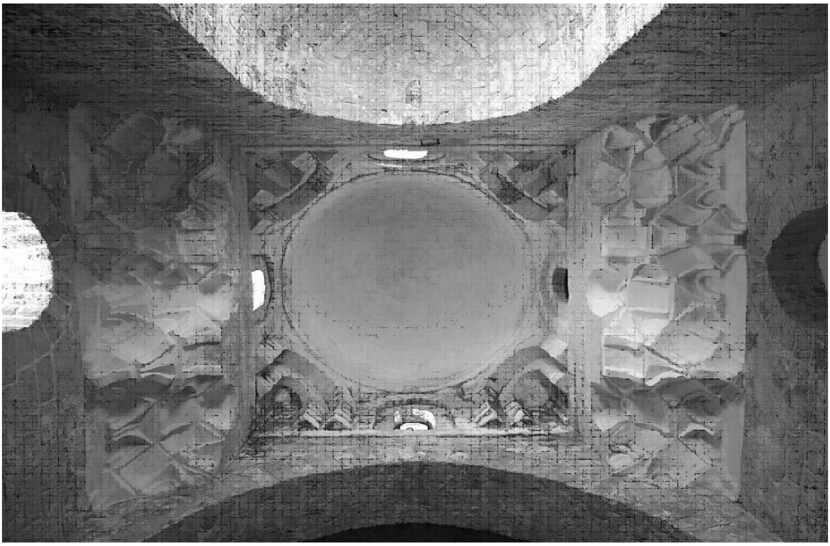

পালেরমোর চিয়েসা ডেলা সান্তিস্‌সিমা ত্রিনিতা আলা জিসা। গম্বুজের নিচে স্থাপিত সরল মুকার্নাস, যা দেয়াল থেকে গম্বুজে যাত্রার ট্রানজিশন তৈরি করে।

“The last Muslims of Sicily were driven from their homes or slaughtered, and with their departure vanished a civilization that had flourished for centuries.”–John Julius Norwich

বাংলা অনুবাদে: “সিসিলির শেষ মুসলিমদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয় বা হত্যা করা হয়, এবং তাদের প্রস্থানসহই একশত বছরের বেশি সময় ধরে সমৃদ্ধ এই সভ্যতা বিলীন হয়ে যায়।”

মুসলিম স্বায়ত্তশাসনের পতন ও জাতিগত নিধন

১১৫৮ সালের পরবর্তী সময়গুলো সিসিলির ইতিহাসের অন্যতম জটিল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত যেখানে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং বাইরের শক্তির চাপ একে অপরের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। রাজা প্রথম উইলিয়াম, যাকে অনেকে “দ্য ব্যাড” নামে আখ্যা দিয়েছিল, তিনি তখন রাজসিংহাসনে ছিলেন। তাঁর শাসনকাল শুরু হয়েছিল এক অস্থির সময়ে। তার মন্ত্রী “মাইও অব বারি” ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত চালিকাশক্তি, যিনি প্রশাসনের দায়িত্ব ও রাজকীয় নীতি সম্পূর্ণভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। তাঁর দক্ষ সংগঠন ক্ষমতা যেমন রাজদরবারকে স্থিতিশীল করেছিল, তেমনি তাঁর উচ্চাভিলাষ এবং কর্তৃত্ব তাকে অসংখ্য শত্রুর মুখোমুখি করেছিল।

সিসিলির রাজনীতি তখন মূলত বিভক্ত ছিল তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে। একদিকে ছিল রাজকীয় প্রাসাদকেন্দ্রিক এক শ্রেণির মুসলিম খোঁজা ও আরবি-লিপিকার, যারা প্রশাসনিক দপ্তর ও রাজকোষের দায়িত্বে ছিল। অন্যদিকে ছিল লাতিন খ্রিষ্টান বারনরা[৩৭], যারা দ্বীপের গ্রামীণ সম্পত্তি এবং সামরিক শক্তির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। এর পাশাপাশি ছিল চার্চের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পালেমোর আর্চবিশপ, সাইরাকিউজের বিশপ কিংবা রোমঘনিষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা, যারা রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রায়ই সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করত। এই তিন শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ ছিল না, আর মাইওর হাতে এর প্রায় সব সুতো একত্রিত হয়েছিল।

---

[৩৭] “বারন” (Baron) শব্দটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে ব্যবহৃত একটি সামন্তবাদের উপাধি অর্থাৎ, কোনো রাজা বা সম্রাটের অধীনে ভূমির মালিক ও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাত শ্রেণি, যারা রাজাকে আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে শাসন ও সম্পদ পেতেন।

এই সময় বাইরের সম্পর্কও সমানভাবে সংকটপূর্ণ ছিল। রোমান সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা দক্ষিণ ইতালিতে তার কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য তৎপর ছিল। জার্মান সামরিক অভিজাতরা সিসিলির প্রতি সব সময়ই লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মাইও তার দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে ফ্রেডরিকের সঙ্গে সম্পর্কের এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। মাঝে মাঝে আত্মসমর্পণমূলক চুক্তি, আবার মাঝে মাঝে কড়া অবস্থান–এসবের সমন্বয়ে তিনি তার রাজনৈতিক পথ পরিচালনা করে আসছিলেন। একই সময়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সিসিলির প্রতি আগ্রহী ছিল। বিশেষত দ্বীপটি ছিল ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ও সামরিক ঘাঁটি। সিসিলি তার জন্য ছিল এক অমূল্য পুরস্কার।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম শক্তিগুলোর সাথেও সিসিলির এক অদ্ভুত সম্পর্ক বজায় ছিল। যদিও দ্বীপ তখন নর্মানদের খ্রিষ্টান শাসনের অধীনে ছিল, তবুও মুসলিম জনসংখ্যা যথেষ্ট বড় এবং প্রভাবশালী ছিল। মুসলিম বণিকরা কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও আফ্রিকার বন্দরের সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মুসলিম খোঁজারা এবং আরবি ভাষার দপ্তর প্রশাসনের কেন্দ্রে ছিল। এই দ্বৈত পরিচয় সিসিলিকে বাইরের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে এক অদ্ভুত কূটনৈতিক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিল শত্রুও নয়, আবার বন্ধু হিসেবেও নয়; বরং প্রয়োজনমতো সহযোগী।

এই সময়ের রাজনীতি ছিল রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রে ভরা। ১১৬০ সালে মাইও'র হত্যাকাণ্ড এই সময়ের নাটকীয়তার শীর্ষবিন্দু। অসংখ্য শত্রু ও হিংসার শিকার হয়ে তিনি প্রাসাদের মধ্যেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য একেবারে ভেঙে দেয়। বারনরা ক্ষমতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, চার্চ নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে, আর মুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

উক্ত "আমির অব আমির'স মাইও অব বেরি" ছিলেন দ্বাদশ শতকের সিসিলির রাজনীতির এক বিস্ময়কর চরিত্র, যার উত্থান যেমন ছিল নাটকীয়, তেমনি পতনও ছিল রক্তাক্ত ও মর্মান্তিক। তাঁর জীবনী যেন সিসিলির সেই সময়ের রাজনৈতিক জটিলতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ক্ষমতার তীব্র সংঘাতের প্রতীক।

মাইও'র জন্ম হয়েছিল সাধারণ এক পরিবারে, দক্ষিণ ইতালির বারি নগরীতে। তিনি জন্মসূত্রে অভিজাত ছিলেন না, বরং তাঁর কৃতিত্ব ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা, কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এবং প্রাসাদ রাজনীতিতে অদ্ভুত এক নৈপুণ্য। রাজা প্রথম

উইলিয়াম'র রাজত্বকালে তিনি ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। প্রথমে এক সাধারণ নোটারি থেকে পরে রাজপ্রাসাদের অন্তঃকক্ষে প্রধান উপদেষ্টা, এবং শেষে আমির অব আমিরস অর্থাৎ "আমিরদের আমির", অর্থাৎ সিসিলির প্রধানমন্ত্রী। এই পদটি তাঁকে শুধু প্রাসাদের ভেতরে নয়, পুরো দ্বীপজুড়ে কার্যত সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

তাঁর উত্থানের পেছনে মূল কারণ ছিল দক্ষতা ও কঠোর সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনি দিওয়ান তথা প্রশাসনিক দপ্তরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, করব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন এবং রাজকোষকে সুশৃঙ্খল রাখেন। মাইও একই সাথে ছিলেন কূটনীতির কারিগর। তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও রোমান সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসার সাথে সম্পর্ক জটিল হলেও ভারসাম্যের সাথে পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর চুক্তি ও আলোচনার কৌশল রাজ্যকে বহুবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব-কায়রো, আফ্রিকা বা আন্দালুসের সাথেও বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই বহুমুখী ভারসাম্য সিসিলিকে ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল।

এই অভূতপূর্ব ক্ষমতা তাঁকে অসংখ্য শত্রু তৈরি করে দেয়। লাতিন খ্রিষ্টান অভিজাতরা তাঁকে ঘৃণা করত, কারণ তিনি প্রাসাদের মুসলিম খোঁজা ও আরবি-লিপিকারদের ওপর ভরসা রাখতেন। চার্চের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও তাঁর কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারত না। সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখত একজন অত্যাচারী প্রশাসক হিসেবে, যিনি কর আদায়ে কঠোর এবং বিরোধীদের প্রতি নির্মম। আর রাজপ্রাসাদের ভেতরে অসংখ্য গোপন ষড়যন্ত্র জমে উঠছিল, যেগুলো তাঁকে একদিন গ্রাস করবে।

১১৬০ সালের গ্রীষ্মে সেই চরম মুহূর্ত আসে। দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্র শেষে একদল অভিজাত ও ষড়যন্ত্রকারী মাইওকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাঁকে প্রাসাদের ভেতরেই আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যু শুধু একজন মন্ত্রীর পতন ছিল না; বরং এটি ছিল সিসিলির রাজনীতির এক যুগের সমাপ্তি। মাইও জীবিত থাকাকালীন যে রাজনৈতিক স্থিতি ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য ডুবে যায় অস্থিরতা, বিদ্রোহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে।

মাইও অব বারির উত্থান ও পতন একদিকে একজন সাধারণ মানুষের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাহিনি, অন্যদিকে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছালে কেমন করে শত্রুদের

চক্রান্তে পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে তার ইতিহাস। তিনি ছিলেন রাজদরবারের স্থপতি, আবার একই সাথে নিজের পতনের নির্মাতা। সিসিলির ইতিহাসে তাঁর নাম আজও থেকে গেছে একজন কঠোর প্রশাসক, কূটনীতির জাদুকর এবং ক্ষমতার খেলায় এক অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে।

এভাবেই যেন সিসিলির ইতিহাসে ১১৬০ সালের দিনগুলো এক অগ্নিঝড়ের মতো নেমে আসে। রাজপ্রাসাদ, যা দীর্ঘদিন রাজ্যের শৃঙ্খলার প্রতীক, হঠাৎই হয়ে ওঠে ঝড়ো বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তু। প্রাসাদের বৃহৎ দরজাগুলি ভেঙে দেওয়া হয়, চতুর্থাংশে প্রবেশ করা জনতা অন্ধকার গলিঘেঁষে এগিয়ে আসে। সাইমন এবং টানক্রেড-এর নেতৃত্বে অভিজাত ষড়যন্ত্রকারীরা প্রতিটি কক্ষে প্রবেশ করে। রাজ কক্ষের আলমারিতে রাখা আরবি দলিল, জমির সীমা ও রাজকোষের খাজনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা লুটে নেওয়া হয়। কাগজের প্রতিটি চিরুনির আওয়াজ যেন বলে দিচ্ছিল রাজ্যের নিয়মাবলি ধ্বংস হয়েছে।

রাজকোষের ধন সম্পদ লুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসময়কার সৈন্য ও সাধারণ মানুষও প্রবেশ করে প্রাসাদের ভেতরে। রাজপ্রাসাদের খোলাখুলি প্রাঙ্গণে পাথর নিক্ষেপ, ধনসম্পদ ছিনতাই, চিৎকার আর আতঙ্কের এক বিশৃঙ্খলা। এমনকি ছোট্ট রাজকুমার রজারের কণ্ঠনাদ এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকে নি। শহরের মানুষের হাত ধরে সেও বাঁচতে পারেনি একটি ভুল তীরের আঘাতে তার জীবন নিভে যায়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত সবচেয়ে নির্মম ছিল। যারা বছরের পর বছর রাজপ্রাসাদে উচ্চপদে কাজ করেছিল, কর সংগ্রহে নিয়োজিত ছিল, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থান তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। সেরালকাদি ও অন্যান্য মুসলিম পল্লিতে প্রবেশ করে বিদ্রোহীরা নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকে রেহাই দেইনি। গৃহ জ্বালানো হয়, মসজিদ অপবিত্র করা হয়, ব্যবসায়ী ও কৃষক লুটপাটের শিকার হয়। যারা পালাতে সক্ষম হয়নি, তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মারণাস্ত্র, প্রতিশোধ এবং অমানবিক দমন।

শহরের গলি ও বন্দর এলাকা অশান্তিতে ভরে যায়। দোকান, বাড়ি, ধনসম্পদ সব লুটপাট হয়। মুসলিমরা পালানোর চেষ্টা করে, কেউ কেউ খ্রিষ্টান ভেষজ ধারণ করে বাঁচার চেষ্টা করে। যে অংশ পালাতে পেরেছে, তারা পশ্চিম সিসিলির দিকে সরিয়ে যায়, যেখানে রাজকীয় সৈন্যদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু যারা এগোতে

পারেনি, তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। জনতার চোখে এ যেন ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় প্রতিশোধের মিলনক্ষেত্র।

এই অভ্যুত্থান শুধুই রাজনৈতিক লড়াই ছিল না, বরং ছিল ক্ষমতার খেলা এবং সামাজিক বিদ্বেষের প্রতিফলন। রাজপ্রাসাদের লুটপাট ও মুসলিম পল্লির ধ্বংসযজ্ঞ একসাথে যেন একটি কাহিনি তৈরি করল একটি কাহিনি, যেখানে প্রতিটি ধ্বংসস্তূপের পেছনে লুকিয়ে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, লোভ, প্রতিশোধ আর বেদনা।

রাজপ্রাসাদের প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি জানালা, প্রতিটি চত্বর যেন সেই সময়কার হাহাকার ও চিৎকারের সাক্ষী। শহরের নাগরিকেরা তাদের চোখে দেখল ক্ষমতার পতন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ, আর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর লুটপাট ও হত্যার অভিশাপ। প্রাসাদের লুণ্ঠন ও মুসলিম হত্যাকাণ্ড একসঙ্গে মিলিয়ে যেন ইতিহাসের পাতায় কালো দাগ হয়ে রইল সিসিলির রাজনীতির অন্ধকার অধ্যায়।

ইতিহাসের নির্মম সত্য যে ১১৫০ থেকে ১১৬০ সালের মধ্যে পালেরমো শহরের গলি ও বন্দর এলাকা যেন একটি অচেনা অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং ক্ষুদ্র গ্যাং বা গোষ্ঠী-সংক্রান্ত সংঘর্ষ, কখনো কখনো পুরো শহরকে অচল করে দিত। এই সময়ে মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিভাজনসহ নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ বিদ্যমান ছিল, যা সহজেই সহিংসতায় রূপ নিত।

গ্যাং বা দলগুলোর মূল উদ্দেশ্য প্রায়ই ছিল সম্পদ দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো, আর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার। কখনো কখনো রাজনীতির শীর্ষে থাকা অভিজাতদের নির্দেশে এই সহিংসতা পরিচালিত হতো। গ্যাংগুলো বিভিন্ন শহরের প্রান্ত বা মুসলিম পল্লিকে লক্ষ্য করত। প্রাচীন কাগজপত্র এবং সরকারি নথি থেকে জানা যায়, নোটারি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ চিঠিপত্রে বার্বার উল্লেখ রয়েছে যে, বাণিজ্যিক এলাকা, বাজার, ঘরবাড়ি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনা লুটের শিকার হয়েছে।

প্রায়শই, সহিংসতা শুরু হতো কোনো ছোটসাজানো বিবাদ বা আঞ্চলিক বিরোধ দিয়ে, যা কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো মহল্লাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ত। মুসলিম পল্লির বাজারে হঠাৎ প্রবেশ করে ঘর ভাঙচুর, পণ্য লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ এই সবই ছিল নিয়মিত। একেবারে ছোট শহরের রাজপথ থেকে শুরু করে প্রধান বন্দর পর্যন্ত এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ত। সাধারণ নাগরিকেরা, বিশেষ করে নারী ও শিশু, আতঙ্কে স্থানান্তরিত হতো।

নিয়মিতভাবে লুটপাটের সঙ্গে জড়িত ছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ। অভিজাত ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চিঠিপত্রে দেখা যায়, গ্যাংগুলো প্রায়শই "ভাড়াটে জনতা" হিসেবে কাজ করত, প্রয়োজনে রাজপ্রাসাদের বা ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে জনসাধারণের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করতে। এই ধরনের গোষ্ঠী-সংক্রান্ত সহিংসতা নগরের নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে দিত।

প্রথম দিকে গ্যাং-সংক্রান্ত সহিংসতা ছিল অল্প আকারের, কিন্তু ১১৫৫-১১৫৬ সালের বিদ্রোহের সময় এটি শহরের অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাজপ্রাসাদের আশেপাশের গলি, বাজার ও ব্যক্তিগত বাড়ি লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়শই, প্রতিটি সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ঘরবাড়ি ধ্বংস, ব্যবসা লুট, এবং কিছু ক্ষেত্রে জীবনহানি। এই ক্ষয়ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা সামাজিক ছিল না; এটি শহরের রাজনৈতিক শক্তির প্রতিফলনও ছিল।

তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, গ্যাং-সংক্রান্ত সহিংসতার জন্য কখনো কখনো রাজপ্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল। তারা নিজের স্বার্থ, অর্থনৈতিক লোভ বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই গ্যাং-দলকে ব্যবহার করত। কখনো কখনো সহিংসতা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, প্রায়শই এটি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অংশ হিসেবে পরিচালিত হতো। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম এবং খ্রিষ্টান পল্লির মধ্যে এই সংঘাত সময়ে সময়ে এক প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক ভয়ংকর উত্তেজনার রূপ নিত।

প্রমাণভিত্তিক এই নথি ও বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে, প্যালারমোর এই দশকটি শুধুমাত্র স্থানীয় জনতা বা গ্যাং-সংঘর্ষের কারণে অশান্ত ছিল না; বরং এটি ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাপে উদ্ভূত সহিংসতার এক জটিল মিলনক্ষেত্র, যেখানে ক্ষয়ক্ষতি ও আতঙ্ক শহরের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

দৃশ্যত ১১৬০-এর দশকের সিসিলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর সংঘটিত সহিংসতা ও রাজনৈতিক চাপে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গণহত্যার ঠিক আগে, রাজপ্রসাদের প্রধান মাইও-ও নির্দেশে পালেরমোর মুসলিমরা তাদের অস্ত্র হস্তান্তর করেছিলেন। কেন এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে এ থেকেই বোঝা যায় যে, মুসলিমরা সাধারণত

রাজা ও প্রশাসনের প্রতি শান্তিপ্রিয় মনোভাব দেখিয়েছিল এবং সরাসরি কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক হুমকি তৈরি করছিল না।

সিসিলির অভ্যন্তরীণ হুমকি মূলত ছিল দ্বীপের মূল ভূখণ্ডের বারন ও লোম্বার্ড শহরগুলো থেকে, আর আফ্রিকা থেকে আসা মুসলিম বাহিনী ও আলমোহাদের সহায়তা সত্ত্বেও সিসিলিকে দখল করা সম্ভব ছিল না। অস্ত্র হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় অবশ্যই স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল।

এ ছাড়া, মুসলিমদের অস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছিল সম্ভবত ক্ষমা বা ন্যায়সংগত সমঝোতার অংশ হিসেবে, যা রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে করা হয়েছিল। এভাবে তাদের রক্ষা বা প্রশাসনিক নজরদারি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। অস্ত্র হস্তান্তরের পর মুসলিমদের শহরের কিছু অংশ থেকে স্থানান্তর করা হয়, যাতে তারা এখন সার্কালকাদি (শারি' আল-কাদী) এলাকার উত্তরাংশে কেন্দ্রীভূত হন, যা আধুনিক পালেরমোর ক্যাপো এলাকায় প্রায় সমান।

১১৬০ সালে মাইও-এর হত্যার পর তার দেহের অপমানজনক অবস্থান, শিশু রাজপুত রজারকে শহরে প্রদর্শন, এবং প্রাসাদ লুট এই সব ঘটনা জনতার প্রভাবের স্পষ্ট উদাহরণ।

মোটকথা, সিসিলির মুসলিমরা রাজকীয় হুমকি ও রাজনৈতিক নিপীড়নের মুখে প্রতিরক্ষা ও অস্ত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছিল। শহরে স্থানান্তর, ঘরবাড়ি লুট এবং জমি দখলের মতো ঘটনাগুলো মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্রমশ সংরক্ষিত এলাকা ও রাজকীয় নজরদারির মধ্যে সীমিত করেছিল, যা তাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে রজার সক্লাভুসের তৎপরতা সিসিলির মুসলিমদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। সেখানকার মুসলিমদের ওপর গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন ঐতিহাসিক "ফালকান্ডুস" ও "রোমুয়াল্ড"[৩৮]। রজার সক্লাভুসের নেতৃত্বে দ্বীপের পূর্বাংশে অভিযান চালানোর ফলে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হন। ফালকান্দুস ও রোমুয়ালদ দুজনেই এই হত্যাকাণ্ডের বিশদ বর্ণনা করেছেন।

---

[৩৮] হুগো ফালকান্দুস (Hugo Falcandus) ও রোমুয়াল্ড অব সালার্নো (Romuald of Salerno)—দুজনই ১২শ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ লাতিন ইতিহাসবিদ, যাঁদের লেখা থেকেই আমরা সিসিলির মুসলিমদের শেষ যুগ, নর্মান রাজনীতি, ও প্রশাসনিক অস্থিরতা সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাই।

লোম্বার্ডদের আক্রমণ ছিল অপ্রত্যাশিত এবং কোনো ভিন্নতা চিন্তা না করে সব মুসলিমকে লক্ষ্য করেছিল, যারা খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছিল বা নিজেদের জমির মালিক ছিলেন। লিঙ্গ বা বয়সের কোনো পার্থক্য রাখা হয়নি।

মারা যাওয়া মুসলিমের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হলেও, যারা গোপনভাবে পালিয়ে যেতে বা খ্রিষ্টান সাজে নিজেকে আবৃত্তি করতে পেরেছিল তারা দক্ষিণ সিসিলির নিরাপদ মুসলিম শহরে আশ্রয় নেয়। আজও এই অঞ্চল থেকে তারা দূরে থাকার চেষ্টা করে। রজার সক্লাভুস সিরাকিউজ ও কাতানিয়ার আশেপাশের অঞ্চলেও বার্বার আক্রমণ চালায়।

রজার সক্লাভুস লোম্বার্ডদের সঙ্গে মিলে সিসিলিতে বিদ্রোহ উসকে দেয় এবং যেখানে মুসলিম খুঁজে পায়, সেখানে হত্যা চালায়। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল মুসলিমদের পশ্চিম সিসিলির দিকে স্থানান্তর, যেখানে সংখ্যা বেশি এবং রাজকীয় সুরক্ষা সম্ভাবনা ছিল। বেশির ভাগ পশ্চিমাঞ্চল রাজকীয় জমির অংশ হওয়ায় মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল।

রজার সক্লাভুসের প্রধান ঘাঁটি ছিল বুটেরা, যা পরে রাজা উইলিয়ামের প্রতিশোধ অভিযানে ধ্বংস করা হয়। বিদ্রোহীরা নির্বাসনের মাধ্যমে বেঁচে গেলেও, বুটেরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এর পর উইলিয়াম মূল ভূখণ্ডে ফিরে ক্যালাব্রিয়া ও আপুলিয়ার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্রোহী শহরগুলোতে রেডেম্প্তিও নামে একটি অপ্রিয় কর আরোপ করেন।

রজার সক্লাভুস এবং তার অনুসারীদের অভিযান মুসলিমদের সিসিলি দ্বীপের পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্থানান্তরিত করে এবং তাদের সংখ্যাগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রাজকীয় জমির নিরাপত্তা ও স্থানান্তরিত মুসলিম শহরগুলো একমাত্র আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছিল।

রজার সক্লাভুস (Roger Sclavus) ছিলেন নর্মান রাজা প্রথম উইলিয়াম (William the Bad)-র রাজদরবারের এক শক্তিশালী সেনানায়ক ও প্রশাসক। ধারণা করা হয়, তিনি পূর্ব ইউরোপীয় দাসজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন, এবং রাজকীয় অনুগত সেনাপতি হিসেবে দ্রুত উচ্চপদে উন্নীত হন। তার নাম “Sclavus” (অর্থাৎ Slavonic) থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি সম্ভবত স্লাভিক উৎসের হলেও পরবর্তীতে খ্রিষ্টান সেনানায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইতিহাসে তিনি

স্মরণীয় হয়ে আছেন সিসিলির মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্মম দমন অভিযান পরিচালনার জন্য।

রজার সল্লাভুসের উত্থান ঘটে এমন একসময়ে, যখন সিসিলির নর্মান রাজদরবারে মুসলিম প্রশাসক, সৈন্য ও শিক্ষাবিদরা এখনও ব্যাপক প্রভাব ধরে রেখেছিল। রাজা উইলিয়াম প্রথম ও তার আশপাশের খ্রিষ্টান বারনরা মুসলিমদের শক্তি ও জনপ্রিয়তাকে রাজনৈতিকভাবে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। তাদের আশঙ্কা ছিল মুসলিমরা আবারও বিদ্রোহ সংগঠিত করে নর্মান শাসন উচ্ছেদ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাজা উইলিয়াম সল্লাভুসকে নিযুক্ত করেন মুসলিমদের ওপর কঠোর অভিযান পরিচালনার দায়িত্বে।

১১৫৮ থেকে ১১৬০ সালের মধ্যে এই সল্লাভুসের নেতৃত্বে শুরু হয় এক রক্তাক্ত অধ্যায়। পালেরমো, মজারা, এননা ও সিরাকিউজ অঞ্চলে তিনি হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেন, বহু মসজিদ ও বসতি ধ্বংস করেন, এবং শত শত পরিবারকে বন্দি বা নির্বাসিত করেন। ধারণা করা হয় যে তার দ্বারা জাতিগত মুসলিম নিধনযজ্ঞে প্রায় প্রায় ১০ হাজার মুসলিম নিহত হয় এবং যেটা ছিল সেখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ ভাগ। ঐতিহাসিক হুগো ফালকান্দুস তাঁর Historia Sicula গ্রন্থে লিখেছেন, “রাজকীয় প্রতিশোধের নামে রজার সল্লাভুস সিসিলিকে রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছিল।” এই সময়ে মুসলিম প্রশাসক ও সৈন্যদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর রাজদরবারে খ্রিষ্টান বারনদের আধিপত্য স্থায়ী রূপ পায়।

সক্রিয় দমননীতির পেছনে ছিল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও জাতিগত বিদ্বেষের এক মিশ্র প্রেক্ষাপট। সল্লাভুস নিজেকে ‘খ্রিষ্টান প্রতিশোধের যোদ্ধা’ হিসেবে উপস্থাপন করেন, যা তাকে ধর্মীয় বৈধতার ছায়া দেয়। কিন্তু এর ফলাফল ছিল সিসিলির মুসলিম সমাজের ভয়াবহ বিপর্যয়। প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ে, মুসলিমদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হয়, এবং দ্বীপের আরবি ভাষা ও ইসলামি ঐতিহ্য ক্রমে বিলীন হতে থাকে।

রজার সল্লাভুসের অভিযান ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। তাঁর নির্মমতা সিসিলির মুসলিমদের চূড়ান্ত পতনের সূচনা ঘটায়। তিনি রাজদরবারের আনুগত্যে নিজের নাম ইতিহাসে স্থায়ী করতে পেরেছিলেন, কিন্তু সেই স্থায়িত্ব এসেছে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিমের রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে।

প্যালার্মো ক্যাথেড্রালের বাইরের দিক। নর্মানরা এটি নির্মাণ করেছিলেন একটি প্রাচীন মসজিদের জায়গায়। ক্যাথেড্রালটি নর্মান, গথিক, বারোক এবং আরব-নর্মান স্থাপত্য শৈলীর মিশ্রণ। প্রধান প্রবেশদ্বারের একটি স্তম্ভে কুরআনের একটি অংশ লেখা আছে। ভিতরে গেলে বোঝা যায় এটি আগে মসজিদ ছিল, কিন্তু যারা কখনো মসজিদে যাননি, তারা হয়তো কখনো বুঝবেন না।

“The ruler is a shepherd and the people are his flock; he will be held accountable for their welfare and mismanagement.” – Al-Mawardi

ক্ষমতা, আনুগত্য ও নিঃসঙ্গতার প্রতীক

দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসে খোঁজাদের ব্যবহার এক অদ্ভুত অথচ বাস্তব সত্য, যা একই সাথে ক্ষমতা, আস্থা, নিপীড়ন এবং নিঃসঙ্গতার প্রতীক। রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে প্রশাসন, কূটনীতি থেকে ধর্মীয় স্থান সবখানেই তাদের উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। প্রাচীন সিসিলি, কায়রো, তিউনিস কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ার মতো শহরগুলিতে খোঁজারা রাজাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা অন্তঃপুর পাহারা দিত, রাজকুমারদের তত্ত্বাবধান করত এবং রাজপরিবারের গোপনীয়তা রক্ষা করত। রাজপ্রাসাদের ফরমানপত্রে তাদের স্বাক্ষর প্রায়শই পাওয়া যায়, যা কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার নয়; বরং অন্তর্গত বিশ্বাসের চিহ্নও বহন করত। এক খোঁজা রিচার্ডের স্বাক্ষরে লেখা ছিল “আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই গোপন নয়।” বাইরে খ্রিষ্টান রাজদরবারের চাকর হলেও ভেতরে তিনি নিজের ইসলামি বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন।

তাদের কার্যক্রম কেবল প্রাসাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। কর আদায়, নথি প্রণয়ন, সেনা পরিচালনা এসব ক্ষেত্রেও তারা সমান দক্ষ ছিল। নর্মান সিসিলির ক্বাইদ পিটার রাজকীয় রাজস্ব এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় প্রভাবশালী ছিলেন। ফাতেমি মিশরে খোঁজারা রাজদরবারের দূত হিসেবে বাইরের শক্তির সাথে আলোচনায় অংশ নিত। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শত শত বছর ধরে খোঁজারা মক্কা-মদিনার হারেমে সেবার কাজে নিয়োজিত ছিল। নর্মান সিসিলির খোঁজারাও মুসলিম বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও মুক্তিপণ প্রদানে অংশ নিয়েছিল, যা তাদের প্রতি সমাজের আস্থা ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

শিল্প ও সংস্কৃতির জগতেও খোঁজাদের অবদান অগ্রাহ্য করা যায় না। পালেরমোর রাজপ্রাসাদে সংগীতদল পরিচালনা করত মুসলিম খোঁজারা। তারা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ও গান গেয়ে রাজাকে বিনোদিত করত। আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এই সংগীতশিল্পীরা জনগণকে উসকে দিতে পর্যন্ত ব্যবহার করা হতো। ১১৬৮ সালে পালেরমোর এক বিদ্রোহে খোঁজাদের নেতৃত্বে রাজকীয় বাদ্যদল রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

তবে এত গুরুত্ব ও প্রভাবের মাঝেও খোঁজাদের জীবন ছিল জটিল এবং দ্বিমুখী। রাজদরবারের আস্থাভাজন হলেও তারা সমাজে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার শিকার ছিল। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ধর্মদ্রোহিতা কিংবা বিদেশি শক্তির সাথে যোগসাজশের অভিযোগ প্রায়ই তোলা হতো। লাতিন খ্রিষ্টান অভিজাতরা তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করত। পুরুষত্বহীনতার কারণে তাদের নিয়ে কটূক্তি করা হতো, এবং সমাজে তাদের অবস্থান হয়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত বৈপরীত্য-ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকেও গভীর নিঃসঙ্গতার আবাস।

দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের এই ইতিহাস আমাদের দেখায়, খোঁজারা কেবল এক নিপীড়িত শ্রেণি ছিল না, তারা ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। কখনো রাজাদের আস্থাভাজন, কখনো প্রশাসনের কর্মকর্তা, কখনো ধর্মীয় সেবক কিংবা শিল্পের ধারক সব ভূমিকায় তারা নিজেদের অদ্ভুত ছাপ রেখে গিয়েছে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তারা রয়ে গিয়েছে বিতর্কিত, ভঙ্গুর এবং সর্বাধিক একা।

সিসিলির মুসলিম সমাজের ধর্মীয় দ্বিধা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দ্বীপটির নির্দিষ্ট শহর ও প্রাসাদের উদাহরণগুলো এই জটিল বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

তখনকার পালেরমো ছিল মুসলিম সিসিলির প্রাণকেন্দ্র। এখানে দিওয়ান বা রাজকীয় প্রশাসনিক দপ্তর পরিচালনা করতেন মুসলিম লেখক, কর সংগ্রাহক ও খোঁজারা। রাজকীয় নথিতে তারা আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন, যা শুধু রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্যই নয়; বরং তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এখানেই মুসলিম সেবকরা খ্রিষ্টান শাসকের নামে কাজ করতেন। বাহ্যিক আনুগত্য ও অন্তরের ইসলামি বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্বই ছিল পালেরমোর মুসলিমদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

সিরাকিউজ ছিল মুসলিমদের জন্য আরেকটি দুঃসহ অভিজ্ঞতার কেন্দ্র। শহরটি বহুবার অবরোধের শিকার হয়েছিল। খ্রিষ্টানরা শহর দখলের চেষ্টা চালায়, আর মুসলিমরা প্রতিরোধ করে। কিন্তু অবরোধ ব্যর্থ হলে আশেপাশের গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র লুণ্ঠিত হতো। মুসলিমরা বুঝতে পারত, তাদের শ্রমে গড়া ফসল এক নিমিষে হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের মনে জন্ম নিত হতাশা, কিন্তু একই সাথে আরও দৃঢ় হতো বিশ্বাস-আল্লাহই তাদের রক্ষক। তাই ধর্মীয় দ্বিধার ভেতর দিয়ে গেলেও, সিরাকিউজের মুসলিমদের অন্তর্দেশীয় প্রতিরোধ টিকে থাকত।

এন্না (তৎকালীন ক্যাস্ত্রোজোবানি) ছিল দ্বীপের কেন্দ্রীয় শহর। ৮৫৯ সালে মুসলিমরা শহরটি বিজয় করে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে। এন্নার মুসলিম

পরিবারগুলো তাদের ধর্মীয় জীবনযাপন চালিয়ে গেলেও বাইজান্টাইন ও পরবর্তী নর্মান চাপ তাদেরকে বারবার দ্বিধায় ফেলত। একদিকে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের সংরক্ষণ, অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতা। শিশুদের কুরআন শিক্ষা গোপনে চলতে থাকত, কিন্তু দিনে দিনে আশঙ্কা বেড়ে যেত-কোনো একদিন হয়তো তারা বাধ্য হবে খ্রিষ্টান শাসকের আনুগত্যে নিজেদের পরিচয় বদলাতে।

আগ্রিজেন্টো এবং আশেপাশের শহরগুলোতে মুসলিমরা কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে টিকে ছিল। তারা সেচব্যবস্থায় দক্ষ ছিল এবং ক্ষেতের কাজে ইসলামি নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রায়ই আক্রমণ ও লুণ্ঠনের শিকার হতো। ফলে তাদের ধর্মীয় জীবনও বারবার চাপে পড়ত। মসজিদে নামাজ পড়া ছিল বিশ্বাসের দৃশ্যমান প্রকাশ, অথচ সেই বিশ্বাসই তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠী।

পালেরমোর প্রাসাদগুলোতে মুসলিম খোঁজারা খ্রিষ্টান রাজাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ও কর্মকর্তা ছিলেন। তারা প্রশাসন চালাতেন, কর সংগ্রহ করতেন, এমনকি দূতাবাসের মতো সংবেদনশীল কাজেও যুক্ত ছিলেন। অথচ বাইরে বেরোলেই তারা খ্রিষ্টান অভিজাতদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার শিকার হতেন। প্রাসাদের ভেতরে ছিল প্রভাবশালী অবস্থান, বাইরে ছিল ভঙ্গুরতা। এর মধ্যেই তারা নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে নিতেন-গোপন আলামা স্বাক্ষর, মুসলিম সমাজকে অর্থ সাহায্য, কিংবা বন্দি মুসলিমদের মুক্তির উদ্যোগের মাধ্যমে।

সিসিলির মুসলিম শাসনকাল এবং পরবর্তী নর্মান যুগে প্রাসাদের খোঁজা[৩৯] বা ইউনার্চরা এক বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন, যা শুধু রাজপ্রাসাদের ভেতরকার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রাজনীতির অন্দরমহল থেকে শুরু করে রাজস্ব, নৌবাহিনী, সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের শারীরিক অবস্থার কারণে তারা সরাসরি বংশ বিস্তারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, ফলে রাজাদের চোখে তারা বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য কর্মচারী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই নির্ভরযোগ্যতাই ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়।

---

[৩৯] ইউনার্চ বলতে বোঝানো হতো সেই পুরুষদের, যাদের খোজা করা হতো বা জন্মগতভাবে প্রজনন ক্ষমতা থাকত না। সাধারণত দাসত্ব বা রাজপ্রাসাদের সেবার উদ্দেশ্যে ছোটবেলায় তাদের খোজা করা হতো। তাদেরকে রাজপ্রাসাদ, রাজপরিবারের অন্তঃপুর (বিশেষ করে হারেম), দিওয়ান বা রাজস্ব দপ্তর, সামরিক প্রশাসন, এমনকি ধর্মীয় স্থানে রক্ষক ও সেবক হিসেবে নিয়োগ করা হতো।

বলাবাহুল্য যে, মুসলিম শাসনামলে খোঁজাদের ব্যবহার একটি বিশেষ সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রথা ছিল, যা ইতিহাসজুড়ে নানা ধাপে বিকশিত হয়েছে। আব্বাসীয় খিলাফতের সময় থেকেই তাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। খলিফাদের দরবার, হারেম এবং প্রাসাদের অন্তর্গত প্রশাসনে খোঁজাদের নিয়োগ করা হতো। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল নিরাপত্তা ও আস্থা। রাজপ্রাসাদের নারী অধ্যুষিত অন্দরমহলকে রক্ষা করার জন্য শাসকেরা এমন লোক চাইতেন যাদের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রাকৃতিক সম্ভাবনা থাকবে না। খোঁজারা এই প্রয়োজন পূরণ করত। ফলে তারা সম্রাজ্ঞী, রাজকন্যা, দাসী বা অন্যান্য রাজপরিবারের মহিলাদের সঙ্গে অবাধে চলাফেরা করতে পারত, অথচ সম্ভাব্য অনৈতিক সম্পর্কের ভয় থাকত না।

তাদের প্রতি বিশ্বাসের আরেকটি কারণ ছিল তাদের সামাজিক অবস্থান। খোঁজারা সাধারণত সমাজের প্রচলিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত। তারা পরিবার গড়তে পারত না, বংশ বিস্তার করতে পারত না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাসাদের ওপর নির্ভরশীল থাকত। ফলে তাদের আনুগত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাসকের দিকেই নিবদ্ধ হতো। এই আনুগত্য ও নির্ভরশীলতাকে শাসকেরা রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতেন। তাদের মাধ্যমে গোপন বার্তা আদানপ্রদান, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা, এমনকি রাষ্ট্রের অন্দরমহলের রাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো।

বিভিন্ন মুসলিম রাজবংশে যেমন আব্বাসীয়, উমাইয়া স্পেন, ফাতেমীয় মিসর কিংবা অটোমান সাম্রাজ্যে খোঁজাদের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বিশেষত, পরবর্তীতে অটোমান তুর্কিদের দরবারে কালো আফ্রিকান খোঁজারা হারেমের রক্ষক ও প্রশাসক হিসেবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, তারা রাজকীয় সিদ্ধান্তেও প্রভাব বিস্তার করতে পারত। ইতিহাসে দেখা যায়, অটোমান সাম্রাজ্যের অনেক সময়ে প্রধান খোঁজা বা 'কিজলার আগাসি' প্রায় মন্ত্রী পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে খোঁজা বানানোর প্রথা সব সময় বিতর্কিত ছিল। ইসলামে আল্লাহর সৃষ্ট দেহকে বিকৃত করা বা অঙ্গচ্ছেদ করা অনুমোদিত নয়। এ কারণে অনেক আলেম খোঁজাকরণকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন। তবে একবার কেউ খোঁজা হয়ে গেলে তাকে মানুষ হিসেবে সমাজচ্যুত করার অনুমোদন শরিয়তে নেই। বরং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থে খোঁজাদের ব্যবহার করেছে।

খোঁজাদের ব্যবহার ছিল একদিকে শাসকদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং পারিবারিক অন্দরমহল রক্ষার কৌশল, অন্যদিকে তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও শরিয়তবিরোধী প্রথার প্রতিফলন। ইতিহাসে তারা ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে ঘনিষ্ঠ একশ্রেণি, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসঙ্গ ও বঞ্চিত। তাদের গল্প ইসলামি সাম্রাজ্যের জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে।

সিসিলির প্রাসাদে ইউনার্চরা শুধু রক্ষী বা আয়োজক ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন শাসক শ্রেণির পরামর্শদাতা, নথিপত্র রক্ষক এবং রাজস্ব আদায়কারী। মুসলিম আমলে দিওয়ান প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অটোমান আমলে যেমন হেরেম ও দিওয়ানে ইউনার্চদের প্রভাব সর্বত্র দেখা যায়, সিসিলিতেও নর্মান রাজাদের অধীনে তাদের প্রভাব একইভাবে বিস্তৃত ছিল। নর্মান রাজা রজার দ্বিতীয় থেকে শুরু করে উইলিয়াম প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যন্ত ইউনার্চরা রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছিলেন।

একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো দ্বিতীয় রজারের সময়কার ইউনার্চ ফিলিপপাস। তিনি কেবল প্রাসাদের কর্মকর্তা ছিলেন না, বরং গুরুত্বপূর্ণ করনীতি ও রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তার হাতে ছিল। তার মত ইউনার্চরা প্রায়ই সমুদ্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার কাজে জড়িত ছিলেন। এর ফলে তারা রাজাকে পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও ক্ষমতার সরাসরি অংশীদার হয়ে ওঠেন।

ফালকান্দুসের মতো সমসাময়িক লেখকেরা ইউনার্চদের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন। তার বর্ণনায় ইউনার্চরা শুধু প্রশাসনিক পদে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং রাজা ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে মধ্যস্থতা করতেন। তবে তাদেরকে প্রায়ই সমালোচনা করা হতো দুর্নীতি, ধর্মীয় দ্বিমুখিতা এবং "পুরুষোচিত গুণাবলির অভাব" নিয়ে। তাদের শারীরিক বিশেষত্বকে রাজনৈতিক অপমান হিসেবে ব্যবহার করা হলেও রাজারা তাদের ওপর নির্ভর করতেন কারণ ইউনার্চরা অভিজাত বংশীয় সামরিক নেতাদের মতো বিদ্রোহী বা ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতেন না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো উইলিয়াম প্রথমের সময়। তার প্রাসাদের ইউনার্চরা এতটাই প্রভাবশালী ছিলেন যে, তারা রাজা অনুপস্থিত থাকলেও রাজ্যের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। রাজপ্রাসাদের নথি ও অর্থব্যবস্থার চাবিকাঠি প্রায়শই তাদের হাতে থাকত। অনেক সময় তারা রাজকীয় জমির কর আদায়ে এবং কৃষিজ সম্পদের সঠিক হিসাব রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন।

তাদের কার্যক্রম সিসিলির মুসলিম এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায় উভয়ের কাছেই আলোচিত ছিল। মুসলিম সমাজ তাদের একদিকে দেখত ইসলামের শত্রু রাজাদের সঙ্গে কাজ করা 'সহযোগী' হিসেবে, আবার অন্যদিকে প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে কিছুটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও বিবেচনা করত। তাদের মাধ্যমে মুসলিম কায়দা-কানুন, দিওয়ান ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহের ধারা নর্মান রাজাদের অধীনে বহাল থাকে।

ইউনার্চদের উপস্থিতি সিসিলির প্রাসাদ সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো ইউরোপীয় রাজপ্রাসাদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। তারা ছিলেন সেতুবন্ধনকারী একদিকে আরব-মুসলিম প্রশাসনিক ঐতিহ্য, অন্যদিকে ল্যাটিন-খ্রিষ্টান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। এভাবেই সিসিলির ইতিহাসে প্রাসাদের ইউনার্চরা রাজপ্রাসাদের ভেতরকার ছায়াময় অথচ দৃঢ় এক শক্তি হিসেবে জায়গা করে নেয়।

সিসিলির নর্মান শাসনকালীন প্রাসাদ ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল দুইজন উচ্চপদস্থ ইউনার্চ বা খোঁজা, কাইদ মার্টিন এবং কাইদ পিটার। তারা শুধু প্রাসাদে নয়, রাজকীয় প্রশাসনের কেন্দ্রেও সক্রিয় ছিলেন। কাইদ পিটার প্রায়শই রাজকীয় দলিলপত্র তৈরি ও তদারকি করতেন, আর এসব দস্তাবেজে তিনি এমন সংকেত বা ক্রিপ্টিক বার্তা রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আশা ও প্রতিরোধের প্রতীক স্থাপন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তার দস্তাবেজের এক অংশে লেখা ছিল, "আল্লাহর কাছে কিছুই লুকানো নয়," যা নির্দেশ করে যে পিটার শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে তার বিশ্বাস প্রকাশ করতেন।

কাইদ মার্টিনের কর্মকাণ্ডের তথ্য সীমিত হলেও জানা যায়, তিনি পিটারসহ অন্যান্য খোঁজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন এবং প্রায়শই প্রশাসনিক ও রাজকীয় নথিসংক্রান্ত কাজের তদারকি করতেন। তারা প্রাসাদে নিরাপত্তা, রাজকীয় প্রক্রিয়া এবং উচ্চ রাজনৈতিক সংবেদনশীল দায়িত্ব সামলাতেন। একই সাথে তারা একে অপরের সাথে পরিবারসদৃশ সম্পর্ক স্থাপন করে, পেট্রনেজ বা মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন তৈরি করতেন, যা প্রায় 'দত্তক' বা ক্লায়েন্ট সম্পর্কের মতো কাজ করত।

দ্বীপের বাইরে তাদের প্রভাবও কম ছিল না। তারা রাজকীয় কর সংগ্রহ, তদন্ত পরিচালনা এবং প্রশাসনিক তদারকি করতে দ্বীপজুড়ে সফর করতেন। কাইদ পিটার এমনকি টারমিনি ইমেরেসে রাজকীয় ভবনের নির্মাণ তদারকিতেও যুক্ত ছিলেন, যা ত্রিভাষিক শিলালিপির মাধ্যমে প্রমাণিত। এ ছাড়া, তারা মুসলিম

সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, যেমন ধর্মীয় বা সামাজিক কাজের তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বন্দি মুসলিমদের মুক্তিপণ আদায়।

এই দুজন খোঁজা প্রাসাদের বাইরে ও ভিতরে একধরনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতেন, যেখানে প্রাসাদ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তথ্য, অর্থ ও রাজনৈতিক সংযোগ বজায় থাকত। তাদের উচ্চপদস্থ অবস্থার কারণে অনেক সময় তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বা আলমোহাদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগও উঠত, যা প্রায়শই রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে প্রয়োজনীয় ছিল। কাইদ মার্টিন এবং কাইদ পিটার একসাথে প্রাসাদ ও রাজ্য প্রশাসনের অত্যন্ত সংবেদনশীল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, এবং তাদের কর্মকাণ্ড ছিল নর্মান সিসিলির মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

হত্যা, লুণ্ঠন ও লুটতরাজের শিকার মুসলিমদের অবস্থা যখন অত্যন্ত সংকাপন্ন। অন্যদিকে রাজেত্বের চতুর্দিকেও বিচ্ছিন্নতা। সব মিলে এক ভয়ানক চিত্র। এমতাবস্থায় রাজার আসনে আসীন সিসিলির রানী মার্গারেটের শাসনামলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল আরও সংকটাপন্ন এবং যদিও তা ইতিহাসে অনেকটা অস্পষ্ট। রাজ্যের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নর্মান ক্রাউন ও রানীর প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও, মুসলিমরা প্রায়শই অনিরাপদ ও অস্থিরতায় বোধ করতেন। তারা পূর্ববর্তী শাসকদের সময়ে প্রাপ্ত কিছু স্বীকৃতি এবং সামাজিক অধিকার বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল, তবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কারণে এই অধিকার প্রায়ই হুমকির মুখে পড়ত।

রানী মার্গারেট তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে নানা পদক্ষেপ নিতেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলেও, এই পদগুলি প্রায়শই সীমিত ক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় নজরদারির মধ্যে রাখা হতো। মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে একটি অংশ কৃষি ও শহুরে বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকলেও, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এখন সীমিত হয়ে পড়ে। এমনকি রাজ্যের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোনো স্তরের দায়িত্বশীল পর্যায়ের কারো সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে প্রায়শই তারা বিভিন্ন বিষয়ে এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে খোঁজা ও ক্রাউন অফিসারদের ওপর নির্ভর করত।

মার্গারেটের শাসনকালে, মুসলিমদের সঙ্গে ক্রাউন ও নর্মান বারনদের সম্পর্ক প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ এবং অসহানুভূতিশীল ছিল। বিদ্রোহ বা আক্রমণের ঝুঁকি

থাকায় মুসলিম সম্প্রদায় অধিকাংশ সময় নিরাপদ এলাকা বা শহরকেন্দ্রিক অঞ্চল যেমন সালেরনো ও পশ্চিম সিসিলির বিভিন্ন শহরে চলে যেতে বাধ্য হতো। তবে বাধ্য হয়েই তারা রাজকীয় আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের জীবিকা রক্ষা করত এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করত।

মার্গারেটের সময়কালকে মুসলিমদের জন্য একটি সময়োপযোগী ও সংবেদনশীল পর্যায় হিসেবে দেখা যায়, যেখানে তারা প্রাসাদ ও ক্রাউন প্রশাসনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল, একই সঙ্গে নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ করাই লড়াই করছিল।

রবার্ট অফ কালাতাবিয়ানো, যিনি মুসলিম থেকে খ্রিষ্টানে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন নর্মান সিসিলির উচ্চতর প্রশাসনে একজন অনন্য এবং মনোগ্রাহী চরিত্র। মূলত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা রবার্ট রাজকীয় আদালতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তার দক্ষতা ও যোগ্যতা তাকে প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক কাজে বিশেষ প্রভাবশালী করেছিল।

ধর্মান্তরের পরও তিনি প্রাথমিকভাবে মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১১৬০-এর দশকে সিসিলির বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সহিংসতা চলাকালীন সময়ে, যখন সে রাজকীয় কর্তৃপক্ষের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিল। রবার্টকে প্রায়শই শহর ও প্রদেশ পর্যায়ে প্রশাসনিক তদারকি, কর সংগ্রহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বে দেখা যায়।

তবে রবার্ট কেবল প্রশাসনিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে নৈকট্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি সেতুবন্ধন হিসেবেও কাজ করতেন। প্রায়শই মুসলিম বন্দিদের মুক্তি বা স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করানোর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। এভাবে তিনি একটি দ্বৈত পরিচয় বজায় রেখেছিলেন রাজকীয় নর্মান শাসনের আনুগত্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায্য ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

রবার্টের জীবন ও কর্ম নর্মান সিসিলির প্রশাসন ও সমাজে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উদাহরণ। তার অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সিসিলির রাজকীয় প্রশাসন শুধু শক্তি ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে নয়; বরং নেটওয়ার্ক, কূটনীতি এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।

১১৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্প সিসিলি দ্বীপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। ভূমিকম্পের আঘাত প্রধানত পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলো কাতানিয়া, তাওরমিনা, সিরাকিউজ-এ কেন্দ্রীভূত হয়। সেসময়কার স্থাপত্য, বিশেষত মুসলিম ও নর্মান স্থাপত্যের ধনাত্মক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক বাড়ি, বাজার, মসজিদ এবং প্রশাসনিক ভবন ভেঙে যায় বা ধ্বংস হয়, ফলে নগর জীবনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়।

অর্থনৈতিকভাবে এটি বিপুল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শহরের প্রধান বাজার এবং বাণিজ্যিক অঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে বসবাস করত। বহু পরিবার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শহর ছেড়ে যায়, ফলে মুসলিমদের নগর এলাকা থেকে সংহতি এবং সামাজিক নিয়মকানুনের ধস ঘটে।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভূমিকম্প গুরুতর প্রভাব ফেলে। পালেরমো ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের দফতরগুলো অচল হয়ে যায়, নথিপত্র এবং আর্থিক ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে রাজকীয় কর প্রশাসন এবং স্থানীয় শাসকদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে থেমে যায়। ভূমিকম্পের পর পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় প্রশাসন নতুন নীতি এবং কাঠামো প্রবর্তন করে, যেমন দুর্গ ও প্রশাসনিক ভবনকে আরও মজবুত করা, শহরের পুনর্নির্মাণে নিয়মিত পরিকল্পনা প্রয়োগ করা।

সামরিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের পর শহরের দুর্গগুলো কম্পন-প্রতিরোধী ও প্রতিরক্ষামূলকভাবে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি নর্মান শাসককে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়তা করে এবং ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট আক্রমণ বা অস্থিরতার জন্য প্রস্তুতি নিশ্চিত করে।

১১৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পের মানবিক ও সামাজিক প্রভাব মুসলিমদের জীবনকে সব চেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম শরণার্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রায় সবাই শহরের উত্তর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। এই অভিবাসন সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনে-পাড়াগুলোর মধ্যে প্রাচীন সম্প্রদায়ের সংহতি নষ্ট হয় এবং নতুন, অস্থায়ী গোষ্ঠী তৈরি হয়। অনেক মুসলিম পরিবার শহরের কেন্দ্র থেকে সরে এসে নিরাপদ বলে গণ্য করা দুর্গ এবং প্রশাসনিক অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য হয়, ফলে তাদের শহুরে জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম ও সামাজিক আচারব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও দৃশ্যমান। বহু মসজিদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সাপ্তাহিক নামাজ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা কার্যক্রম সীমিত হয়। স্থানীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে হতাশা এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বাড়ে, যা কিছু ক্ষেত্রে বাইরের সহায়তা ও আঞ্চলিক নেতা এবং শাসকের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে।

শাসক ও প্রশাসনিক দিক থেকেও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রাজকীয় প্রশাসন দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত নগর এলাকায় পুনর্গঠন উদ্যোগ নেয়, দুর্গ, প্রশাসনিক ভবন এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগব্যবস্থাকে মজবুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক পুনর্গঠন নয়; বরং মুসলিম সম্প্রদায়কে পুনর্বিন্যস্ত করার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। মুসলিমদের জন্য, এটি প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নতুন সুযোগও এনে দেয় তারা নগর পরিকল্পনা, পুনর্নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক পুনরায় প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে সক্ষম হয়।

সামরিক ও নিরাপত্তার দিক থেকেও ভূমিকম্প মুসলিমদের অবস্থাকে প্রভাবিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গ এবং শহরের সীমানা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। স্থানীয় মুসলিম সৈন্য ও প্রশাসকরা পুনর্নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যা তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকার ওপর প্রভাব ফেলে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং নেতা-সামরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়, যদিও সাময়িকভাবে ভয়, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করে।

এই ভূমিকম্পে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কেবল ধ্বংসাত্মক নয়; বরং সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে নতুন বিন্যাসের সুযোগও তৈরি করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসে স্থানীয় সমাজ ও প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের প্রতিরোধ ও অভিযোজনের কৌশল স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

"Our swords were sharp, but our hearts were divided — and division was sharper still." (Ibn Al Athir 1160-1233)

বাংলা অনুবাদ: "আমাদের তরবারি ছিল ধারালো, কিন্তু আমাদের হৃদয় বিভক্ত ছিল আর সেই বিভক্তিই ছিল সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।"

সহাবস্থান ও বিলুপ্তির গল্প

এদিকে মনরেয়ালের মুসলিমরা মধ্যযুগীয় সিসিলির ধর্মীয়, সামাজিক ও স্থাপত্যগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। মনরেয়াল (Monreale) সিসিলির অন্যতম ঐতিহাসিক শহর, যা পালেরমো শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। ১১ এবং ১২ শতকে সিসিলিয়ান নর্মান শাসকদের সময়ে তা প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিমরা এই অঞ্চলে রাজকীয় প্রশাসন, কারিগরি দক্ষতা এবং নির্মাণশৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল

দশ শতাব্দীতে শহরটি নর্মান রাজা "দ্বিতীয় উইলিয়াম (১১৬৬-১১৮৯)"-এর সময়ে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। নর্মান শাসনের অধীনে মনরেয়াল ছিল কেবল একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়; বরং ইসলামি, বাইজান্টাইন ও ল্যাটিন সংস্কৃতির অনন্য মেলবন্ধনের প্রতীক। এখানকার বিখ্যাত "মনরেয়াল ক্যাথেড্রাল", যা ১১৭৪ সালে নির্মিত হয়-মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। এই ক্যাথেড্রালের দেয়ালজুড়ে সোনালি মোজাইকচিত্রে নবি (সা.)-এর বাণী, রাজার জীবনচিত্র ও বাইবেলিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে আরবি স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নর্মান রাজারা সিসিলির মুসলিম কারিগর, স্থপতি ও প্রশাসকদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মনরেয়ালকে গড়ে তোলেন এক "আরব-নর্মান শিল্প ঐতিহ্যের রাজধানী" হিসেবে। ইতিহাসবিদদের মতে, মনরেয়াল ছিল একসময়ে মুসলিম স্থপতি, পণ্ডিত ও শ্রমিকদের বাসস্থান, যেখানে ইসলামি শৈলী ও খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য সহাবস্থানের বিরল নিদর্শন গড়ে তোলে। আজও এই শহর মধ্যযুগীয় সিসিলির "বহুধর্মীয় সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের" এক জীবন্ত সাক্ষ্য।

মোনরেয়ালের বিশাল ক্যাথেড্রাল এবং এর আশেপাশের ভবনগুলোর নির্মাণে মুসলিম স্থপতি এবং কারিগরদের অবদান ছিল অসামান্য। এই স্থাপত্যে পরিষ্কারভাবে নর্মান, বাইজান্টাইন এবং ইসলামিক প্রভাবের সমন্বয় দেখা যায়।

কারুকার্য, জায়গার পরিকল্পনা এবং মসৃণ মোরিস্কো প্রভাবযুক্ত নকশা মুসলিম শিল্পীদের দক্ষতা ও শিল্পশৈলীর পরিচয় বহন করে। মনরেয়ালের মরক্কো-প্রভাবিত জায়গাগুলিতে আবর্তিত বৃত্তাকার এবং আয়তাকার প্যাটার্ন, জ্যামিতিক নকশা, এবং সজ্জিত ক্যালিগ্রাফি মুসলিম কারিগরদের হাতে তৈরি হয়েছিল।

মনরেয়ালের মুসলিমরা শুধু নির্মাণে নয়, প্রশাসনিক কাজে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা রাজকীয় দপ্তরে চিঠি ও দলিল তৈরি, কর আদায় এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে প্রশাসনিক সমন্বয় বজায় রাখার মতো কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিল। তাদের দক্ষতা রাজকীয় প্রশাসনের কার্যকারিতা বাড়িয়েছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক থেকেও মুসলিমরা মনরেয়ালে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। যদিও ক্যাথেড্রাল এবং অন্যান্য খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠান প্রধান ছিল, মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি তাদের নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বজায় রাখার সুযোগ দিয়েছিল। স্থানীয় মুসলিম শিক্ষাবিদ এবং ধর্মীয় নেতা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাদান ও ধর্মীয় পরামর্শের মাধ্যমে সম্প্রদায়কে সংহত রাখত।

দ্বিতীয় উইলিয়ামের শাসনকালের সময় সিসিলির রাজনীতি কেবল দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তার শাসনকাল ছিল কূটনৈতিক সাফল্য এবং ব্যয়বহুল ব্যর্থতার মিশ্রণ। ১১৬৬ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় উইলিয়াম শাসনভার গ্রহণ করলে, তিনি এমন সময়ে রাজ্য পেয়েছিলেন যখন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা দুই'ই তীব্র।

রাজকীয় নীতি এবং কূটনৈতিক চতুরতা ব্যবহার করে দ্বিতীয় উইলিয়াম তার অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার আলমোহাদ বংশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সিসিলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন। একই সময়ে, ইতালি এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে তিনি দ্বীপটির অর্থনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করলেন। প্যালার্মোর মাধ্যমে পরিচালিত এই কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রায়শই মুসলিম প্রশাসক ও ইউনার্চদের সহযোগিতায় কার্যকর হয়েছিল।

তবে, এই কূটনৈতিক সাফল্যকে সমর্থন করতে উচ্চ ব্যয় এবং সামরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হতো। মেইনল্যান্ড এবং দক্ষিণ ইতালিতে প্রায়শই অভিযানের ব্যয় সিসিলির রাজকোষের ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, লোমবার্ড বিদ্রোহ দমন এবং সিসিলির বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহ দমন করতে নোটো,

সিরাকিউজ ও অন্যান্য শহরে সেনা পাঠানো হয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

মুক্ত ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়ও ছিল বড় ধরনের ব্যর্থতা। রাজকীয় নীতি বাস্তবায়নে অনেক সময় পরিকল্পিত প্রয়াস ব্যর্থ হয়, বিশেষত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখার ক্ষেত্রে। এই ব্যর্থতার ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রায়শই ঝুঁকির মধ্যে পড়ত।

উইলিয়াম দ্বিতীয়ের শাসনামলে সিসিলির মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সময়টি ছিল চ্যালেঞ্জিং এবং জটিল। যদিও রাজা তার পূর্বসূরিদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে শান্তিপ্রিয় নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মুসলিমদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ছিল। রাজকীয় প্রশাসন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান আধিপত্যে কেন্দ্রীভূত ছিল, এবং মুসলিম সম্প্রদায় প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষায় সতর্ক থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

মুসলিমেরা প্রধানত পালেরমো এবং পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তারা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে চেয়েছিল মসজিদ, কুরআনের শিক্ষা কেন্দ্র, আরবি এবং ইসলামি আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা। মুসলিম অফিসিয়াল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যেমন ক্বায়েদ পিটার ও ক্বায়েদ মার্টিন, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষায় কাজ করতেন, যেমন কর সংগ্রহ, আদালত পরিচালনা, এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করা।

তবে মুসলিমদের উদ্বেগ কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে সহিংসতা এবং কখনো কখনো প্রকাশ্য গোষ্ঠী সংঘাতও তাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলত। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমরা প্রায়শই নিজেদের ঘনবসতি এলাকা, যেমন প্যালার্মোর শেরিয়াহ স্ট্রিট, এবং অন্যান্য মুসলিম-ঘনাঞ্চলগুলোতে আত্মসুরক্ষা বেছে নিত।

উইলিয়াম দ্বিতীয় যদিও কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতি সংবেদনশীল নীতি গ্রহণ করতেন, তবুও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত নিরাপত্তা বা সমানাধিকার নিশ্চিত করা কঠিন ছিল। মুসলিমরা ক্রমাগত রাজকীয় নীতি, স্থানীয় রাজনৈতিক সংঘাত এবং অর্থনৈতিক চাপে নজর রাখতে বাধ্য ছিল, যাতে তারা ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

এই অস্থিরতার মধ্যেও আবু আল-কাসিম নামক এক ব্যক্তি ছিলেন ১২শ শতকের সিসিলির মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা, যিনি প্রায়শই "সিসিলিয়ান মুসলিমদের নেতা" বা "রইস আল মুসলিমিন" হিসেবে পরিচিত। তার নেতৃত্ব কেবল ধর্মীয় নয়; বরং সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। উইলিয়াম দ্বিতীয় শাসনের সময় মুসলিম সম্প্রদায় অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হতো। এই সময়ে আবু আল-কাসিম রাজকীয় আদালত ও প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। এর ফলে মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদে থাকত এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও কর সংগ্রহের বিষয়ে সমঝোতা করা সম্ভব হতো।

আবু আল-কাসিম মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা বজায় রাখার কাজেও বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিলেন। মসজিদ, শিক্ষাকেন্দ্র এবং স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করা এবং সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়া তার মূল দায়িত্বের অংশ ছিল। তিনি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিবাদ-সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, যার ফলে মুসলিমরা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে হলেও সামাজিক ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারছিল। এ ছাড়াও তিনি কর সংক্রান্ত নীতি, জমির ব্যবহার এবং সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় রাজকীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করতেন। তিনি নিশ্চিত করতেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পদ এবং জমি অবৈধভাবে হরণ বা অন্যায়ভাবে কর আরোপের শিকার না হয়।

যদিও মুসলিমরা ন্যূনতম সামরিক ক্ষমতা রাখত, আবু আল-কাসিম প্রয়োজনে স্থানীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সমন্বয় করতেন। বিশেষ করে দাঙ্গা, বিদ্রোহ বা অশান্তির সময় তিনি মুসলিমদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতেন। তার যোগ্যতা, শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে মুসলিম সম্প্রদায় তাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আবু আল-কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিমরা তাদের মসজিদ, শিক্ষাকেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করতে পেরেছিল এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদে থাকতে পেরেছিল।

তার প্রশাসনিক প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক দক্ষতা মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজকীয় আদালতের সঙ্গে সমন্বয় এবং নিরাপদে থাকা নিশ্চিত করেছিল। মুসলিমরা আবু আল-কাসিমের নেতৃত্বের মাধ্যমে একদিকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা

বজায় রাখতে পেরেছিল, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। আবু আল-কাসিমের নেতৃত্ব সিসিলির মুসলিমদের জন্য শুধু নিরাপত্তা নয়, একধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সাংগঠনিক শক্তি প্রদান করেছিল, যা দ্বীপে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থানকে শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ফাতিমি শাসনব্যবস্থার পতন এবং সুন্নি-শিয়া দ্বিধা মধ্যযুগীয় সিসিলির মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি যুগান্তকারী সময়কে চিহ্নিত করে। ফাতিমিয় শাসনব্যবস্থা, যা ৯ম থেকে ১১তম শতকে আফ্রিকা ও সিসিলিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবনতি ও অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণে ধ্বংসের মুখে পড়ে। ফাতিমিয় শাসন কেবল রাজনৈতিক শক্তি নয়; বরং শিয়া ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হতো, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংহতির প্রতীক ছিল।

সিসিলিতে ফাতিমিয় পতনের পর যে সুন্নি-শিয়া দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল, তা দ্বীপের মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের নিরাপত্তা, সম্পদ এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই শুরু করে। এই দ্বিধা কখনো কখনো স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নিত এবং সামাজিক উত্তেজনার জন্ম দিত। মুসলিমদের মধ্যে এই বিভাজন রাজকীয় নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ ও দ্বীপের শাসনব্যবস্থায় চরম অস্থিরতা তৈরি করেছিল।

ফাতিমিদের পতন ও সুন্নি-শিয়া দ্বন্দ্ব কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, বরং মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়, ধর্মীয় অনুশীলন ও সামাজিক সম্পর্কের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি প্রমাণ করে যে মধ্যযুগীয় সিসিলিতে ধর্মীয় পরিচয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, এবং ফাতিমিদের পতন সেই সংযোগকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল।

মধ্যযুগীয় সিসিলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন এবং বহুভুজীয় শক্তি কেন্দ্রের উদ্ভব একটি সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া ছিল। ফাতিমীয় শাসনের পতনের পর দ্বীপের মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে দুটি মূল শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শিবির ছিল সেই মুসলিমদের, যারা ফাতিমিদের পতনের পরেও স্বচ্ছলভাবে রাজকীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেয়েছিল এবং রাজা ও তার উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ করে নর্মান প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার পথে এগিয়েছিল।

অন্যদিকে, ছিল সেই সম্প্রদায় যারা স্বাধীনতা, স্থানীয় কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক অবস্থান নিয়েছিল।

এই দুই শিবিরের মধ্যে বিরোধ কেবল রাজনৈতিক ছিল না, বরং তা ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রভাবশালী স্থানীয় নেতাদের আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কখনো কখনো দ্বীপের নর্মান প্রশাসনের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। কারণ প্রশাসকরা এই বিভাজনকে ব্যবহার করে স্থানীয় মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারত।

সিসিলির বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে এই বিভাজন বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। রাজধানী ও বৃহৎ শহরগুলোতে মুসলিমরা প্রায়শই নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখত, যেখানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যুতে তারা নর্মানদের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত। তবে গ্রামীণ ও দূরবর্তী অঞ্চলে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করত, যা কখনো কখনো সংঘর্ষ এবং সামরিক উত্তেজনার জন্ম দিত।

মুসলিম সম্প্রদায়ের এই বিভাজন প্রমাণ করে যে মধ্যযুগীয় সিসিলিতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় আলাদা না হয়ে একে অপরের সঙ্গে জড়িত ছিল। সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কেবল একটি সামাজিক বাস্তবতা নয়; বরং দ্বীপের রাজনীতি, প্রশাসন এবং সামরিক সংঘাতের ওপরও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

সিসিলির সমাজে ধর্মান্তরকরণের নানা সূচক পাওয়া যায়। প্রাসাদের খোঁজাদের নামের মধ্যেই এর প্রথম প্রমাণ দেখা যায়। তাদের এমন সব নাম দেওয়া হতো, যা মূলত লাতিন পশ্চিমে প্রচলিত ছিল। এমনকি তাদের আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেও ফ্রাঙ্কিশ প্রভাব লক্ষ করা যেত। তবে এটি সব ধর্মান্তরিত মানুষের অভিজ্ঞতা ছিল না।

অনোমাস্টিক গবেষণায় (নামের ইতিহাস-ভিত্তিক অধ্যয়ন) দেখা যায় যে, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় আত্তীকরণ হচ্ছিল, তখন অনেক আরবি ভাষাভাষী প্রতিবেশী, যারা আগে গ্রিক রীতির খ্রিষ্টান ছিল তারা গ্রিক বা ধর্মীয়ভাবে নিরপেক্ষ আরবি নাম ব্যবহার করতে শুরু করে।

মুসলিম, ধর্মান্তরিত মুসলিম ও আরব খ্রিষ্টানদের পার্থক্য করাটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, “মুহাম্মদ আল-জান্নান” (অর্থাৎ মালি) বা “মুহাম্মদ

আল-আরী” (অর্থাৎ রেশম তাঁতি)-এরা মুসলিম বলে মনে হলেও, বাস্তবে তারা কর্লিওনের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সদস্য ছিল। তবে তারা মুসলিম থেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল কি না, নাকি দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি মিশ্রণের ফলেই এমন নাম বহন করত, তা বলা কঠিন।

বারো শতকজুড়ে নাম পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই সামাজিক প্রবাহের চিত্র স্পষ্ট হয়। অনেক পরিবারকে দুই বা তিন প্রজন্ম ধরে নথিতে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে দেখা যায় আরবি নাম থেকে ধীরে ধীরে গ্রিক নাম গ্রহণ করা হচ্ছে। একে কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ধর্মীয় রূপান্তরের ফল হিসেবে অর্থাৎ মুসলিম থেকে গ্রিক খ্রিষ্টান হওয়া। আবার কেউ কেউ দেখেছেন এটি একটি পরিচয়ের পরিবর্তন-আরব খ্রিষ্টান থেকে ধীরে ধীরে গ্রিক খ্রিষ্টানের দিকে ঝোঁকা। এমনকি আজও কিছু সিসিলিয়ান পদবি আরবি মূল থেকে এসেছে, তবে সেগুলো গ্রিক ভাষার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রচারিত হয়েছে।

তবে নামের পরিবর্তন সব সময় একমুখী ছিল না। কর্লিওনের এক পরিবারে দেখা যায়, পিতার নাম গ্রিক “নিকিফোরস” (অর্থাৎ বিজয়ের বাহক)। কিন্তু তাঁর ছেলেদের নাম রাখা হয়েছিল “আবু গালিব” (অর্থাৎ বিজয়ের পিতা বা বিজয়ী) ও “খিলফা”, যা আরবি। এ ঘটনা দেখায়, নামের ভেতরে কখনো গ্রিক থেকে আরবিতে পরিবর্তনও ঘটেছে। একই অর্থ বহনকারী নাম ব্যবহার করা প্রমাণ করে যে, খ্রিষ্টান সমাজেও দ্বিভাষিকতার অস্তিত্ব টিকে ছিল।

ফ্যালকান্ডাস ও রোমুয়াল্ড তাদের লেখায় দাবি করেছেন, প্রাসাদের খোঁজারা বাইরে থেকে দেখতে খ্রিষ্টানদের মতো ছিল। তবে প্রাসাদের বাইরে সাধারণ মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন অভিন্ন পোশাক ও রীতি খুব বেশি দেখা যেত না। ১১৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দে যখন মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়, তখন ফ্যালকান্ডাস লিখেছেন, অনেক মুসলিম ছদ্মবেশে খ্রিষ্টান সেজে দক্ষিণ সিসিলির নিরাপদ সারাসেন শহরে পালিয়ে গিয়েছিল।

এসব উদাহরণ দেখায় যে সিসিলির সমাজে মুসলিম, ধর্মান্তরিত ও খ্রিষ্টানদের পরিচয় সব সময় স্বচ্ছ ছিল না। বরং তাদের নাম, পোশাক, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক জটিল মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল, যা ধীরে ধীরে দ্বীপের ধর্মীয় ও সামাজিক মানচিত্র বদলে দিয়েছিল।

"By the end of the eleventh century, the once-flourishing Muslim kingdom of Sicily was unravelling, its cities falling into Christian hands, yet the legacy of its learning and culture endured long after the last emir had gone."–John Julius Norwich

বাংলা অনুবাদে: "একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, একসময় সমৃদ্ধ সিসিলির মুসলিম রাজ্য ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, শহরগুলো খ্রিষ্টানদের হাতে চলে গিয়েছিল, তবুও শেষ আমিরের চলে যাওয়ার পরও তার জ্ঞান ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার দীর্ঘদিন টিকে থাকে।"

মুসলিম সমাজের অন্তিম দিনগুলো

মাত্র ৩৬ বছরের যুবক দ্বিতীয় উইলিয়ামের মৃত্যু সিসিলির রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১১৮৯ সালের ১৮ই নভেম্বর কোনো ধরনের উত্তরাধিকারী না রেখে তাঁর মৃত্যু রাজ্যকে এক গভীর সংকটে ফেলে দেয়। এমতাবস্থায় রাজমুকুট যদি দ্বিতীয় রজারের কন্যা কনস্ট্যান্স এবং তাঁর স্বামী জার্মান সম্রাট ষষ্ঠ হেনরির হাতে চলে যায়, তবে সিসিলি ও জার্মান সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য একীকরণ ঘটত। এই আশঙ্কা বিশেষত পালের্মোর পুরোনো অভিজাত পরিবারগুলোর মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছিল।

অন্যদিকে, ট্যানক্রেড–যিনি দ্বিতীয় রজারের অবৈধ নাতি–তিনিও একধরনের বিকল্প শক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। তিনি ১১৬১ সালের সংঘটিত মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার অন্যতম অভিযুক্ত নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন হওয়ায় তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হলেও পরবর্তীকালে তিনি আবারও পুনর্বাসিত হন এবং লেচের কাউন্ট ও রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। অ্যান্ড্রিয়ার

এই স্থাপনাটি ১২শ শতকে নরম্যান শাসনামলে নির্মিত হলেও এর স্থাপত্যে স্পষ্টভাবে আরব-ইসলামি স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে এর তিনটি লাল গম্বুজ মধ্যযুগীয় ইসলামি স্থাপত্যের ধাঁচ অনুসরণ করে তৈরি। সিসিলিতে মুসলিম শাসন (৮২৭১০৯১ খ্রি.) শেষ হওয়ার পরও মুসলিম স্থপতি ও কারিগরদের প্রভাব নরম্যান যুগের স্থাপত্যে বজায় ছিল

কাউন্ট রজারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দমন করে তিনি প্রভাবশালী অবস্থান অর্জন করেন এবং অবশেষে ট্যানক্রেডই ১১৯০ সালের জানুয়ারিতে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

কিন্তু এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই পশ্চিম সিসিলিতে ব্যাপক মুসলিম বিদ্রোহ দেখা দেয়। সমসাময়িক সূত্রগুলোতে এই বিদ্রোহকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও তা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। আনালেস ক্যাসিনেন্সেস শুধু উল্লেখ করেছেন যে, পালের্মোতে খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল; ফলে বহু মানুষ নিহত হওয়ার পর পলায়নরত মুসলিমরা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

এর আগেই ফ্যালক্যান্ডাস তাঁর 'সিসিলিয়ান ট্র্যাজেডি' প্রসঙ্গে পিটারের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে রাজ্যের আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে খ্রিষ্টানদের নির্যাতন ও মুসলিমদের ক্ষোভ রাজ্যকে এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবে। মুসলিমরা হয়তো উপকূলবর্তী দুর্গ দখল করবে অথবা পাহাড়ি অঞ্চলে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলবে। এর ফলে রাজ্যকে একই সাথে জার্মান আক্রমণ ও মুসলিম বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হবে।

মুসলিমদের এই বিদ্রোহকে কেবল সুযোগসন্ধানী প্রতিক্রিয়া বলা যায় না। বরং রাজ্যজুড়ে মুসলিমদের দীর্ঘমেয়াদি অসন্তোষ, জিম্মা ব্যবস্থার ভাঙন, এবং মনরেয়ালের প্রশাসনিক কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এর পেছনে বড় কাজ করেছিল। মুসলিমদের ওপর পুনরাবৃত্ত আক্রমণ তাদের দুর্বলতাকে নগ্ন করে তোলে। ফলে অনেক ধনী পরিবার তাদের সম্পদ বিক্রি করে বিদেশে চলে যায়। বিদ্রোহে অংশ নেওয়া মুসলিম দরিদ্ররা শহর থেকে পাহাড়ি দুর্গে আশ্রয় নেয়, যেখানে অসন্তুষ্ট কৃষক ও গরিব মুসলিমদের সাথে তারা মিলে একাকার যায়।

এই বিদ্রোহের গুরুত্ব ছিল অন্যরকম। এটি কোনো সাময়িক দাঙ্গা বা বাইরের শক্তির প্ররোচনায় গঠিত আন্দোলন ছিল না। বরং প্রথমবারের মতো সিসিলির মুসলিমরা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধে নামে এবং তা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ স্থায়ী হয়নি,

তবুও মুসলিম নেতাদের কূটনৈতিক দক্ষতা ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রাথমিক সমাধান বয়ে আনে।

রাজা ট্যানক্রেসেডের রাজত্বও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ক্ষমতায় আরোহণের মাত্র চার বছর পর তারও মৃত্যু হয় (২০ ফেব্রুয়ারি ১১৯৪)। ফলে সিসিলির রাজনীতিকে আবারও অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়। দুর্ভাগ্যজনক শিশু রাজা তৃতীয় উইলিয়াম মুকুট পান, তবে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁর মা সিবিলের হাতে, যিনি রাজ্প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেন। এদিকে ইউরোপের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডকে অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড আটক করলে তাঁর বিপুল মুক্তিপণ থেকে প্রাপ্ত অর্থে সম্রাট ষষ্ঠ হেনরি শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন। পিসা ও জেনোভার নৌবাহিনীর সহায়তায় সম্রাট হেনরি সিসিলির দিকে অগ্রসর হন এবং ১১৯৪ সালের ডিসেম্বরে তার বাহিনী পালের্মোতে প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরের দিনই ইতালির পূর্বাঞ্চলিয় শহর আনকোনার জেসিতে[৪০] (ইতালিয়ান ভাষায় ইয়েসী) জন্ম নেয় তাঁর পুত্র-ভবিষ্যতের সম্রাট ফ্রেডরিক দ্বিতীয়।

সমসাময়িক সূত্র আনালি জেনোভেসি ইঙ্গিত দেয় যে, এ সময় মুসলিম সৈন্যরা তৃতীয় উইলিয়ামের সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, মুসলিমরা পুরোপুরি খ্রিষ্টান শাসন বা সিসিলীয় রাজকীয় কর্তৃত্ব অস্বীকার করেনি। বরং তাদের ভেতরে মতভেদ ও দ্বিধা ছিল, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের জটিল বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। হেনরির মৃত্যুর (১১৯৭) পূর্ববর্তী সময়ে পশ্চিম সিসিলিতে তুলনামূলক শান্তি বিরাজ করেছিল।

হেনরির পত্নী কনস্ট্যান্স সিসিলিকে জার্মান আধিপত্য থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি অ্যানওয়েলারের শক্তিশালী জার্মান অভিজাত মার্কওয়ার্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখেন। ১১৯৮ সালের নভেম্বরে তার মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর শিশু পুত্র ফ্রেডরিককে পোপ ইনোসেন্ট তৃতীয়ের সুরক্ষার অধীনে রেখে যান। ফলে সিসিলি কার্যত পাপাল কর্তৃত্বাধীন এক রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু শিগগিরই মার্কওয়ার্ড আবার শক্তি সঞ্চয় করে সিসিলিতে প্রবেশ করেন এবং মুসলিমদের সঙ্গে সফল আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম সিসিলির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন।

এ সময় আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পোপ ইনোসেন্টের উদ্যোগ। ক্রুসেডারদের অর্থায়নের জন্য দ্বীপের গির্জাগুলিকে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ বহন

[৪০] এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে উক্ত জেসি (ইয়েসি)-তে আমি কিছু সময় অতিবাহিত করি।

করতে হয়। মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন নিন্দা ও ধর্মীয় প্রচার পরিচালিত হয়, এমনকি মুসলিম ধর্মান্তরিতদের 'ইসলামে প্রত্যাবর্তন' প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচনা করা হয়। ইনোসেন্ট মুসলিমদের সঙ্গে মার্কওয়ার্ডের সমঝোতাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখেন এবং তাঁকে বিদ্রুপ করে 'আরেকজন সালাহউদ্দিন' বলে অভিহিত করেন। এই অবস্থান পোপাল রাজনীতিতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে-যেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধের একই ভাষা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার হতে শুরু করে।

১২০০ সালে মনরিয়েলের যুদ্ধে মার্কওয়ার্ড ও মুসলিমদের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে পোপের সামরিক জোট সাময়িক বিজয় লাভ করলেও, দ্বীপে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়নি। ১২০২ সালে মার্কওয়ার্ডের মৃত্যুতে মুসলিম ও খ্রিষ্টান জোটের অবসান ঘটে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে সংকট থেকেই যায়। গির্জার পাদরি ও আর্চবিশপদের মধ্যে নিয়মিত দ্বন্দ্ব, জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক চাপের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। ১২০৩ সালে পোপ ইনোসেন্ট মনরিয়েলের সন্ন্যাসী এবং পালের্মোতে মার্কওয়ার্ডের উত্তরসূরি উইলিয়াম ক্যাপারোনের সঙ্গে আঁতাত করার অভিযোগ করা হয়।

এই অভিযোগ শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয় সন্ন্যাসীদের অনৈতিক জীবনযাপন, গির্জার সম্পদ অপচয় এবং শৃঙ্খলাহীনতার সমালোচনা একে আরও বিস্তৃত মাত্রা দেয়। ফলত, সিসিলির রাজনৈতিক সংকট শুধু মুসলিম বিদ্রোহ বা রাজকীয় উত্তরাধিকার সংকটে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা গির্জার অভ্যন্তরীণ সংকট, পাপাল নীতি ও ইউরোপীয় রাজনীতির বৃহত্তর গতিশীলতার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের অনৈতিক জীবন নিয়ে কথা বললে আমাদের আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, "সন্ন্যাসী" শব্দটি সাধারণত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবন বেছে নেওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বোঝায়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে তাদের জীবনযাত্রা ও আচরণের বিবরণ ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এরূপ চিত্রায়ণ রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটেও প্রভাবিত ছিল।

মধ্যযুগীয় সময়ে, বিশেষ করে ভারত ও ইসলামিক বিশ্বের কিছু অংশে, সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতো। যদিও ইসলাম সন্ন্যাসী জীবনযাপনকে সম্পূর্ন অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। তবে বিভিন্ন সূত্রে দেখা যায় যে, কখনো কখনো তারা আধ্যাত্মিক চর্চার পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা বিলাসিতার

দিকে ঝুঁকেছিল। এমনও দেখা গেছে যে, তারা জনগণের দানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বিলাসী জীবনযাপন করত, যা তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্বের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করত। অন্যদিকে, কিছু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা ধন-সম্পদে অংশীদার হওয়াকে এদের অনৈতিকতার উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

আধুনিক যুগেও, যদিও অনেক সন্ন্যাসী সত্যিই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করছেন, তথাপি কিছু সমালোচক দেখিয়েছেন যে, অর্থ বা সামাজিক ক্ষমতার জন্য আধ্যাত্মিক স্তরের আড়ালে কৌশল অবলম্বন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মঠ বা আশ্রমে বিলাসী জীবনযাত্রা, প্রাপ্য দানের অপব্যবহার বা সামাজিক নিয়মের প্রতি উদাসীনতা নজর আসে। এর ফলে, ধর্মীয় পবিত্রতার চিত্র মানুষের কাছে কম বিশ্বাসযোগ্য হয়ে পড়ে। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত, সন্ন্যাসীদের অনৈতিক জীবন কখনো কখনো মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকতার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। এটি নির্দেশ করে যে আধ্যাত্মিক পদবি থাকা মানেই সব সময় নৈতিকতার নিশ্চয়তা নয়; বরং মনোভাব, দায়িত্ববোধ এবং আত্মসমালোচনা এককভাবে নৈতিক জীবন নির্ধারণ করে।

আমরা দেখি যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের পাদরি ও পোপদের নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক নতুন কোনো বিষয় নয়। অতীতেও কিছু সন্ন্যাসী বা ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে নৈতিক অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে। মধ্যযুগে সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় আদর্শের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তবে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে, কিছু পাদরি তাদের শপথ ভঙ্গ করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পেলে সমাজে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সময়েও এই বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের পাদরি ও পোপদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ অনেকবার উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালে নিউ অরলিন্স আর্চডায়োসিস ২৩ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, চার্চ কর্তৃপক্ষ শিশুদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দায়ী। এ ছাড়াও, পোপ লিও সম্প্রতি পাদরিদের উদ্দেশে বলেছেন, 'যৌন নির্যাতনের অভিযোগ লুকানো উচিত নয়; বরং তা প্রকাশ্যে আনা দরকার।'

এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, সন্ন্যাসীদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসা নতুন বিষয় নয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত কিছু ধর্মীয় নেতার অনৈতিক কর্মকাণ্ড

সমাজে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। তবে বর্তমান সময়ে চার্চ কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ এবং পোপের সুস্পষ্ট নির্দেশ আশাজাগায় যে ভবিষ্যতে এমন অনৈতিক ঘটনা কমে আসবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা পুনরায় বৃদ্ধি পাবে।

বস্তুত, সন্ন্যাসীদের নৈতিকতা ও জীবনযাত্রা ইতিহাসজুড়ে বিতর্কের বিষয়। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কিছু নেতার অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু বর্তমানের উদ্যোগগুলো দেখাচ্ছে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, বিভিন্ন উত্থান-পতন ও নানাবিধ জটিলতার মাঝে ইবনে আব্বাদের নেতৃত্বে মুসলিম আমিরাতের পুনরুদ্ধারের কাহিনি সিসিলির মুসলিম বিদ্রোহের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। আরবি ভাষায় রচিত কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলিম নেতা মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ যদিও সিসিলির স্থানীয় কোনো বাসিন্দা ছিলেন না, বরং মাহদিয়ার এক আফ্রিকান নেতা, যিনি যৌবনে সিসিলিতে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং একজন স্থানীয় প্রভাবশালীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তবুও তিনি মুসলিমদের বিচারক ও শাসক হিসেবে পরিচিত হন এবং পশ্চিম সিসিলিতে নেতৃত্বের একীকরণ ঘটান।

তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিসিলির এন্টেলা ছিল তাঁর প্রধান ঘাঁটি, আর মুদ্রার ওপর তাঁর নামের উল্লেখে বোঝা যায় যে, তিনি "আমির আল-মুসলিমিন বি-ইকিলিয়া" বা সিসিলির মুসলিমদের সেনাপতি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। যদিও মধ্যযুগীয় আইনে ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রা প্রচলনকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে ধরা হতো (এমনকি বর্তমান সময়েও), কিন্তু এই পদক্ষেপকে একই সাথে মুসলিম নেতৃত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক স্থিতি তৈরির প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।

এদিকে হেনরির মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের শাসনামলে সংঘাত চরমে ওঠে। রাজা তখনও বয়সে তরুণ। ১২২২ সালে তাঁর সেনাবাহিনী ইয়াতো ও ক্যালাত্রাসি দুর্গ অবরোধ করে। পরবর্তী কোনো এক অভিযানে ইবনে আব্বাদ নিহত হন। আল-ওমাওয়ে লিখেছেন যে শান্তি আলোচনার জন্য তাঁকে বাধ্য করা হলে তিনি ফ্রেডরিকের তাঁবুতে প্রবেশ করেন, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ইতালিয়ান সূত্রে উল্লেখ আছে যে তাঁকে পালের্মোতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে আব্বাদের মৃত্যুর পর মুসলিম নেতৃত্ব কায়েদ মারজুকের হাতে চলে যায়। তাঁকে ঘিরে সাম্রাজ্যে নতুন করে বিদ্রোহের জন্ম হয়। এমনকি ফ্রেডরিকের সেনাদের প্রতি প্রতিশোধমূলক হত্যা করার কাহিনিও প্রচলিত হয়। একই সাথে জেনোইসদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্ভাব্য জোটের কথাও উঠে আসে, যা বাণিজ্যিক সুবিধা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আরবি এক বিবরণে আরও বলা হয়েছে যে ইবনে আব্বাদের এক কন্যা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও এই অংশটিকে ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যিক রূপক হিসেবে দেখা হয়, তবু এতে প্রতিফলিত হয় সিসিলির মুসলিম সমাজের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চিত্র।

ইবনে আব্বাদের মৃত্যু শুধু একজন নেতার অবসান নয়; বরং সিসিলিতে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বড় ধরণের ভাঙন নির্দেশ করে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই দ্বীপ থেকে মুসলিমদের নির্বাসন শুরু হয়। এই নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর পরবর্তী ইতিহাস গড়ে ওঠে ইতালির অন্য অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে লুসেরায়, যেখানে তাঁরা নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে।

সামরিক অভিযানের আগে রাজা ফ্রেডরিক একাধিকবার মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা মনরিয়েলের আর্চবিশপের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, যেসকল বাড়িগুলোতে তারা নিবন্ধিত ছিল সেখানে যেন তারা ফিরে যায় এবং দ্বিতীয় উইলিয়ামের দেওয়া বিভিন্ন শর্তগুলো যেন মেনে নেয়। মনে করা হয় যে যদি মুসলিমরা এসব শর্ত মেনে নিত এবং দ্বীপের বাইরের শক্তির সঙ্গে জোটবাঁধা এড়িয়ে যেত, তবে রাজা এবং পোপ উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান এড়ানো সম্ভব হতো। ফলে ফ্রেডরিকের নীতি আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বাস্তবতায় গঠিত হলেও, কেন তিনি শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের উৎখাত করে বিদ্রোহীদের ইতালির মূল ভূখণ্ডে লুসেরায় পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিলেন, তা আমার ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে না।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানের আগে ফ্রেডরিক নতুন আইন প্রণয়ন করেন, যা ছিল চতুর্থ ল্যাটেরান কাউন্সিলের চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। এসব আইনে পতিতাদের শহরের প্রাচীরের বাইরে বসবাসের নিয়ম আরোপ করা হয়, ইহুদিদের আলাদা পোশাক ও দাড়ি রাখতে বাধ্য করা হয়। লুসেরায় মুসলিমদের এমন এক অবস্থানে রাখা হয় যেখানে তারা দাস ছিল না, আবার উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারও পেত না, তবুও রাজকীয় সুরক্ষায় সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসেবে গণ্য হতো। মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা থাকলেও, ধর্মান্তকরণ তাদের প্রতি নীতির মূল লক্ষ্য

ছিল না। নর্মান শাসনামলে জিম্মিপ্রথার মতো যে আর্থিক-ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ফ্রেডরিকের নীতিকে তারই এক পরিবর্তিত রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এভাবে মুসলিমদের অবস্থান রাজকীয় কর্তৃত্বের অধীনে সীমিত অধিকার ও দায়িত্বের কাঠামোয় বাঁধা হয়ে পড়ে। তবে তাদের লুসেরায় স্থানান্তরিত করা কেবল রক্ষণশীল নীতি নয়; বরং মনরিয়েলের গির্জার হাতে প্রদত্ত জমিগুলোকে সরাসরি রাজকীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

একই সময় এক মুসলিম হজ্জযাত্রী যার নাম আহমদ ইবনে আবেল-কাসিম আল-রুমানি, সিসিলি থেকে পালিয়ে আল-কামিলের কাছে খবর পৌঁছে জানান যে সিসিলির প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার মুসলিমকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে, তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং ইতালির মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তর করা হয়ে।

যারা পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পাহাড় ও গ্রামীন এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এর অর্ধেককেই হত্যা করা হয়েছে, পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রামগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কেবল সিনিসি, ইয়াতো ও এন্টেলা দুর্গগুলো অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আইউবীয় সুলতান আল মালিকের পক্ষ হতে প্রতিকারস্বরূপ সিসিলিয়ার মুসলিমদের জন্য করনীয় হিসেবে কিছুই ছিল না।

একই সময়ে মাল্টায় মুসলিম অধ্যায়ের সমাপ্তিও ধীরে ধীরে ঘটে যা শেষ পর্যন্ত লুচেরায় নির্বাসন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়। সেলানো বিদ্রোহীদের একাংশকে সম্ভবত মাল্টায় পুনর্বাসিত করা হয়েছিল, যা দ্বীপটির ক্রমবর্ধমান ল্যাটিনকরণ ও খ্রিষ্টানিকরণের ধারাকে ত্বরান্বিত করে। ১১৫৬ সালে বিশপরিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা প্রথমদিকে ছিল নিস্তেজ, তবে সময়ের সাথে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নর্মান দখলের সময় ও পরবর্তীতে কাউন্ট রজার দ্বিতীয়-এর শাসনে মাল্টার মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মাল্টায় খ্রিষ্টানীকরণ আংশিক ও সীমিত ছিল। রাজা ট্যানক্রেড একসময় মাল্টাকে রাজকীয় কর্তৃত্ব থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কনস্ট্যান্স পুনরায় দ্বীপটিকে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ঘোষণা দেন যে মাল্টা ও গোজোর প্রজারা চিরকাল রাজসত্তার অংশ হয়ে থাকবে। এর সাথে তিনি দ্বিতীয় রজারের সময় মুসলিম হত্যার দায়ে মাল্টিজ খ্রিষ্টানদের ওপর আরোপিত বার্ষিক জরিমানা বাতিল করেন, যা মুসলিমদের জন্য এক প্রতীকী বার্তা ছিল তাদের সুরক্ষা এখন আর আগের মতো নেই।

রাজা কনস্ট্যান্সের এই নীতি দ্বীপের ল্যাটিন খ্রিষ্টধর্মের প্রতি প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করে এবং ১২২৪ সালে ফ্রেডরিক প্রথমবার মুসলিমদের লুসেরায় নির্বাসিত করলে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও মুসলিমরা শাসকদের প্রতি অনুগত ছিল, তবুও এই নির্বাসন কার্যকর করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরও নির্বাসন হয়েছিল কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন যে ১২৪৫ সালের পরও মুসলিমদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আরেকটি বিবরণে বলা হয়, প্রায় ১২৪১ সালের দিকে মাল্টা ও গোজোয় মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের অনুপাত ছিল প্রায় তিনে দুই। ফ্রেডরিক মুসলিমদের ওপর দ্বিগুণ করের বোঝা চাপান-তাদের জিজিয়া ছাড়াও উৎপাদনের ওপর কর দিতে হতো, যেখানে খ্রিষ্টানরা এ বোঝা থেকে মুক্ত ছিল।

তবুও দ্বীপে খ্রিষ্টানিকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। মাল্টার মুসলিমদের ইতিহাস সিসিলির মুসলিম অধ্যায়ের সমান্তরাল হলেও ভিন্নতায় পূর্ণ। ধারণা করা হয়, বৈষম্যমূলক করের বোঝা এড়াতে অনেক মুসলিম ফ্রেডরিকের সময় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এভাবে গড়ে ওঠা খ্রিষ্টান জনসংখ্যা আরবিভাষীই থেকে যায় এবং তাদের ভাষাগত ঐতিহ্য বহুদিন স্থায়ী হয়। সিসিলিতে আরবি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হলেও মাল্টায় আরবিভাষী খ্রিষ্টানরা দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে এবং আধুনিক মাল্টিজ ভাষা মাগরিবি আরবি ও রোমান্স প্রভাবের সংমিশ্রণ হিসেবে বিকশিত হয়। সুতরাং মাল্টা ও সিসিলির ধর্মীয় ও ভাষাগত গতিশীলতা একে অপরের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। এটি সিসিলির মাজারা থেকে ১০৭ কিলোমিটার এবং তিউনিসিয়ার ক্যাপ বন উপদ্বীপ থেকে মাত্র ৭১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্বীপটি ১৪শ শতক পর্যন্ত এক মুসলিম সম্প্রদায় ধরে রাখে, যদিও তখন আরবিভাষীদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। আজও দ্বীপের স্থলনাম ও প্যান্টেস্কো উপভাষায় আরবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

১২৪৩ সালের জুলাই মাসে আনালেস সিকুলি জানায় যে, সিসিলির মুসলিমরা বিদ্রোহ করে পাহাড়ে আশ্রয় নেয় এবং ইয়াতো ও এন্টেলা দুর্গ দখল করে। ফ্রেডরিকের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত। তাঁর শাসনকালে রাজনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল পোপতন্ত্র, গুয়েলফ-গিবেলিন দ্বন্দ্ব, জার্মান অভিজাতদের প্রতিরোধ, লোম্বার্ড শহরগুলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং ইতালির মূল ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এই জটিল প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের বিদ্রোহ সম্রাটের জন্য নতুন সমস্যার জন্ম দেয়।

লুসেরা ধীরে ধীরে একটি সুসংগঠিত মুসলিম উপনিবেশে পরিণত হয়। ১২৩৯-৪০ সালে ফ্রেডরিক লুসেরার মুসলিমদের জমির সাথে আবদ্ধ রাখতে এক হাজার গবাদি পশুর প্রস্তাব দেন, যেন এটি রাজা উইলিয়ামের আমলের মতো কর-ভিত্তিক একধরনের রাজকীয় খামারে রূপ নেয়। তিনি মুসলিমদের স্বাধীন চলাচল সীমিত করার চেষ্টা করলেও গ্রমীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে আগ্রহী ছিলেন, আর এই প্রক্রিয়ায় লুসেরা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সেখানে মুসলিমরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিল, যেমন: পশুপালন, চাষাবাদ, কসাই, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, কাঠের কাজ, তাঁত, পাথর কাটা, ফলের চাষ, মধু সংগ্রহ, বেকারি, এমনকি শিকার ও বাজপাখি পালনের মতো কাজেও নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়া সংগীতজ্ঞ, নোটারি, প্রহরী, সৈনিক ও কর্মকর্তা হিসেবেও মুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

যদিও পশ্চিম সিসিলিতে রেশম উৎপাদন ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, লুসেরায় তা তেমন দেখা যায়নি। বরং সেখানে উট ও চিতাবাঘ পালনের মতো অস্বাভাবিক কার্যকলাপও ছিল, যা পশ্চিম সিসিলিতে পাওয়া যেত না। এসব থেকে বোঝা যায়, লুসেরা শুধু কৃষিকাজেই নয়; বরং এক বহুমুখী অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এখানকার কিছু ধনী মুসলিমকে রাজকোষে ঋণদাতা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছিল, যেমন নেপলসের রাজা দ্বিতীয় চার্লস নগদ সংকট মোকাবিলায় লুসেরান মুসলিমদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছিলেন।

তবে লুসেরার প্রকৃত গুরুত্ব ছিল সামরিক ক্ষেত্রে। এখানকার মুসলিমরা দক্ষ অশ্বারোহী, তিরন্দাজ এবং অস্ত্র নির্মাতা হিসেবে পরিচিত ছিল। ধনুক, তির ও ঢাল তৈরির দক্ষতার জন্য লুসেরা ছিল একধরনের সামরিক কর্মশালা, যেখানে উৎপাদিত অস্ত্র ফ্রেডরিকের সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াত। এই কারণেই ১২৪০-এর দশকে লুসেরায় একটি দুর্গ ও অস্ত্রাগার নির্মিত হয়, যা শুধু প্রতিরক্ষা কেন্দ্রই নয়, ফ্রেডরিকের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক আস্থা ও মুসলিমদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক হয়ে ওঠে।

লুসেরার সামরিক বাহিনী ছিল খ্রিষ্টান শাসকদের অধীনস্থ, তবে সম্প্রদায়ের ভেতরে তারা মর্যাদা, দায়িত্ব ও সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি গঠন করেছিল। মুসলিমদের অনেক পরিবার জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি পেত, কারণ তাদের সেনা-সেবার অবদান ছিল অপরিসীম। অস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, ১২৮২ সালে সিসিলিয়ান ভেস্পার্স বিদ্রোহের সূচনালগ্নে লুসেরা থেকে প্রায় ষাট হাজার তির সরবরাহ করা হয়েছিল।

পশ্চিম সিসিলির গ্রামীণ অঞ্চল একসময় ছিল সমৃদ্ধ কৃষি সংস্কৃতির কেন্দ্র। তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সেখানে গড়ে উঠেছিল এক জটিল, বৈচিত্র্যময় ও নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা, যা আশেপাশের বৃহৎ জনসংখ্যা এবং নগরবাজারকে পুষ্ট করত। সেচব্যবস্থার মতো উন্নত অবকাঠামো বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়, বাজার ও সরবরাহের বিচ্ছিন্নতা, অতিরিক্ত কর, বহিঃশত্রুর হুমকি এবং সবচেয়ে বড় পরিবর্তন জনসংখ্যার নাটকীয় স্থানান্তর এসবের ফলে এই ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। মুসলিম বিদ্রোহ এবং তাদের লুসেরায় নির্বাসনের পর পশ্চিম সিসিলি তীব্র অবনতির পথে যায়। একসময়ের বহুমুখী কৃষি উৎপাদন সংকুচিত হয়ে সীমিতসংখ্যক খ্রিষ্টান ভাড়াটে কৃষকের হাতে শস্য উৎপাদনের একক চাষে পরিণত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও খননে দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যার পতন ও মুসলিমদের উচ্ছেদের পর অঞ্চলটির বস্তুগত সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১২৮২ থেকে ১৩০২ সালের সিসিলিয়ান ভেস্পার্স যুদ্ধ এবং ১৩৪৭ সালে ব্ল্যাক ডেথের ধ্বংসযজ্ঞ[৪১] এই পতনকে আরও গভীর করে তোলে। জনসংখ্যার এই

---

[৪১] **সিসিলিয়ান ভেস্পার্স যুদ্ধ (১২৮২-১৩০২):** ১৩শ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসে সিসিলিয়ান ভেস্পার্স যুদ্ধ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১২৮২ সালের মার্চ মাসে সিসিলির রাজধানী পালেরমোতে এক বিদ্রোহ শুরু হয়, যা ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজকে দীর্ঘ দুই দশক অস্থির করে তোলে। স্থানীয় সিসিলিয়ানরা তখনকার ফরাসি শাসক আনজু রাজবংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে তারা বিদেশি শাসনের কর আরোপ, নিপীড়ন এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সিসিলিয়ানদের এই আকস্মিক বিদ্রোহ ইতিহাসে "ভেস্পার্স" নামে পরিচিত, কারণ এটি শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার প্রার্থনার ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠার সময়।

এই বিদ্রোহ দ্রুত সিসিলির অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আনজু রাজবংশের সৈন্যদের হত্যা করা হয় এবং ফরাসি প্রভাব কার্যত ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এ বিদ্রোহ কেবল স্থানীয় প্রতিরোধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের জন্ম দেয়। আনজু রাজবংশ ফ্রান্সের সমর্থন পেয়েছিল, অপরদিকে সিসিলিয়ান বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়ায় আরাগনের রাজ্য। ফলে এ যুদ্ধ রূপ নেয় এক আন্তর্জাতিক সংঘাতে।

১২৮২ থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র কেবল সিসিলি নয়, ইতালির অন্যান্য অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় সাগর এবং এমনকি গ্রিস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ১৩০২ সালের ক্যাল্টাবেল্লোটা চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটে। চুক্তির ফলে সিসিলি আনুষ্ঠানিকভাবে আরাগনের নিয়ন্ত্রণে আসে, যদিও নামমাত্র আনজু রাজবংশের দাবিও বজায় ছিল। এ যুদ্ধ সিসিলির স্বাধীন রাজনৈতিক সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং একই সাথে ইউরোপীয় শক্তির ভারসাম্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সিসিলিয়ান ভেস্পার্স বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল, স্থানীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ কখনো কখনো ইউরোপের পরাশক্তিদেরও নতজানু করতে পারে।

ব্ল্যাক ডেথের ধ্বংসযজ্ঞ (১৩৪৭): ১৩৪৭ সালে ইউরোপে এক ভয়ংকর মহামারি প্রবেশ করে, যা ইতিহাসে ব্ল্যাক ডেথ বা প্লেগ নামে পরিচিত। সিসিলির মেসিনা বন্দরে প্রথম এ রোগ প্রবেশ করে, যা দ্রুতই গোটা

সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দ্বীপ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থেকেও আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত আগের সংখ্যায় ফিরতে পারেনি।

এতদ্‌অঞ্চলের সিরামিক শিল্পের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে সিসিলির তৈরি মৃৎপাত্র উত্তর আফ্রিকার সাইরেনাইকা অঞ্চলে রপ্তানি হতো। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই বাণিজ্য হ্রাস পেতে শুরু করে। আফ্রিকার সিরামিক শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিসিলি নিজস্ব উৎপাদনেও পিছিয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম সিসিলির রক্ষণশীল উৎপাদনের বিপরীতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল উত্তর ইতালির লিগুরিয়ান শৈলীর প্রভাব গ্রহণ করে। ১৩০০ সালের পর থেকে মুসলিম কুম্ভকারদের ঐতিহ্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা আরব-ইসলামি সংস্কৃতির দ্রুত বিলুপ্তির প্রতিফলন।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সেজেস্তা অঞ্চলের এক বসতি থেকে মুদ্রা, পাত্রের টুকরো ও কাচপাত্র উদ্ধার করা হয়। এগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ১১০০ সালের শুরুতে সেখানে একটি গ্রামীণ মুসলিম গ্রাম গড়ে উঠেছিল। প্রার্থনার কুলুঙ্গি বা মিহরাবসহ একটি আয়তাকার মসজিদও সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সিসিলিতে বিরল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে এক ল্যাটিন প্রভুর উপস্থিতি দেখা যায়, যিনি একটি দুর্গ ও একটি গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা হয়, গ্রামবাসীদের খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল। তবে প্রত্নপ্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে এই কৌশল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এবং গ্রামটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছিল।

ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এ মহামারি ইউরোপের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে গ্রাস করে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এ মহামারিতে গভীরভাবে বিপর্যস্ত হয়।

ব্ল্যাক ডেথ মূলত ইঁদুরের দেহে থাকা পিস থেকে ছড়িয়ে পড়ত, তবে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তখন একে ঈশ্বরের শাস্তি বলে মনে করত। শহরের ভেতরে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করত। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্যুর হার এতটাই বেশি ছিল যে, গোটা গ্রাম ও শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। সিসিলি এবং ইতালির অন্যান্য অংশেও এই ধ্বংসযজ্ঞ ছিল ভয়াবহ।

এ মহামারি কেবল জনসংখ্যার ধ্বংস ডেকে আনেনি, এর সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনও ঘটে। শ্রমশক্তির অভাব তৈরি হয়েছিল, যার ফলে কৃষি ও উৎপাদনে সংকট দেখা দেয়। একই সাথে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে যায়, যা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়। চার্চের প্রতি মানুষের আস্থাও কমতে শুরু করে, কারণ প্রার্থনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও এ ভয়াবহ মৃত্যু থামাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্ল্যাক ডেথ ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক অমোচনীয় দাগ রেখে গেছে। এটি শুধু মানুষ হত্যা করেনি, বরং মানুষের চিন্তাভাবনা, সমাজব্যবস্থা এবং ক্ষমতার কাঠামোতেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৩৪৭ সালের সেই বিপর্যয় মধ্যযুগীয় ইউরোপকে চিরতরে পাল্টে দেয়।

ইতালিয়ান ইতিহাসবিদরা ফ্রেডেরিক দ্বিতীয়কে প্রায়ই "রেনেসাঁর পূর্বাভাসবাহী শাসক" বলে অভিহিত করেন, কারণ তার চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও সাংস্কৃতিক উদারতা মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিরল ছিল। তার শাসনকালের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ফ্রেডেরিক শুধু রাজনীতির নায়ক নন, তিনি ছিলেন জ্ঞানচর্চারও এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠপোষক, যিনি ইসলামি বিদ্যা, দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর মেলবন্ধন গড়ে তোলেন।

ফ্রেডেরিক দ্বিতীয় আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং ইসলামি সভ্যতার জ্ঞানভান্ডারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার রাজসভায় মুসলিম চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক ও অনুবাদকরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতেন। রাজদরবারে আরবি থেকে লাতিন ভাষায় অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন হয়, যা পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চা ও চিন্তাজগতের পুনর্জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করে। এই অনুবাদ আন্দোলনই পরোক্ষভাবে রেনেসাঁ যুগের বৌদ্ধিক বিকাশকে সম্ভব করে তোলে।

স্থাপত্যেও ফ্রেডেরিক ইসলামি ঐতিহ্যের ছোঁয়া রেখেছিলেন। পালেরমো ও লুচেরার দুর্গসমূহ তার শাসনামলে মুসলিম স্থপতিদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। এসব স্থাপত্যে দেখা যায় জ্যামিতিক নকশা, খিলান, বৃত্তাকার টাওয়ার এবং অলংকরণের এমন সমন্বয়, যা ইসলামি ও ইউরোপীয় রীতির মিলন ঘটায়। ফলে সিসিলির দুর্গগুলো কেবল সামরিক স্থাপনা নয়; বরং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের প্রতীক হয়ে ওঠে।

তবে ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর এই উদার ও সহিষ্ণু নীতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। তার উত্তরসূরিদের সময়ে মুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা কমে যায়, লুচেরার মুসলিম সম্প্রদায়ও শেষপর্যন্ত জোরপূর্বক বিতাড়িত হয়। তবুও ফ্রেডেরিক দ্বিতীয়ের যুগ ইউরোপীয় ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় যেখানে রাজনীতি, জ্ঞান ও সংস্কৃতি ইসলামি প্রভাবের সঙ্গে মিলে এক নতুন মানবিক দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

মূলত ১১৩৯ সালের পর সিসিলিয়ায় যে নর্মান রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কাল, রজারের মৃত্যু (১১৫৪ সাল) আগপর্যন্ত, নর্মান সিসিলিয়ার স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে রজার আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তার নির্দেশে তৈরি হয় একটি সংকলন, যা 'অ্যাসাইজেস' নামে পরিচিত। এটি মূলত রাজ্য পরিচালনার জন্য নিয়ম ও আইনগুলো একত্রিত করে তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন হলো কীভাবে তিনি মধ্যযুগের সেই উত্তাল সময়গুলোতে এত দক্ষতা অর্জন করলেন। এ বিষয়ে জানার জন্য আমার পরিচিত এক ইতালিয়ান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি। তিনি জানান যে, 'ফ্রেডেরিক দ্বিতীয় পালেরমো শহরে বেড়ে উঠেছিলেন যে সময়ে শহরটি ছিল বহু সাংস্কৃতিক, প্রাণবন্ত বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ১১শ শতকের শেষভাগে নর্মানরা যখন সিসিলি ও ইতালির দক্ষিণাঞ্চল দখল করে, তখনও আপুলিয়া, সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বাইজান্টাইন গ্রিক জনগোষ্ঠী বাস করত। নর্মান শাসকরা প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আরব ও ফরাসি নর্মান কর্মকর্তাদের মিশ্রণে এবং ফ্রেডেরিক যখন শিশুকালে পালেরমো-সিসিলির রাজধানী-এ আগমন করেন, তখনও সেই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

ফলে ফ্রেডেরিকের শৈশব কেটেছিল এমন এক সমাজে, যেখানে নর্মান ফরাসি, আরবি ও গ্রিক ভাষা সমানভাবে প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে রাজপ্রাসাদ ও নগরজীবনে। ঐতিহাসিক সূত্রগুলোতে তাকে এক উজ্জ্বল ও কৌতূহলী শিশুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি আরবি ও গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন। তিনি নিজে এই ভাষাগুলোর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত হন, যেন পালেরমো শহরে ১২শ শতকের শেষভাগে প্রচলিত আরবি ও গ্রিক গ্রন্থগুলো সরাসরি পড়তে পারেন। এভাবেই ফ্রেডেরিক দ্বিতীয় ধীরে ধীরে এই তিন ভাষার অন্তত মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।'

দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলি দ্বীপপুঞ্জে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। লুসেরায় ফ্রেডরিকের পুত্র ম্যানফ্রেড দ্রুত জনগণের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং মুসলিমদের একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক খেলায় জড়িয়ে পড়েন। ১২৫৫ সালে আলেকজান্ডার চতুর্থ পোপ ম্যানফ্রেড ও মুসলিমদের এই জোটকে নিন্দা করে এবং ইংরেজ রাজা তৃতীয় হেনরির পুত্র এডমন্ডকে সিসিলিয়ার রাজার মুকুদ প্রদান করেন। তবে ১২৫৮ সালের মধ্যে ইংরেজরা তাদের ভূমধ্যসাগরীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সরে এসে ম্যানফ্রেডকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নতুন পোপ চতুর্থ আরবান ফ্রান্স ও উত্তর ইতালিয়ায় ম্যানফ্রেড এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে আনজু-এর প্রথম চার্লসকে সমর্থন দেন। ১২৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেনেভেন্টোর যুদ্ধে চার্লস ম্যানফ্রেড ও তার মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করেন। বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে লুসেরা আত্মসমর্পণ করে, যার কিছু বাসিন্দা উত্তরে আবরুজো পাহাড়ে পালিয়ে যায়।

কনরাডিন যিনি ম্যানফ্রেডের সৎভাই, সিসিলিতে বৈধ দাবিতে মুকুট গ্রহণের জন্য আসে। ১২৬৮ সালে লুসেরাতে অ্যাঞ্জেভিন্সের বিরুদ্ধে খাদ্য ঘাটতি ও বিদ্রোহের মধ্যে লুসেরার জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুসলিম বিদ্রোহ ও লুসেরার উপনিবেশের এই প্রতিরোধে স্টাউফেন ও মুসলিমদের জোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা বাইবারের বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত বৃহত্তর মুসলিম জোটের ভয় দ্বারা জটিল হয়ে উঠেছিল।

১২৬৮ সালের আগস্টে কনরাডিনের পরাজয় ও মৃত্যুর পরও লুসেরার মুসলিমরা আত্মসমর্পণ করেনি। মুসলিমদের এ দৃঢ় অবস্থান তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধের প্রতিফলন ছিল। কিন্তু পরের বছর শহরটি বড় অবরোধের সম্মুখীন হয়। আশেপাশের অঞ্চলও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ অবরোধের শেষে মুসলিমরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আত্মসমর্পণের পর চার্লস তাদের ওপর আরোপিত কর থেকে যুদ্ধ ব্যয়ের কিছু অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। তবে একই সাথে পূর্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করার শর্তে। এই ঘটনায় চার্লসের নীতিতে ধর্মীয় উদ্বেগ ও অর্থনৈতিক স্বার্থের একটি সুস্পষ্ট সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। একদিকে বিদ্রোহ তাকে উপনিবেশ ভেঙে দেওয়ার যথার্থতা প্রদান করেছিল, অন্যদিকে কর আরোপ ও আনুগত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি উপনিবেশের অর্থনৈতিক সুবিধা বজায় রাখেন। লুসেরার জীবন তাই পূর্বের মতোই থেকে যায়-ভারী করের বোঝা, সামরিক দুর্গের কৌশলগত গুরুত্ব এবং আনুগত্যের শর্তে টিকে থাকা এক জটিল বাস্তবতা। বিদ্রোহের এক দশকের মধ্যে দুর্গের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে খ্রিষ্টান কাস্তেলান ও সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যা ইঙ্গিত দেয় যে আর কোনো মুসলিম বিদ্রোহ প্রত্যাশিত ছিল না। খ্রিষ্টান বসতি স্থাপনকারীরা, প্রধানত প্রোভেন্স থেকে, দেয়ালের মধ্যে নিরাপদ সীমানায় বসবাস করত। তবে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বস্তিকর ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। ১২৯৬ সালের শেষে লুসেরার বিশপও দরিদ্র পরিস্থিতিতে বসবাস করছিলেন।

লুসেরার মুসলিম উপনিবেশের ইতিহাস মধ্যযুগীয় ইতালির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। দ্বিতীয় ফ্রেডরিক মুসলিমদের এখানে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাদের সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমকে সংগঠিত করেছিলেন। লুসেরা একটি শক্তিশালী নগরীতে পরিণত হয়, যেখানে মুসলিমরা ছিল রাজস্ব ও উৎপাদনের প্রধান ভিত্তি। তারা কৃষিকাজ, পশুপালন, হস্তশিল্প ও অস্ত্র নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা

পালন করেছিল। পাশাপাশি, লুসেরার দুর্গ ছিল কেবল সামরিক শক্তির প্রতীক নয়; বরং মুসলিম ও খ্রিষ্টান ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বাস্তব প্রমাণ।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হতে থাকে। ফ্রেডরিকের মৃত্যুর পর মুসলিমরা ম্যানফ্রেডের পাশে দাঁড়ায় এবং পোপের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের জড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তোলে। কনরাডিনের পতনের পরও মুসলিমরা আত্মসমর্পণ না করে লড়াই চালিয়ে যায়, যা লুসেরাকে একাধিকবার বড় অবরোধের মুখে ফেলে। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করলেও চার্লস তাদের ওপর ভারী কর চাপিয়ে দেয় এবং তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলেও আনুগত্যের বিনিময়ে এই অবস্থান ছিল ভঙ্গুর। এখানে স্পষ্ট হয় যে ধর্মীয় আদর্শের আড়ালে মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থই অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

অ্যাঞ্জেভিন্সদের শাসনামলে লুসেরা সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও সুসংহত হয়। দুর্গ, পরিখা, জলাধার ও প্রাচীর নির্মাণ মুসলিমদের শ্রম ও অর্থ দিয়ে সম্পন্ন হয় এবং শহরটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু একই সঙ্গে এর জনগণের ওপর করের বোঝা এবং অর্থনৈতিক শোষণ বাড়তে থাকে। যদিও লুসেরা রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক লাভজনক কেন্দ্র ছিল, রাজনৈতিক বাস্তবতার চাপে এই সমৃদ্ধ উপনিবেশ বারবার বিদ্রোহ ও দমননীতির মধ্যে পড়ে। মুসলিমরা সামরিক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও ক্রমে তাদের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

১৩০০ সালে দ্বিতীয় চার্লস লুসেরার ধ্বংস সাধন করেন। এই ধ্বংস কোনো একক কারণে ঘটেনি, বরং ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য একসাথে কার্যকর হয়েছিল। উপনিবেশকে দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখার সুবিধার তুলনায় স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক সংকট ও আর্থিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ফলে একসময়ের সমৃদ্ধ নগরী ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর পতন আশেপাশের অঞ্চলগুলিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সিসিলিয়ান ভেস্পার্স যুদ্ধের ব্যয়ের কারণে সৃষ্ট নগদ সংকট মোকাবিলার জন্য লুসেরার ধ্বংস ও এর জনগণের সম্পদের ব্যবহার ছিল একটি বাস্তব রাজনৈতিক কৌশল।

১৩০২ সালে দ্বিতীয় চার্লসের সাথে মুসলিমদের সন্ধি শুধু একটি যুদ্ধের ইতি টানেনি, বরং মুসলিমদের ইতিহাসে এক অমোচনীয় অধ্যায় খুলে দিয়েছিল। লুসেরার মুসলিমরা, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভূমিতে সংস্কৃতি, বাণিজ্য,

স্থাপত্য ও জ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়েছিল, তারা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেখল তাদের অস্তিত্বের অবসান। যুদ্ধ শেষে যে শান্তি এলো তা ছিল না মুক্তির, বরং ধীরে ধীরে নিভে যাওয়া এক দীপ্ত সভ্যতার দীর্ঘশ্বাস। সমৃদ্ধ নগর, ভরপুর বাজার আর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আজানের ধ্বনি একে একে নীরবতায় রূপ নিল, যেন ইতিহাস নিজেই শোক পালন করছে। সিসিলির মুসলিমদের এই পতন কেবল আঞ্চলিক রাজনীতির ফল ছিল না, এটি ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শক্তির একটি ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ, যা মুসলিম উপস্থিতিকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

এই দৃশ্যপট এক অদ্ভুতভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় মুসলিম স্পেনের শেষ অধ্যায়কে। সিসিলির পতনের প্রায় দুই শতক পর, ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে আল-আন্দালুসের আভিজাত্যপূর্ণ অধ্যায়ও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিমদের স্পেনে রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির যে গৌরব ছিল, তা ক্রমে ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত হয়। গ্রানাডার প্রাসাদ আলহাম্ব্রার (আল হামরার বিকৃত সংকলন) দেয়াল যেন সেই শেষ দিনের সাক্ষী, যখন শেষ নাসরিদ আমির আবু আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল) স্পেন ত্যাগ করে গিয়েছিলেন চোখে অশ্রু নিয়ে, আর তার মা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: “যে রাজ্যকে তুমি রক্ষা করতে পারনি, তার জন্য এখন নারীর মতো কাঁদছো।”

সিসিলি ও স্পেন-দুটি ভূখণ্ড, দুটি সময়, অথচ ইতিহাসের মর্মান্তিক মিলনবিন্দু। সিসিলির মুসলিমরা ১৩০২ সালে যে চুক্তির মধ্য দিয়ে পতনের পথে পা বাড়িয়েছিল, তা যেন ছিল স্পেনের গ্রানাডার জন্য এক অগ্রদূত। এটি কি কেবল একটি কাকতালীয় ধারাবাহিকতা, নাকি ইতিহাসের পূর্বনির্ধারিত নিয়তি সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। তবে নিশ্চিত একটি বিষয় হলো, এই দুটি পরিণতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কীভাবে একসময় জ্ঞানে, শিল্পে ও সভ্যতায় উজ্জ্বল মুসলিম সমাজ ক্রমে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সামরিক পরাজয়ের বোঝা বয়ে নিয়ে ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে গেল।

সিসিলির আকাশে নিস্তব্ধ সূর্যাস্তের মতো যে দিনটি এসেছিল, গ্রানাডার পাহাড়ি দিগন্তেও সেই দিনটির প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের পতন শুধু ভৌগোলিক সীমান্তের সংকোচন ছিল না, বরং এক সভ্যতার হৃদয়বিদারক বিলুপ্তি। আজও সেই স্মৃতি রয়ে গেছে ধ্বংসস্তূপ, নীরব নগরী ও ইতিহাসের অশ্রুসিক্ত পাতায়-যেখানে লেখা আছে একটি মহৎ সভ্যতার করুণ পরিণতি।

শেষ দিনগুলোতে সিসিলিয়ার লুসেরার মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্য অপ্রতিরোধ্য তীব্রতা ও দ্রুত পরিবর্তনের দিগন্তে ধূসর হয়ে যায়। শহরটি যখন অবরোধের কড়া জালে আবদ্ধ ছিল, তখন সমগ্র সামাজিক জীবন নিষ্ক্রিয়তা ও অনিশ্চয়তায় ভরে ওঠে; খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ ও রোগব্যাধি এসব একেকটি ধাক্কা হিসেবে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছায়। রাতের অন্ধকারে দেয়ালের ওপর দাঁড়ানো রক্ষীরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, বাজার-ঘাট শূন্য হয়ে আসে, মসজিদের গম্বুজে আর তিলাওয়াতের সুর কমতে থাকে; মানুষের মুখে একরাশি হতাশা ও হতভম্ব আশা লুকানো থাকে। কেবল সৈন্যের লাঠি বা দফতরের কাগজই না; প্রতিরোধের শেষ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের জীবিকার ওপর।

শহরের আত্মসমর্পণের পর বহু পরিবার অবিলম্বে বন্দিত্বের নোটে পড়ে; অনেককে বন্দি করে তোলা হয় এবং জেল-ও-বাজারে বিক্রি করা হয়। যে লোকরা সৈনিক বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল, তাদের কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক পটভূমি যাচাই করে আলাদা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছিল কিছু ক্ষেত্রে তাদের ওপর জরিমানা চাপানো হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষে জমা করা হয়। তাদের অনেকে আবার জেলে বন্দি থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিক্রি করা হয়; কখনো তাদের স্ত্রী-শিশুকে আলাদা করে গ্রাস করা হয়, ফলে পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

যাদের দৃঢ়তা বেশি, তারা পালাবার পথ খোঁজে। স্থানের কাছাকাছি পাহাড়ি দুর্গগুলোতে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া সাধারণ কিছু পরিবার ছিল, কিছু পরিবার পাহাড়ে ছুটে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আশ্রয় নেয়, কিছু সমুদ্র-তীরবর্তী পরিবারের লোক সমুদ্রে নেমে জাহাজে উঠে সমুদ্রপথে পালানোর চেষ্টা করে। পালানোর সময় তাদের প্রধান গন্তব্য ছিল উত্তর আফ্রিকা-তিউনিশিয়া ও আলজেরিয়ার বন্দরগুলো যেখানে তারা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা চেষ্টা করত। তবে সমুদ্রপথ সব সময় নিরাপদ ছিল না; কোনো কোনো জাহাজ চুরি বা জলদস্যুদের হাতে পড়ে কিংবা লস্কর-নিয়ন্ত্রিত অংশে আটকে যায়। বিরুপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক ঝড়ের স্বীকার হয়ে অসংখ্য মুসলিম পরিবারবাহী জাহাজ ও নৌকার সমুদ্রে সলিল সমাধি হয়। সেই সংখ্যাটা কেমন, তা আজও ইতিহাসের অজানা। আর যাঁরা তৎক্ষণাৎ না পালাতে পেরেছিলেন, তাদের অনেককেই পরবর্তীতে বিচার ও দণ্ডাভিযান করে, বা জোর করে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দলে গৃহীত করানো হয়।

অধিকাংশ মুসলিম পরিবার তাদের অর্থ ও সহায়-সম্পদ দ্রুত হারায়। জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়; ঘর-বাড়ি, পশুপালন, মেশিন প্রস্তুতশালার সরঞ্জাম সবকিছু স্থানীয় শাসকদের হাতে ধরা পড়ে। যে সম্পদটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা প্রণীত শর্তে

আংশিকভাবে রাখার সুযোগ থাকলেও সাধারণত তা দীর্ঘস্থায়ী নয়; অনেক ক্ষেত্রে নতুন নবাবি বন্দোবস্তে জমি পুনর্বণ্টিত হয়ে যায়। নগদ সম্পদ বা সোনা-যেটা বিভিন্নভাবে গোপন করে রাখা হতো তাও জব্দ করা হতো বা কুচক্রী মহলের মাধ্যমে স্থানীয় অভিজাতদের মাঝে পুনর্বিতরণ করা হয়। মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ধ্বংস বা চার্চে রূপান্তরিত করা হয়; তাতে শুধু ধর্মীয় কেন্দ্রই নষ্ট হয়নি, স্থানীয় সমাজের আত্মপরিচয়ও ধাপে ধাপে বিলুপ্তি হয়।

কিছু মুসলিমদের ক্ষেত্রে ধর্মান্তর (বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু জীবিকার আশায়) ঘটে; তারা খ্রিষ্টান হয়ে সমাজে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করে। এদের জীবন প্রায়শই দ্বৈত পরিচয়ের বহিরাগতভাবে খ্রিষ্টান রীতি মেনে চলা, ঘরে বা ব্যক্তিগতভাবে পুরোনো বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত স্মৃতি রেখে চলার এমন এক জটিলতা ধারণ করে। অন্যরা, বিশেষত বয়োবৃদ্ধ বা দরিদ্র্যরা, বণিকদের বা সামন্তদের দ্বারা দাস হিসেবে কেনা হয়ে দূরে পাঠানো হয়; তাদের ভবিষ্যৎ প্রায়শই অদৃশ্য আর অনিশ্চিত।

লুসেরার মুসলিমদের স্থানান্তর সাধারণত দু-ভাবে ঘটেছিল। এক, পরিকল্পিতভাবে নির্বাসন, যেখানে রাজ্য ও সেনাবাহিনী মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট পথ ও জলপথ ঠিক করে তাদের নিরাপদে অন্যত্র পাঠাত। কিন্তু বাস্তবে অনেকেই নিরাপদে পৌঁছাতে পারে নাই। তাদের অস্তিত্ব সমুদ্রের তলদেশে চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, অবরোধ বা জরুরি পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা দাস হয়ে জীবনযাপন করা। মুসলিমদের স্থানীয় দাসবাজারে বিক্রি হতো বা অন্য অঞ্চলের জমিদার ও অভিজাতদের কাছে পাঠানো হতো।

এই স্থানান্তরের সঙ্গে মুসলিমদের সব সহায়-সম্পদ দ্রুত দখল ও নিঃস্ব হয়ে যেত। কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই মুসলিমদের জমি ও সম্পত্তি রাজসভার হাতে চলে যেত। ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, পেশাজীবী শিল্পীরা তাদের কাজ হারিয়ে ফেলেছিল, শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সকল কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। নগদ অর্থ, সোনা-দরবার সবই শেষ হয়ে যায়। সাহায্য খোঁজার চেষ্টায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় বা দূর দেশ সব ক্রমে দুর্বল হয়ে যায়। কে কাকে সাহায্য করবে, সবাই তো সাহায্যের প্রত্যাশী?

এমতাবস্থায় অনেকে পরিচয় হারিয়েছেন। নামচিহ্ন পরিবর্তিত হতো, স্থলনাম বদলাতো, মসজিদের জায়গায় চার্চ বা প্রশাসনিক ভবন তৈরি হতো। ইতিহাসে তাদের নাম মুছে গেছে, আর বেঁচে আছে তাদের ল্যাটিন ও ইতিহাসের লিপিতে।

তাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল ভিন্ন। যদিও সামান্য কয়েকটি পারিবার আশেপাশের গ্রামীণ অঞ্চলে আশ্রয় পেয়েছিল, কেউ কেউ দূর দুর্গে লুকিয়ে থাকত, কেউ সমুদ্রপথে উত্তর বা উত্তর আফ্রিকার বন্দরে পৌঁছে পুনরায় বসতি গড়ার চেষ্টা করত। তবে অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হয়ে খ্রিষ্টান সমাজে মিলেমিশে বা দাসত্বে বিক্রি হয়ে যায়। ধনী বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কিছু মানুষ কুচক্রী মহলের সহযোগীতায় কিছু কিছু ভূমি রক্ষা করতে পেরেছিল।

সিসিলিয়ার মুসলিমদের এই দিনগুলোর প্রমাণ রয়েছে সমসাময়িক ক্রনিকল, রাজকীয় আদেশ, আইনগত রেজিস্টার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাজেয়াপ্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মসজিদের জায়গায় গির্জা, জমির নামচিহ্নের পরিবর্তন ইত্যাদি নথিতে। উপরোক্ত তথ্যগুলো দেখায় যে ক্ষয়ক্ষতি শুধু শারীরিক নয়, সাংস্কৃতিক ও আর্থিকও ছিল। লুসেরার মুসলিম সমাজের দ্রুত অবক্ষয়, বিতাড়ন, সম্পদের জব্দ এবং পরিচয়ের ক্ষয়-মিলিয়ে একটি পুরো সম্প্রদায় দিনের পর দিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ইতালির মুসলিমদের ইতিহাস এখানেই শেষ! এখানেই চারশ বছরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়!

নর্মান ও পরবর্তী ইউরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিকভাবে মুসলিমদের উপস্থিতি সিসিলি থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেলেও, তাদের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রভাব দ্বীপের সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে রইল। ইসলামি শাসনের যুগে যে প্রশাসনিক দক্ষতা, কৃষি প্রযুক্তি, স্থাপত্যরীতি, সংগীতধারা ও জীবনযাত্রার সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল, তা নর্মান যুগ পেরিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সিসিলির চরিত্রে অমলিন থেকে যায়।

দ্বীপের ভৌগোলিক নামগুলোর মধ্যেই এই ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট Calatafimi, Alcamo, Marsala, Caltagirone প্রভৃতি স্থাননাম সরাসরি আরবি উৎস থেকে আগত। আরবি শব্দ qalʿa (দুর্গ) বা marsā (বন্দর)-এর মতো উপাদান বহু স্থানের নামের সঙ্গে মিশে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে মুসলিমদের উন্নত সেচব্যবস্থা (irrigation system)-যেমন কুয়া, নোরিয়া, খাল ও জলাধারের প্রযুক্তি নর্মান ও পরবর্তী ইউরোপীয় কৃষকদের দ্বারাও অনুসৃত হয়। এই জ্ঞান সিসিলির উর্বর ভূমি ও শস্য উৎপাদনের ধারাকে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ করেছে।

সাহিত্য ও সংগীতেও ইসলামি প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। সিসিলিয়ান কবিতার ছন্দে ও গানে আরবি কাব্যধারার সুরধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। এমনকি ইউরোপীয় "ট্রুবাডুর" (troubadour) ঐতিহ্যের মধ্যেও মধ্যপ্রাচ্যের সংগীত ও ছন্দের প্রতিফলন পাওয়া যায়, যার শিকড় সিসিলির সেই মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিহিত।

এভাবেই, সিসিলিতে ইসলামি উপস্থিতি শেষ হয়ে গেলেও, তার সংস্কৃতি ও জ্ঞানের উত্তরাধিকার দ্বীপের সমাজ, ভাষা ও শিল্পকলায় চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, যা আজও ভূমধ্যসাগরীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ হিসেবে সিসিলিকে বিশ্বমানচিত্রে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

মুসলিম শাসনামলে সিসিলিয়ার মুদ্রা

"A map does not just chart, it unlocks and formulates meaning; it forms bridges between here and there, between disparate ideas that we did not know were previously connected." Reif Larsen[42]

আলো আর অন্ধকারের সংযোগবিন্দু

মুসলিম সিসিলির রাজধানী পালেরমো আর সিসিলির আকাশে যখন সন্ধ্যার আলো ঝিলমিল করছিল, তখন শহরের সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে আজানের ধ্বনি আর বাজারের কোলাহল যেন একসঙ্গে মিলেমিশে যেত। একদা মসজিদের মিনার থেকে আসত আজানের মধুর ডাক। আর গলিপথে সাজানো থাকত মশলা, রেশম, খেজুর, মধু ও আখের লালচে টুকরো। কিন্তু সেই রঙিন দৃশ্যের ভেতরের সময় ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। অনেক আগেই মরক্কোয় আঘলাবিদদের পতন ঘটেছে। ইতোমধ্যে ফাতিমিদের ছায়া ম্লান হয়ে এসেছে। আর নর্মান বাহিনী দ্বীপের দিকে এক পা দুই পা করে হাত বাড়াতে বাড়াতে পুরো দ্বীপতে গ্রাস করল একই সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটেছে।

প্রাথমিকভাবে যদিও নর্মানরা তলোয়ার হাতে নিয়ে দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিল, কিন্তু মসজিদগুলোতে নামাজ পড়া মুসলিমদের জোর করে তাড়াল না। বরং রাজদরবারে দেখা গেল মুসলিম কাতিবদের হাতেকলম, আরবি ভাষায় দলিলপত্র লেখা হচ্ছে। নর্মান রাজারা বুঝে গিয়েছিল এই সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখাই তাদের শক্তি। মুসলিম কৃষকেরা মাঠে নতুন ও আরও উন্নত সেচপদ্ধতি চালু করল, গাছ ভরে উঠল লেবু, কমলা, আখ আর তুলোতে। সেই ফসল থেকে রাজকোষ ভরে উঠল, নর্মান রাজাদের প্রাসাদ সমৃদ্ধ হলো। মুসলিম কারিগররা সূক্ষ্ম কাজ করা অস্ত্র তৈরি করল, বণিকরা সমুদ্রপথে পণ্য চালান দিলো, আর রাজ্যের ভেতরে ভেতরে তৈরি হলো এক নতুন সহাবস্থান।

অন্যদিকে হাজার মাইল উত্তরে ভেনিসের জলাশয় ঘেরা শহরে এ সময় এক ভিন্ন চিত্র। দূর দিগন্তে দেখা যেত মুসলিম জাহাজের কালো পাল। আর সে সকল জাহাজ ভর্তি হয়ে আফ্রিকার বন্দর থেকে ভেসে আসত মরিচ, দারুচিনি, সুগন্ধি তেল, সিল্ক আর হাতির দাঁত। ভেনিসের নগরপতি জানতেন এই বাণিজ্যই

[42] The Young and Prodigious T. S. Spivet *by Reif Larsen*, Random House, 1 Mar 2014, Page 138.

শহরকে সমৃদ্ধ করছে। তাই মুসলিম বণিকদের জন্য আলাদা আইন চালু করা হলো, যাতে তারা নিশ্চিন্তে কেনাবেচা করতে পারে। কিন্তু ভেনিসের রাজনৈতিক দরবারে মুসলিমদের সরাসরি আসন ছিল না; সেখানে তারা ছিলেন ছায়ার মতো উপস্থিত, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে শক্তি জুগিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করেননি।

একই সাথে নেপলির ছিল ভিন্ন ছবি। বাইজেন্টাইন আর নর্মান প্রভাবের মাঝে আটকে থাকা এই নগরে মুসলিমরা কখনো ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে হাজির হতো, কখনো আবার কূটনীতির দূত। কোনো কোনো খ্রিষ্টান প্রিন্স নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিম ভাড়াটে বাহিনী ডেকে পাঠাত। ফলে একদিকে মুসলিমরা রাজনৈতিক দরবারে দরকারি হয়ে উঠত, অন্যদিকে তাদের প্রতি অবিশ্বাসও বেড়ে যেত। এক যুদ্ধের পরে তারা বীরের আসনে বসত, আরেক যুদ্ধে তারা হতো পরিত্যক্ত ভাড়াটে।

তাদের জীবনের কেন্দ্রে ছিল কর আর জমির হিসাব। আঘলাবিদ ও ফাতিমিদের সময় থেকেই মুসলিম কৃষকেরা জানত জমির কর, খারাজ, আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ খুমস দিতে হয়। নর্মানরা এসে সেটিকে পুরোপুরি ভাঙল না। তারা দেখল এই কাঠামো কার্যকর। তাই শুধু নাম বদলে রেখে দিলো। কৃষকেরা রাজকোষে ফসল দিলো, বিনিময়ে তারা নিজেদের বসতভিটা আর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে পারল। কিন্তু যখন কর বাড়ানো হতো, তখনই ক্ষোভ জন্ম নিত। বিদ্রোহের আগুন একাধিকবার জ্বলে উঠেছে, যেমন আগ্রিজেন্টো অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। প্রতিবার শাসকেরা কড়া হাতে দমন করলেও, সম্পর্কের ভেতরে সেই টানাপোড়েন থেকে যেত।

এত ঝড়, সংঘাত, দ্বন্দ্ব আর ধ্বংসের পরও কখনো আজকের ইতালির মুসলিমরা বৃহত্তর ইসলামি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। দেখা গেলো হঠাৎ একদিন পালেরমো বন্দরে ভিড়ল দামেশক থেকে আসা জাহাজ। জাহাজের বণিকেরা নামল হাতে রেশমি কাপড়, মসলা আর ওষুধ নিয়ে। তাদের ঠোঁট থেকে ভেসে এলো খবর বাগদাদে নতুন আব্বাসি খলিফা সিংহাসনে বসেছেন। স্থানীয় মুসলিমরা আগ্রহভরে শুনল সেই খবর, যেন দূরের এক শক্তির সঙ্গে এখনও অদৃশ্য এক সম্পর্ক রয়েছে। শতাব্দী পরে যখন ওসমানীয়রা ভূমধ্যসাগরে শক্তি বিস্তার শুরু করল, তখন ইতালির মুসলিমরা তাদের প্রভাব কমতে দেখল। তবুও কূটনৈতিক বার্তা, যুদ্ধবন্দি বিনিময় বা দূতাবাসের মাধ্যমে এক সেতুবন্ধন টিকে রইল।

এভাবে সিসিলি, ভেনিস, নেপলি, পালেরমো, রোম আর অন্য রাজ্যগুলোর ভেতরে মুসলিম সম্প্রদায় হয়ে উঠল এক জটিল চিত্র। তারা কখনো কৃষিজমির ঘামঝরা শ্রমিক, কখনো রাজকোষের করদাতা, কখনো সমুদ্রের বণিক, কখনো আবার রাজদরবারের কূটনীতিক বা ভাড়াটে সৈন্য। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে তারা ছিল উপস্থিত, যদিও প্রায়শই ছায়ায়, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে। তবুও তাদের হাতের তৈরি সেচব্যবস্থা, তাদের বপন করা কমলা ও আখ, তাদের আনা মসলা আর সিল্ক, আর তাদের ভাষার ছাপ এখনও ছড়িয়ে আছে ইতালির প্রতিটি কোণে যেন নিঃশব্দে তারা নিজেদের গল্প লিখে গেছে সময়ের বালিতে।

একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে, ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম সেনারা প্রথম সিসিলিতে পা রাখার পর দ্বীপের জনসংখ্যার চিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করে। প্রথম দিকে মুসলিমরা ছিল সীমিতসংখ্যক সৈন্য ও প্রশাসনিক কর্মচারী, কিন্তু দশকের পর দশক কেটে যেতে যেতে তাদের পরিবার, ব্যবসায়ী, কৃষক আর কুটিরশিল্পীরা নতুন বসতি গড়ে তোলে। ৯ম শতকের শেষ দিকে পালেরমো হয়ে ওঠে এক ব্যস্ততম আরব-ইসলামি নগর, যেখানে বাজার, বন্দর আর প্রশাসনিক ভবনগুলো শহরের প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলে।

মুসলিম জনসংখ্যার বেশির ভাগই শহরে ঘনীভূত হলে গ্রামাঞ্চলেও তাদের বসতি তৈরি হয়েছিল। মাজারা, আগ্রিজেন্টো, সিরাকিউজ বা এননা-এসব স্থানে মুসলিম কৃষকেরা জমিতে আবাদ করত। তারা নতুন কৃষি প্রযুক্তি, সেচব্যবস্থা এবং শস্যের বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। সিসিলির গ্রামগুলোতে খেজুর, লেবু, কমলা, আখ ও জাফরান চাষ শুরু হয়, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। শহরে তখন ব্যবসায়ী মুসলিমরা সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য চালাচ্ছে উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও আন্দালুসিয়ার সঙ্গে।

শাসক মুসলিম সমাজের ভেতরে ছিল নানা স্তর। ওপরের স্তরে ছিলেন গভর্নর, কর কর্মকর্তা, বিচারক বা সামরিক জুন্ড বাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্যরা। এরা অনেকেই আফ্রিকা (বর্তমান তিউনিশিয়া) থেকে আসতেন, আরব বা বার্বার বংশোদ্ভূত ছিলেন, এবং সরাসরি খলিফার অনুমোদনে দ্বীপ শাসন করতেন। মাঝামাঝি স্তরে ছিলেন উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, দর্জি, লৌহকার কিংবা জাহাজ নির্মাতা, যারা শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখতেন। সবচেয়ে বড় অংশ ছিল সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে, যারা খারাজ বা খুমস কর দিত এবং শাসকের সুরক্ষায় জীবনযাপন করত।

ধর্মীয় ও শিক্ষাজীবনও মুসলিম সমাজের অন্যতম ভিত্তি ছিল। পালেরমোর মসজিদগুলো শুধু নামাজের স্থান নয়; বরং সামাজিক কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। ৯ম শতাব্দীর শেষ থেকে ১০ম শতাব্দীতে মসজিদের সঙ্গে মাদরাসা ও পাঠশালা যুক্ত হতে থাকে। শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো, পাশাপাশি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রাথমিক ধারণাও দেওয়া হতো। বিখ্যাত বিচারক ও শিক্ষকরা যেমন সাহনান (মালিকি ফিকহবিশেষজ্ঞ) বা ইবনে আবু মিনহালের মতো কাজিরা দ্বীপে এসে শিক্ষা ও আইনচর্চা পরিচালনা করতেন। অনেক সময় মাদরাসা থেকে তৈরি হওয়া ছাত্ররা কর অফিসে, বাজারে বা বিচারালয়ে কাজ পেত।

তবে এই সমাজ ছিল একেবারেই একরূপ নয়। সিসিলিতে মুসলিমরা সংখ্যায় যতই বাড়ুক না কেন, তাদের পাশাপাশি বাস করত খ্রিষ্টান ও ইহুদি জনগোষ্ঠী। শহরের বাজারে একসঙ্গে মুসলিম কারিগর, ইহুদি বণিক আর খ্রিষ্টান কৃষক দেখা যেত। ধর্মীয় বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় ছিল স্পষ্ট-তাদের পোশাক, ভাষা (আরবি), স্থাপত্যশৈলী আর মসজিদগুলো শহরের দৃশ্যপটে আলাদা করে চোখে পড়ত।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার চাপও দেখা দিলো। একদিকে নতুন মুসলিম অভিবাসীরা আফ্রিকা থেকে আসছিল, অন্যদিকে পুরনো খ্রিষ্টান গ্রামগুলোতে মুসলিম বসতি গড়ে উঠছিল। ৯৩০ থেকে ৯৪০ সালের দুর্ভিক্ষে মুসলিম কৃষক ও সাধারণ জনগণ কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে গেলেও, তাদের সংখ্যা তখনও বাড়ছিল। আর নর্মানরা যখন ১০৬১ থেকে ১০৯১ সালের মধ্যে দ্বীপ দখল করে, তখন তারা দেখল সিসিলির জনসংখ্যার এক বড় অংশই মুসলিম, যারা গ্রাম ও শহরজুড়ে শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

আজও পালেরমো শহরের সরু পাথরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় ইতিহাসের পাতাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন মসজিদ ও মাদরাসার অবশিষ্টাংশ, যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত, এখনও সেই সময়ের মুসলিম কারিগরদের চমৎকার শিল্প ও বাণিজ্যিক তৎপরতার নিদর্শন বহন করে। আমি যখন পালেরমোর প্রাচীন বাজার এলাকা (Mercato di Ballarò) ঘুরছিলাম, দেখা মিলল নিচুতলায় খোলা ছোট দোকানগুলোতে, যেখানে কখনো মরিচ, দারুচিনি, সুগন্ধি তেল, সোনালি সিল্ক ও অন্যান্য প্রাচীন আড়ৎপণ্য বিক্রি হচ্ছিল। সেসব দেখলে মনে হয়, আঘলাবিদ ও ফাতিমিদের সময় এই বণিক সম্প্রদায়ের তৎপরতা শুধু অর্থ উপার্জনই নয়, শহরের সাংস্কৃতিক জীবনকেও উজ্জীবিত করেছিল।

একই সাথে মাজারা এবং সাইকিউস ঘুরতে গিয়ে চোখে পড়ে মুসলিম কৃষকদের সৃষ্ট ফসলের চিহ্ন। প্রাচীন চাষের পদ্ধতি ও ধারা এখনও মাঠের রেখা ও জমির বিন্যাসে দেখা যায়। সাইট্রাস ফল, হেম্প, চিনি চাষের মতো উদ্ভাবনগুলো সেই সময়ে মুসলিম কৃষকদের প্রবর্তন। আমি যখন মাজারার প্রান্তে দাঁড়াই, মনে হয় যেন কালের পরিক্রমা থেমে গেছে এবং কৃষকরা ফসল কাটার কাজে ব্যস্ত, এমন একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

শিল্প ও কারুশিল্পের প্রভাবও চোখে পড়ার মতো। পালেরমোতে কিছু প্রাচীন প্রাসাদ ও প্রাসাদের মজবুত প্রাচীরের নকশা এখনও মুসলিম কারিগরদের সূক্ষ্ম কারুকাজ প্রকাশ করে। তাদের তৈরি সিল্কজাত পণ্য ও ধাতব কাজের নিদর্শন, যদিও বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কিছু নিদর্শন আমাকে অতীতের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করায়। মনে হয়, সেই সময়কার বণিক ও কারিগররা শুধু শহরকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করছিল না, সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যও ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

সমুদ্রপথে তাদের কার্যকলাপের কথাও চোখে পড়ে। পালেরমো ও মাজারা বন্দরে এখনও কিছু প্রাচীন ঘাটের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ দেখা যায়। ভাবতে হয়, কীভাবে মুসলিম নাবিকরা এই ঘাট ব্যবহার করে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইতালির বিভিন্ন শহরে পণ্য পরিবহন করত। তাদের এই সমুদ্রপথের দক্ষতা দ্বীপের আঞ্চলিক অর্থনীতি দৃঢ় করতে সাহায্য করত। আমি যখন সেই ঘাটের পাশে দাঁড়াই, কল্পনা করতে পারি, কেমন করে জাহাজগুলো মরিচ, দারুচিনি ও সিল্ক ভর্তি করে সমুদ্রপথে ছুটত।

মনে হয়, প্রত্যেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা, প্রতিটি পুরনো রাস্তা, এবং প্রতিটি জমি নিজস্ব গল্প বলছে। তারা স্মৃতির আকারে বলতে চাইছে কীভাবে মুসলিম সম্প্রদায় সিসিলির অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি ও সমুদ্রবাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই অভিজ্ঞতা শুধু ইতিহাসের তথ্য নয়; বরং তা আমাকে অতীতের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করছে, যেন আমি সেই সময়ের শহরের জীবন্ত অংশ হতে পারি।

কিন্তু সবই সহজ ছিল না। দ্বীপের ভূগোল, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনও কঠিন করে তুলত। আগ্রিজেন্টো, ক্যালটাবেল্লোটা,কলেসানো এবং প্লাটানি অঞ্চলে বারবার কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিত। কর, জমি দখল এবং নতুন উপনিবেশীদের আগমন সব মিলিয়ে দ্বন্দ্ব এবং কোলাহল এই সাম্রাজ্যকে সব সময় অস্থির করে রেখেছিল। তবুও, এই অশান্তির

মধ্যেও হাজারো স্মৃতি, স্থাপনা এবং সংস্কৃতির চিহ্ন রয়ে গেছে, যা আমাদের অতীতের গৌরব এবং ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আধুনিক সিসিলির রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, প্রত্যেকটি প্রাচীন প্রাসাদ, বিলুপ্ত মসজিদ, বাণিজ্যিক এলাকা এবং ঘাট যেন আমাকে অতীতের সময়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাজারো বছর আগে মুসলিমরা এই দ্বীপে কত শক্তিশালী ও উদ্যমী ছিল তা সহজেই চোখে পড়ে। মাজারা বা সাইকিউসের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কল্পনা করা যায়, কীভাবে তারা কৃষি চর্চা করত, বাণিজ্য পরিচালনা করত এবং শিল্পকর্মে নিজেদের দক্ষতা দেখাত। প্রতিটি ধ্বংসাবশেষ যেন আমাদের জানাচ্ছে, সেই সময়ের দ্বন্দ্ব ও কোলাহল সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় সিসিলির ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর, গ্রাম, কেল্লা ও ঘাটগুলো শুধু স্মৃতির প্রতীক নয়; তারা দেখায়, কীভাবে অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মিলিয়ে সিসিলির অমোঘ পরিচয় গঠন করেছে। সবই ইতিহাসের সেই সংগীতময় নোটের অংশ, যেখানে মুসলিমদের প্রভাব এবং তাদের সংগ্রামের গল্প এখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রাচীন শহরের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে আমি অনুভব করি, কেবল বাণিজ্য বা অর্থনীতি নয়, ধর্মের দৃঢ় প্রভাবও কত গভীর। মুসলিম শাসনামলে এই দ্বীপে ইসলাম প্রচলিত হয়, কিন্তু সেই প্রচলন কখনো সরল ছিল না। স্থানীয় খ্রিষ্টানরা, পুরনো বাসিন্দারা, নর্মান আগমন পূর্ববর্তী এবং পরে সবাই মিলিয়ে সমাজে একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য তৈরি করেছিল। অনেকেই খ্রিষ্টান পরিচয় বজায় রেখেও গোপনে ইসলাম চর্চা করত, অর্থাৎ ক্রিস্টো-ইসলামিক জীবন। পুরনো ধ্বংসপ্রায় মসজিদের অবশিষ্ট অংশ, যেমন পালেরমোর কাস্তেলো ডেলেমোর ভিতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত নামাজের স্থানগুলো, সেই গোপন প্রার্থনার সাক্ষী। তখনকার মসজিদগুলো শুধু নামাজের স্থান ছিল না। সেগুলো ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। আমি যখন মাজারা এবং আগ্রিজেন্টোর ধ্বংসপ্রায় মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখি, মনে হয় এখানেই মুসলিম শিশুদের কুরআন শিক্ষা হতো, হাদিসের পাঠ হতো, আর প্রাপ্তবয়স্করা ইসলামের জ্ঞান দিয়ে সামাজিক নীতি শিখত। শিক্ষকেরা বা আলিমরা শুধু ধর্মীয়ই নয়, সামাজিক নিয়ম, আইন এবং আচার-অনুষ্ঠানও শেখাতো।

শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলোতে, যেমন সাইকিউস এবং পালেরমোর বাজার এলাকা, মুসলিম ধর্মীয় আচার ও সামাজিক প্রথার চিহ্ন আজও ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যে ফুটে

ওঠে। পবিত্র রমজান মাসে কেবল নামাজ নয়, খাদ্য বিতরণ ও দানের প্রথাও প্রচলিত ছিল। ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে সামাজিক মিলন, ব্যবসায়িক বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সমঝোতার দৃশ্যও নিত্যনৈমিত্তিক। এই আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক জীবনের সমন্বয় ঘটাত।

ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে শিল্প ও স্থাপত্যের সংযোগও অত্যন্ত দৃশ্যমান। পালেরমোর ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ এবং মসজিদের ভিতরে সূক্ষ্ম আরবেস্ক নকশা, জ্যামিতিক প্যাটার্ন, এবং কালো-সোনালি টালি কাজ চোখে পড়ে। মাজারা এবং আগ্রিজেন্টোর ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যের নিদর্শনে দেখা যায় যে, মুসলিমরা স্থাপত্যকে কেবল শোভা বা শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, শিক্ষামূলক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহার করত। প্রাচীন গ্রন্থাগার ও মাদরাসাগুলোর অবস্থানও সেই সময়ের সৃষ্টিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রমাণ।

মুসলিম সাহিত্যও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শিশুদের নৈতিক গল্প, প্রাচীন কাব্য এবং শিক্ষামূলক প্রবন্ধ সবই কুরআনীয় নৈতিকতার সঙ্গে মেল খেতো। আমি যখন সিসিলির ছোট ছোট গ্রামে ঢুঁকি মারি (যদিও এখন আর গ্রাম নয়), প্রাচীন দালানের অবশিষ্টাংশ দেখি, মনে হয় এখানেই শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা একসঙ্গে জ্ঞানার্জন করত। চিত্রকলা এবং স্থাপত্যে শিল্পের সংমিশ্রণ সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বহন করত।

সমাজে এই ধর্মীয় সংস্কৃতি শুধু ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকত না। তা সামাজিক নিয়ম, ন্যায়বিচার এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলত। মুসলিমদের সমাজে শ্রেণিবিন্যাস যেমন প্রশাসক, শিক্ষক, বণিক বা সাধারণ নাগরিক সবাই ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব ও সামাজিক দায়িত্বে প্রভাবিত হতো। প্রতিটি মসজিদ, প্রাসাদ, বাজার এবং শিক্ষালয় যেন আমাদের কাছে একেকটি জীবন্ত ইতিহাসের গল্প বলে।

সিসিলির এই প্রাচীন দৃশ্যপটগুলোতে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়, মুসলিম সম্প্রদায় কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে দ্বীপকে প্রভাবিত করেছিল। ক্রিস্টো-ইসলাম, ধর্মীয় আচার, শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্প সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাত্রার চিহ্ন আজও ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যে, গ্রাম ও শহরের অবশিষ্টাংশে দৃশ্যমান। এখানেই ইতিহাসের হাওয়া এখনো বাতাসে ভেসে বেড়ায়, পাঠককে অতীতের সাথে সংযুক্ত করে।

সিসিলিতে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি মৌলিক প্রশ্ন অনিবার্যভাবে সামনে আসে এই দ্বীপে ইসলাম ধর্মের বিস্তার কি ছিল জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের ফল, নাকি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে? ইতিহাসের এই প্রশ্নটি শুধু সিসিলির প্রেক্ষাপটে নয়; বরং পুরো ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বের ইসলামি সম্প্রসারণের গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইসলাম ধর্মের বিস্তারকে একদিকে কেউ কেউ সামরিক বিজয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে দেখেছেন, অন্যদিকে বহু ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন ইসলামের প্রসার প্রায়ই ঘটেছে সংস্কৃতি, বাণিজ্য, প্রশাসনিক ন্যায়নীতি ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে।

সিসিলির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দ্বীপটি ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপ, আফ্রিকা ও আরব বিশ্বের সংযোগস্থল। অষ্টম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত সিসিলিতে মুসলিম শাসনের উত্থান ঘটে সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তারপরে দীর্ঘ একাধিক শতাব্দী ধরে দ্বীপটি পরিণত হয় বহু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের কেন্দ্রে। ফলে ইসলাম এখানে কেবল বিজেতাদের ধর্ম নয়; বরং সমাজের অংশ হয়ে ওঠে।

আমরা দেখি যে সিসিলিতে ইসলামি উপস্থিতির সূচনা অষ্টম শতকের শেষভাগে, যখন উত্তর আফ্রিকার আঘলাবি সেনারা ধাপে ধাপে দ্বীপটির উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ৮২৭ সালে জেনারেল আসাদ ইবনে আল-ফুরাতের নেতৃত্বে মুসলিম সেনারা প্রথমবারের মতো সিসিলিতে অভিযান চালায়, এবং পরবর্তী প্রায় সাত দশকে দ্বীপটির দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল ধীরে ধীরে তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। শুরুতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রধানত আফ্রিকার কাইরোয়ান, টিউনিস, সাবেথা ও বার্বার অঞ্চলের সৈন্য, প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত। তারা সিসিলির উর্বর ভূমিতে কৃষিকাজ শুরু করে, নতুন সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করে, এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু এই মুসলিম সমাজের বৃদ্ধি কেবল বাহির থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে হয়নি-এটি ছিল একটি সামাজিক ও ধর্মীয় রূপান্তরের প্রক্রিয়া, যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে এই নতুন সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণের পেছনে ছিল বাস্তবিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা। মুসলিমদের অধীনে অমুসলিমদের জিজিয়া নামের বিশেষ কর প্রদান করতে হতো, অথচ মুসলিমদের সে কর থেকে অব্যাহতি ছিল। ফলে অনেক খ্রিষ্টান কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা লাভ করেন। আবার

মুসলিম শাসনের প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামোয় যোগ দিতে হলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রয়োজন ছিল, যা স্থানীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের জন্য উন্নতির সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে মুসলিম পুরুষদের সঙ্গে স্থানীয় নারীদের বিবাহও ধর্মান্তরের এক প্রাকৃতিক পথ তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইসলামি সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্মান্তরের প্রক্রিয়াটি কখনো জোরপূর্বক ছিল না; বরং এটি ঘটেছিল ধীরে ধীরে, সামাজিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে।

নবম ও দশম শতকে মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে পালেরমো, মজারা, আগ্রিজেন্তো ও এননা অঞ্চলে। ভ্রমণকারী ও ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দাসি এবং পরবর্তীতে আল-ইদ্রিসি তাদের রচনায় উল্লেখ করেন যে, এই সময়ে পালেরমো ছিল এক ব্যস্ত ও জনবহুল ইসলামি নগরী, যেখানে প্রশাসন, শিক্ষা ও বাণিজ্য পুরোপুরি আরবি ভাষায় পরিচালিত হতো। ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুযায়ী, পালেরমোর অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলিম ছিল, যা প্রমাণ করে যে ইসলামি শাসন সিসিলিতে কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য নয়; বরং সাংস্কৃতিক ও জনসংখ্যাগত বাস্তবতা হয়ে উঠেছিল। মুসলিম শাসনের অধীনে কৃষি, স্থাপত্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছিল, তা স্থানীয় জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামি সেচব্যবস্থা, খেজুর ও সাইট্রাস ফলের চাষ, উন্নত নগর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যে জ্যামিতিক শৈলীর ব্যবহার সিসিলির সামাজিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ইসলাম এখানে কেবল ধর্ম নয়; বরং উন্নয়নের প্রতীক হয়ে ওঠে।

ফাতিমি আমলে (৯১০-১০৯১) এই প্রক্রিয়া আরও গভীর হয়। আফ্রিকা থেকে নতুন মুসলিম অভিবাসীদের আগমন অব্যাহত থাকলেও স্থানীয় ইসলামধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, ফলে দ্বীপের পশ্চিমাংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। পালেরমোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুসলিমরা শাসক শ্রেণি ছাড়াও কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী ও সৈন্য হিসেবে সমাজের প্রতিটি স্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তবে পূর্ব তখনও সিসিলিতে এখনো খ্রিষ্টান ও গ্রিক অর্থোডক্স সম্প্রদায় শক্তিশালী ছিল, যা দ্বীপটির ধর্মীয় ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

মুসলিম জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে, যা নর্মান বিজয়ের (১০৯১) পরও শতাধিক বছর টিকে ছিল। এমনকি দ্বাদশ শতকেও পালেরমো ও মনরেয়াল অঞ্চলে মুসলিম বসতি,

মসজিদ ও আরবি ভাষার ব্যবহার নিয়মিত ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম এখানে ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের ধর্ম নয়; বরং বহু প্রজন্মব্যাপী সামাজিক বাস্তবতা ছিল।

সিসিলির মুসলিম জনসংখ্যা কেবল উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত অভিবাসীদের ফল নয়; এটি স্থানীয় জনগণের অন্তর্ভুক্তি, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের ফল। ইসলাম এখানে যুদ্ধের তলোয়ার দিয়ে নয়; বরং সংস্কৃতির আকর্ষণ, অর্থনৈতিক স্থিতি ও মানবিক সহাবস্থানের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছিল। সিসিলি তাই মধ্যযুগীয় ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সেই বিরল ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামি ও ইউরোপীয় ঐতিহ্য একে অপরের পরিপূরক হয়ে এক অনন্য ঐতিহাসিক সহাবস্থানের অধ্যায় রচনা করেছে।

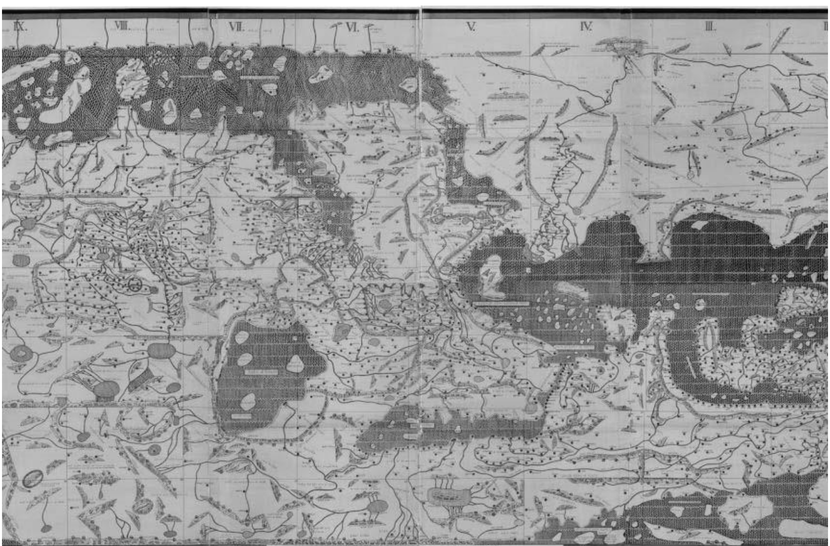

আল ইদ্রিসি প্রণীত ম্যাডেটেরিয়ান মানচিত্র

আজকের ডিজিটাল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মনে হতে পারে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ ইতিমধ্যেই মানচিত্রে চিহ্নিত ও নথিভুক্ত। তবে ২০শ শতকের আগে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন ছিল। তখন মানচিত্রায়ন কেবল অবস্থান নির্ধারণের মাধ্যম ছিল না, বরং মানুষের কৌতূহল, আবিষ্কারের মনোভাব এবং বিশ্বকে বোঝার প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। মুসলিম সভ্যতার মানচিত্রায়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এখানেই মধ্যযুগে বিশ্বের অনেক অজানা অঞ্চলকে প্রথমবারের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রায়িত করা হয়।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল-ইদ্রিসি ১১৫৪ সালে “টাবুলা রজেরিয়ানা (Tabula Rogeriana)” প্রণয়ন করেন, যা প্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম সুসংগঠিত ও বিশদ মানচিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। আল-ইদ্রিসি তার মানচিত্র তৈরিতে স্থানীয় জনগণ, বন্দর, নদী ও পাহাড়ের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি গণিত ও জ্যামিতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের এই মানচিত্র কেবল ভূগোল নির্ধারণের জন্য নয়, মানুষের আবিষ্কারের মনোভাব, বাণিজ্যিক লক্ষ্য এবং সামাজিক যোগাযোগের প্রতিফলনও বয়ে আনে।

আল-ইদ্রিসির মানচিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দক্ষিণকে শীর্ষে রাখা। আধুনিক মানচিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি উল্টো মনে হলেও, মুসলিম মানচিত্রায়নে এটি সাধারণ প্রথা ছিল। এর পেছনে নির্দিষ্ট কারণ স্পষ্ট নয়, তবে কিছু ঐতিহাসিক মত অনুযায়ী এটি ধর্মীয় গুরুত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। জেরি ব্রটনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মুসলিম মানচিত্রকাররা মক্কার দিককে উচ্চতর বা শীর্ষে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, এটি প্রাচীন গ্রিক ও রোমান মানচিত্রায়নের ধারাকেও অনুসরণ করত। যেকোনোভাবে এটি মুসলিম সভ্যতার মানচিত্রায়নের স্বাধীনতা এবং কৌতূহলের প্রকাশ।

আল-ইদ্রিসির মানচিত্র কেবল স্থান নির্ধারণে নয়, বাণিজ্যিক ও নাবিক জীবনের জন্যও অপরিসীম গুরুত্ব বহন করেছিল। তিনি ভূমধ্যসাগরের বন্দর যেমন প্যালারমো, মজারা, জেনোয়া এবং কর্সিকার অবস্থান নির্দিষ্টভাবে চিত্রায়িত করেছেন, যা নাবিকদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করত। মানচিত্রে নদী, পর্বত, উপকূলরেখা এবং শহরের অবস্থান এত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, পরবর্তী শতাব্দীর ইউরোপীয় নাবিক এবং মানচিত্রকাররা এগুলো অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব নেভিগেশনাল মানচিত্র উন্নয়ন করেছেন।

আল-ইদ্রিসির কাজ প্রমাণ করে যে, মুসলিম সভ্যতার মানচিত্রায়ন কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং এটি একটি বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অংশ হিসেবেও বিবেচিত হয়। স্থানীয় কারিগর, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীরা পৃথিবীর অজানা অঞ্চলকে চিত্রায়িত করে মানব জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েছেন। দক্ষিণকে শীর্ষে রাখা হোক বা না হোক, মুসলিম সভ্যতার মানচিত্রায়ন মধ্যযুগের জন্য এক অবিস্মরণীয় উপহার, যা আজও আমাদের পৃথিবীকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করে।

“Sicily under Muslim rule was not merely a conquest, but a crucible of cultures, where Arabs, Byzantines, and Latins met, mingled, and created a civilization unmatched in its time.” – Alex Metcalfe

বিস্মৃত পাঁচ শতাব্দী

কসভোর রাজধানী প্রিস্টিনার আকাশে সকালের সূর্য ভেদ করে আলোর আভা দৃশ্যমান। সাড়ে দশটার দিকে হোটেল থেকে বের হলাম, মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর কেমন একটা আলোড়ন হচ্ছে। জীবনের অন্যতম স্বপ্ন আজ বাস্তব হতে চলেছে। রাজধানীর মূল কেন্দ্র থেকে পশ্চিমে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরত্ব, কিন্তু আমার জন্য সেই পথটা ছিল এক অনন্ত যাত্রা যুগের পর যুগের অপেক্ষা, ইতিহাসের গভীর থেকে উঠে আসা স্মৃতি।

রাস্তা সোজা এগিয়ে চলেছে, প্রশস্ত প্রায় ষাট ফিট চওড়া, যেন আমাকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূরে দেখা দিলো সুলতান মুরাদের সমাধিস্থল, চারপাশে নিস্তব্ধতা। আশপাশে কয়েকটা ছোট ছোট বসতি, সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার কিছু পুরোনো স্থাপনা যা দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গার কোথাও মহাসড়কে কোনো সাইনবোর্ড নেই কোনো ইঙ্গিত নেই যে, এখানে ঘুমিয়ে আছেন সেই মানুষ, যার বিজয়ের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছিল।

প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটি সাদামাটা ভবন-যুদ্ধের জাদুঘর। পাশে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট। কিন্তু আমার চোখ টানল বাঁ দিকের সরু রাস্তা, যা সোজা চলে গেছে সুলতান মুরাদের সমাধির দিকে। এক একর জায়গাজুড়ে গড়ে তোলা এই কমপ্লেক্সের প্রতিটি ইট যেন ফিসফিস করে বলছে সেই রক্তমাখা দিনের কথা।

হেঁটে যাচ্ছিলাম ধীর পায়ে, কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। ১৩৮৯ সালের সেই ভোরে, যখন কসোভোর মাটিতে রক্ত ঝরেছিল, তলোয়ারের ঝলকে আকাশ আঁধার হয়ে গিয়েছিল, তখন এই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলেন অটোমান সৈন্যরা। প্রিন্স লাজারের খ্রিষ্টান বাহিনী ও সুলতান মুরাদের অটোমান বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে বিজয় অটোমানদের, কিন্তু সুলতান মুরাদ

শহীদ হলেন। আজ তাঁর সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আমি অনুভব করলাম ইতিহাস যেন আমার বুকের ভেতর জীবন্ত হয়ে উঠছে।

কোনো কোলাহল নেই, কোনো ভিড় নেই। শুধু আমি আর সেই যুদ্ধের মাঠ। মনে হচ্ছিল, প্রতিটি বাতাসে এখনও যুদ্ধের ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে, প্রতিটি গাছে লেগে আছে তরবারির ঝলক। আমি মাথা নত করলাম, অন্তরে কৃতজ্ঞতা বয়ে গেল আল্লাহর শুকরিয়া, আমি আজ এই জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছি।

তার মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। রাত ঘনিয়ে ভোর হয়ে এসেছে। বুলগেরিয়ার মারিৎসা নদীর পাড়ে হঠাৎই শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। অটোমান সৈন্যরা মেঘকালো ছায়ার মতো নেমে এলো। সার্ব ও বুলগেরিয়ান সৈন্যরা তখনও নিজেদের তাঁবুতে, মদে মত্ত। এক ঝটকায় নদীর তীরে ছড়িয়ে থাকা রাজকীয় সেনাদল ভেঙে পড়ল। ১৩৭১ সালের সেই রাতে অটোমানরা বুঝিয়ে দিলো বলকান তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

চল্লিশের দশকের শেষ প্রহরে আবারও এক বড় সংঘাত-১৩৯৬, নিকোপলিস। ক্রুসেডার বাহিনী, ফরাসি নাইটদের চকচকে বর্ম, হাঙ্গেরিয় সৈন্যদের গর্ব সব একত্র হলো। তারা ভেবেছিল তরুণ অটোমান সুলতান বায়েজিদকে সহজেই পরাজিত করবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অটোমান কৌশল আর ধৈর্যের কাছে সেই গর্ব ভেঙে পড়ল। শত শত নাইট বন্দি হলো, দানিউব নদী লাল হয়ে উঠল। ইউরোপ বুঝতে পারল, পূর্ব থেকে যে ঝড় এসেছে, তা এত সহজে থামানো যাবে না।

১৪৫৩ সালের ২৯ মে কনস্টানটিনোপল পতনের দিনটি শুধু বাইজেন্টাইনদেরই শেষ অধ্যায় ছিল না, বরং ইউরোপেরও নতুন ভয়াবহ বাস্তবতার শুরু। সেদিন থেকে সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ, যাকে ইতিহাস “ফাতিহ”-বিজেতা বলে ডাকে, তাঁর চোখে ভেসে উঠেছিল আরেকটি স্বপ্ন পূর্ব রোম জয়ের পর এবার পশ্চিম রোমকে স্পর্শ করা। অর্থাৎ, ইতালির হৃদয়ভূমি রোম।

বছরের পর বছর ধরে তিনি নৌ-বহরকে শক্তিশালী করলেন, ভূমধ্যসাগরে তুর্কি উপস্থিতি বাড়ালেন। ইউরোপ তখন বিভক্ত, পোপাল শক্তি নড়বড়ে। ঠিক সেই সুযোগে ১৪৮০ সালে অটোমান নৌবহর ইতালির দক্ষিণ উপকূলে নেমে এলো। কালো ঝড়ের মতো তারা গ্রাস করল ওত্রান্তো শহর।

সেই গ্রীষ্মের রাতে ওত্রান্তোর বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল তলোয়ারের ঝনঝন, কান্না আর প্রাচীর ভাঙার আওয়াজ। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে।

শহরের আকাশে উড়ল অটোমান পতাকা। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট ওত্রান্তো হবে এক নতুন ঘাঁটি, এখান থেকে এগোনো হবে নেপলস, তারপর রোম পর্যন্ত।

দূরে রোমে পোপ চতুর্থ সিক্সটাস আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "যদি দক্ষিণ থেকে তারা উঠে আসে, পবিত্র রোমের প্রাচীর কি টিকবে?" ইতালির অভিজাতেরা প্রস্তুতি নিতে লাগল, কিন্তু আতঙ্ক যেন শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমবাসীরা প্রতিদিন প্রার্থনা করত, যেন সেই কালো পালতোলা জাহাজ আর এগিয়ে না আসে।

কিন্তু নিয়তি অন্য গল্প লিখল। ১৪৮১ সালের বসন্তে হঠাৎ খবর এলো সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যু যেন অটোমান অভিযানের গতিপথই বদলে দিলো। ইতালির দক্ষিণে দখল করে রাখা সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করল, ওত্রান্তো থেকে অটোমানরা সরে গেল। রোম তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শহরের প্রাচীর অক্ষত রইল, কিন্তু হৃদয়ের ভেতর ভয় চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

তারপরও ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের উপস্থিতি থেমে থাকেনি। সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের আমলে বারবারোসা আর অন্যান্য অ্যাডমিরালরা ইতালির উপকূলে হানা দিয়েছে বহুবার, বন্দি করেছে, সম্পদ জব্দ করেছে। কিন্তু রোমের দেয়াল সরাসরি কখনো স্পর্শ করেনি। তবুও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অন্তত একবার ১৪৮০ সালের ওত্রান্তো দখলের সময় রোম সত্যিই মৃত্যুর ছায়া দেখেছিল। যদি দ্বিতীয় মেহমেদ আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, হয়তো আজ ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। রোম আক্রমণ হয়নি, কিন্তু সেই ভয়াল দিনগুলো ইউরোপকে চিরকাল মনে করিয়ে দিয়েছে অটোমানদের ছায়া একসময় তাদের দুয়ার পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল।

এদিকে আন্দালুসিয়ার মুসলিম সালতনাত তখন ধুঁকছে, যেকোনো সময় সাম্রাজ্য খসে পড়তে পারে। আন্দালুসিয়ার মিল্লাতের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার মতো বহুধা বিভক্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের কোনো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই।

এরই মধ্যে বলকানের আকাশে ভেসে উঠল অটোমান আধিপত্যের পূর্ণ রূপ। পুরোনো দুর্গের পাশে দাঁড়ালো মসজিদের মিনার, বাজারে ভিড় জমল তুর্কি ব্যবসায়ীদের। খ্রিষ্টান কৃষক, মুসলিম সৈনিক, ইহুদি ব্যবসায়ী সবাই মিশে গেল এক ভিন্ন বাস্তবতায়। কারও মনে ভয়, কারও মনে কৌতূহল, আবার কারও মনে এক অচেনা গর্ব-যেন ইতিহাসের ধারা পাল্টে গেল।

অটোমান বিজয় শুধু তলোয়ারের গল্প ছিল না। এটি ছিল সময়ের এক দীর্ঘ যাত্রা সংস্কৃতি, রাজনীতি আর মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে যাওয়া এক পরিবর্তন। আজও আমার দেখা বলকানের গ্রাম, শহর আর উপাখ্যানে সেই দিনগুলোর ছায়া ঘুরে বেড়ায়।

সিসিলির মুসলিম শেষ লুচেরার প্রাচীরগুলো যখন দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তারা ছিল ইতালির বুকে মুসলিমদের শেষ সংগঠিত আশ্রয়। সম্রাট ফ্রেডরিক দ্বিতীয় সিসিলি থেকে নির্বাসিত মুসলিমদের জোর করে সেখানে নিয়ে আসেন। তারা তাদের বিশ্বাস, আচার, মসজিদ ও বাজার নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তোলে। কয়েক দশক ধরে লুচেরার মুসলিমরা আপাত শান্তিতে বসবাস করছিল, কৃষিকাজ করত, কারুশিল্পে নিযুক্ত থাকত, আর তাদের সৈন্যবাহিনী সম্রাটের জন্য বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধও করত। কিন্তু ১৩০০ সালে ভাগ্য বদলে গেল। নতুন রাজশক্তি এই সমাজকে অচল হিসেবে দেখল। সেনারা ঢুকে পড়ল, শহর ধ্বংস হলো, অনেকেই হত্যা হলো, কেউ কেউ দাস হিসেবে বিক্রি হলো, আর বাকি সবাইকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হলো। এক মুহূর্তে যেন একাধিক প্রজন্মের স্বপ্ন ভেঙে গেল, আর ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যদিও সিসিলি থেকে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে ১৪০০ সালের আগেই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট হাজারও সম্প্রদায় তখনও টিকে ছিল। কিন্তু সেই টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঢেউ দক্ষিণ ইতালিতে তীব্রতর হতে লাগল। যেভাবে ইহুদিরা বিতাড়িত হয়েছিল, মুসলিমদের ভাগ্যও সেদিকে গড়াল। কখনো বাধ্যতামূলক ধর্মান্তর, কখনো নির্বাসন সব মিলিয়ে খ্রিষ্টান শাসন নিশ্চিত করল যে, দ্বীপ ও উপদ্বীপে আর কোনো সংগঠিত মুসলিম সমাজ না থাকে। এই সময়ে মুসলিমরা ইতালির মাটিতে থেকে গেল কেবল দাস হিসেবে, কিংবা যুদ্ধের বন্দি হিসেবে।

মাত্র কয়েকটা বছর পর আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে অটোমান সাম্রাজ্য এখন অনেকটা শক্তিশালী। তাদের নৌ-বহর ইতালির উপকূলে এসে দাঁড়াত বারবার, কখনো হুমকি নিয়ে, কখনো বাণিজ্যের প্রলোভন নিয়ে। অটোমানদের শক্তি ইউরোপের রাজাদের কানে বারবার ধ্বনিত হতো। এরই মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনায় মুসলিম উপস্থিতি আবার ইতালির রাজদরবারে প্রবেশ করল। সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের ভাই চেম সুলতান ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হেরে গিয়ে ইউরোপে পালিয়ে এলেন। ১৪৮২ সালে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হেরে গিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন রোডসে, সেখান থেকে রোম পর্যন্ত। পোপ ষষ্ঠ ইনোসেন্ট তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে

রাখলেন, যেন তিনি অটোমান সিংহাসনের দাবিদার হয়ে উঠতে না পারেন। ইতালির শহরগুলোতে তিনি ছিলেন বন্দি অতিথি মুসলিম রাজপুত্র, কিন্তু খ্রিষ্টান রাজদরবারের সাজঘরে। তাঁর গল্প তখনকার ইতালিয়ানদের কানে একধরনের কৌতূহল জাগাতো, একই সঙ্গে ভীতি জাগাত এই ভেবে যে, ভূমধ্যসাগরের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ভাইয়ের বিশাল সাম্রাজ্য।

(ইতিহাসের এই সময়কালের চিত্র খুঁজে পাওয়া কিছুটা মুশকিল। কারণ, মুসলিম ঐতিহাসিকরা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের উপাখ্যান নিয়ে ব্যস্ত।)

তবে সেই সমস্ত মুহূর্ত ছিল ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইতালির ভেতরে মুসলিম সমাজ আর গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের সময় দাস বা বন্দি হিসেবে আসা মানুষদের বাইরে ইসলাম প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতালি ইসলামহীন ছিল, মুসলিম স্মৃতিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ বা নামহীন কবরেই সীমাবদ্ধ রইল।

পঞ্চদশ শতাব্দীজুড়ে ইতালির মুসলিম ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল মূলত হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ইতিহাস। সিসিলির মসজিদগুলো একে একে গির্জায় রূপান্তরিত হলো, আর পুরোনো আরবি নামগুলো বিলীন হয়ে গেল নতুন নামের আড়ালে। তবুও মুসলিম উপস্থিতির প্রতিধ্বনি একেবারে থেমে যায়নি। ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব ক্রমশ ইতালির রাজ্যগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছিল। ১৪৮০ সালে ওত্রান্তোর দুর্গে (Otranto) অটোমান সেনাদের আক্রমণ ইউরোপকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেখানকার শত শত বাসিন্দা নিহত হলো, কেউ কেউ বন্দি হয়ে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাল। সেই ঘটনার পর থেকেই ইতালির প্রিন্স ও ডিউকরা বুঝতে পারল ইসলামি শক্তি আর কেবল দূরদেশের ইতিহাস নয়; বরং পাশের উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা এক সম্ভাব্য ঝড়।

এভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী ইতালির জন্য হয়ে উঠল ধর্মীয় সংঘাত আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের যুগ। লুসেরার মুসলিমরা আর ছিল না, কিন্তু মুসলিম উপস্থিতি মনে করিয়ে দিত দাসবাজারে বিক্রি হওয়া উত্তর আফ্রিকান বন্দিরা, কিংবা যুদ্ধজাহাজের গ্যালিতে শিকলবন্দি হয়ে কাজ করা মানুষরা। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আর মসজিদের আজানের মধ্যে ব্যবধান তখন অসীম, তবুও ইতিহাসের আড়ালে টিকে রইল সম্পর্কের নীরব সুতো।

সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলল ইতালি। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, আর মুসলিম উপস্থিতি প্রায় মুছে গেল ইতিহাসের পাতা থেকে। কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত

স্থাপত্য, নকশায় গাঁথা আরবি কারুকাজ, কিংবা পাণ্ডুলিপিতে টিকে থাকা নামগুলোই সাক্ষী হয়ে রইল। অথচ একই সঙ্গে ভূমধ্যসাগর তখনও বহন করছিল সেই আদানপ্রদান কখনো যুদ্ধ, কখনো বাণিজ্য, কখনো নির্বাসিত কোনো মুসলিম রাজপুত্রের অদ্ভুত কাহিনি।

চেম সুলতানের নাম উচ্চারণ করলেই যেন ভেসে ওঠে এক অদ্ভুত চরিত্র, যিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের রক্তমাংসের সন্তান অথচ নিজের ভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ইউরোপের রাজদরবারে। তাঁর জন্ম ১৪৫৯ সালে, তিনি ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ দ্বিতীয় অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল বিজেতার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশব থেকেই তাঁর চোখে ছিল ক্ষমতার স্বপ্ন, কিন্তু সেই স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল আজীবনের বোঝা।

১৪৮১ সালে যখন সুলতান মুহাম্মদ দ্বিতীয় মৃত্যুবরণ করলেন, তখন অটোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে শুরু হলো রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব। বড় ভাই বায়েজিদ দ্রুত সেনাদের সমর্থন পেয়ে ইস্তাম্বুলে সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু চেম সুলতান মেনে নিলেন না এই সিদ্ধান্ত। নিজের সমর্থক বাহিনী নিয়ে তিনি আনাতোলিয়ার বুরসা শহরে গিয়ে ঘোষণা করলেন সুলতান তিনিই। কয়েক মাস ধরে চলল দুই ভাইয়ের ক্ষমতার লড়াই। একপর্যায়ে ১৪৮২ সালের মে মাসে যুদ্ধে চেম পরাজিত হলেন।

পরাজয়ের পর তাঁর সামনে দাঁড়াল এক কঠিন প্রশ্ন মৃত্যু নাকি নির্বাসন? তিনি বেছে নিলেন নির্বাসন। প্রথমে পালিয়ে গেলেন মিশরে, মামলুক সুলতানের দরবারে। সেখানে কিছুদিন আশ্রয় পেলেও স্থায়ী সমর্থন মিলল না। এরপর চেম সিদ্ধান্ত নিলেন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার। তিনি রোডস দ্বীপে পৌঁছালেন, যেখানে তখন ছিল নাইটস অব সেন্ট জনের দুর্গ। তাঁরা খ্রিষ্টান হলেও বুঝতে পারলেন এই যুবরাজ তাঁদের হাতে এক অমূল্য সম্পদ। যদি তাঁকে আশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক হাতিয়ার পাওয়া যাবে।

রোডস থেকে চেমের যাত্রা শুরু হলো ইউরোপের নানা রাজদরবারে। তিনি গিয়েছিলেন ফ্রান্সে, পরে হাঙ্গেরি ও অবশেষে রোমে। ১৪৮৯ সালে পোপ ইনোসেন্ট অষ্টম তাঁকে রোমে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে শুরু হলো চেমের অদ্ভুত জীবন অর্ধেক বন্দি, অর্ধেক অতিথি। তাঁকে দেওয়া হলো প্রাসাদ, রাজকীয় পোশাক, এমনকি খ্রিষ্টানদের সঙ্গে টেবিলে বসে ভোজের সুযোগ। কিন্তু তিনি

ছিলেন নজরবন্দি, যাতে কোনো দিনও অটোমান সিংহাসনের দাবিদার হয়ে উঠতে না পারেন।

রোমে তাঁর উপস্থিতি ছিল এক রাজনৈতিক প্রদর্শনী। ইউরোপের রাজারা এসে তাঁকে দেখতেন, যেন প্রমাণ করতে পারেন যে খ্রিষ্টান বিশ্ব মুসলিম সুলতানের পুত্রকে নিজের হাতে রেখেছে। অন্যদিকে বায়েজিদ দ্বিতীয়ও তাঁকে ভয় করতেন। তাই তিনি নিয়মিত রোমে অর্থ পাঠাতেন এই শর্তে যে, তাঁর ভাইকে যেন ইস্তাম্বুলে ফিরতে না দেওয়া হয়। এভাবে চেম হয়ে উঠলেন দুই বিশ্বের মধ্যে এক জীবন্ত দাবার ঘুটি।

চেমের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল বেদনাময়। তিনি মুসলিম ধর্মীয় জীবন সঠিকভাবে পালন করতেন, কুরআন পাঠ করতেন, অথচ প্রতিদিন খ্রিষ্টান গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে কাটাতেন। পোপ তাঁকে ব্যবহার করতেন ইউরোপের রাজাদের রাজনীতিতে, আবার ভাই বায়েজিদ তাঁকে ব্যবহার করতেন বন্দি হিসেবে আটকে রেখে নিজের সিংহাসন সুরক্ষিত করতে। চেম সুলতান নিজে কখনোই স্বাধীন ছিলেন না।

অবশেষে ১৪৯৫ সালে তিনি নেপলস যাত্রা করেন, নতুন পোপ আলেকজান্ডার ষষ্ঠের আমন্ত্রণে। সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকের মতে, হয়তো তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল। কারণ তাঁর মৃত্যুতে স্বস্তি পেয়েছিল ইস্তাম্বুলের দরবার, আবার অনেক ইউরোপীয় শাসকও তাঁর উপস্থিতিকে ঝুঁকি মনে করত। ১৪৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলো।

চেম সুলতানের কাহিনি ইতালির ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী অধ্যায়। তিনি ছিলেন মুসলিম রাজপুত্র, যিনি ইউরোপের প্রাসাদে জীবন কাটিয়েছেন; বন্দি হয়েও তিনি হয়ে উঠেছিলেন কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর কবর প্রথমে নেপলসে হয়, পরে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তাঁর গল্প আজও এক প্রতীক কীভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব একজন মানুষকে মাতৃভূমি থেকে ছিন্ন করে নির্বাসিত যাত্রায় ঠেলে দেয়, আর ইউরোপ ও ইসলামি বিশ্বের সম্পর্ককে ছুঁয়ে যায় অদ্ভুতভাবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির চিত্র ছিল এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি। উপরিভাগে রেনেসাঁসের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল ফ্লোরেন্সে লরেঞ্জো দে' মেডিচি শিল্পী ও চিন্তাবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী আঁকছিলেন, আবার রোমে পোপ আলেকজান্ডার ষষ্ঠ ক্ষমতার জটিল খেলায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ইতালির সিসিলি আর নেপলসের প্রান্তিক

সমাজে চলছিল একেবারে ভিন্ন গল্প মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন, ধর্মীয় নিপীড়ন এবং নির্বাসন।

১৪৯২ সালে স্পেনে গ্রানাডা পতনের ঢেউ যখন ভূমধ্যসাগরে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তার প্রভাব ইতালির উপকূলেও এসে লাগল। নেপলসের রাজা ফের্দিনান্দ প্রথম রাজনৈতিক নিরাপত্তার অজুহাতে মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়কে কঠোর নজরে রাখলেন। অনেক মুসলিম পরিবারকে বাধ্য করা হলো প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে। কেউ গির্জায় মাথা নত করল, কিন্তু অন্তরে গোপনে নিজের ইসলাম আঁকড়ে রইল, হয়ে উঠল "ক্রিপ্টো-মুসলিম।"

সিসিলির ভেতরে একই সময়ে পুরনো মুসলিম বসতিগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছিল। আগের শতাব্দীতে (১৪শ শতক) লুসেরা ধ্বংস হওয়ার পর যেসব পরিবার ছড়িয়ে পড়ে টিকে ছিল, তারাও তখন আর নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুজন আলজেরিয়া বা তিউনিসের দিকে হিজরত করল, যেখানে অটোমান শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যরা গোপনে নিজেদের নাম, পোশাক আর আচরণ বদলে স্থানীয় খ্রিষ্টান সমাজের সঙ্গে মিশে গেল।

১৫শ শতকের ইতালির এই চিত্র তাই দ্বৈত রূপে ভেসে ওঠে। একদিকে ভেনিস ও ফ্লোরেন্সে শিল্প, স্থাপত্য আর নতুন জ্ঞানের প্রস্ফুটন; অন্যদিকে দক্ষিণ ইতালির প্রান্তে মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়ের ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাওয়া। রেনেসাঁসের আলো যেমন নতুন সূচনা করেছিল, তেমনি ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম উপস্থিতির শতাব্দী-প্রাচীন ইতিহাস।

চেম সুলতানের উপস্থিতি শুধু মুসলিমদের চোখেই ইতিহাসের ছাপ ফেলেনি; খ্রিষ্টান রাজনীতিকরা ও তাকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। নেপলসের রাজপ্রাসাদে, যেখানে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন পোপের সুরক্ষায়, সেখানে কোর্টের খ্রিষ্টান অভিজাতরা তার রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। তারা জানত, অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চেম সুলতান হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ড। যেমন এক অভিজাত নেপলসীয় কূটনীতিক লিখেছিলেন, "যদি আমরা চেম সুলতানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি, তবে দক্ষিণ ইতালির নিরাপত্তা এবং বাণিজ্য আমাদের হাতে শক্তি নিয়ে আসতে পারে।"

খ্রিষ্টানদের কাছে তিনি এক অদ্ভুত বিপরীতমুখী প্রতীকও ছিলেন একদিকে বন্দি, অন্যদিকে সম্ভাব্য হুমকি। তাঁর অস্তিত্ব চেপে ধরেছিল রাজকীয় কৌশলের বহু স্তর। ইতালিয় রাজা ও ডোজরা দেখেছিলেন, চেম সুলতানের আশ্রয়ে থাকা মুসলিমরা

ক্রমশ নিঃশব্দে তাদের শহর ও বন্দরে একটি প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে। সে নেটওয়ার্কে বণিক, নাবিক, শিক্ষিত ইসলামি পণ্ডিত সবাই ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ছিলেন আশা ও অহংকারের প্রতীক, কিন্তু খ্রিষ্টান রাজনীতিকদের জন্য চেম সুলতান ছিলেন পাজল, যার চলাফেরা তাদের কৌশলগত হিসেবকে বারবার পরিবর্তন করত। তিনি এক রকমের জীবন্ত স্মারক হয়ে ওঠেন যে, ইতালিয়ান রাজনীতিতে ইসলামিক বিশ্ব এখনও প্রভাবশালী এবং অবহেলা করা যায় না।

এই দ্বিপাক্ষিক প্রতিক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয় যখন বাণিজ্য ও সামরিক কৌশল জড়িত হতো। মুসলিম নাবিকরা, যাদের চোখে চেম সুলতান ছিলেন এক অর্ধজীবিত রাজপুত্র, প্রায়ই খ্রিষ্টান নৌবাহিনীর গতিপথ হিসাব করত। আবার খ্রিষ্টান কোর্টের অভিজাতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চেমের অবস্থান ও সম্ভাব্য প্রভাব যাচাই করত।

চেম সুলতানের নেপলসের প্রাসাদে বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ইতালির মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনও এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ১৪৯২ সালের পর থেকে স্পেনের গ্রানাদা বিজয়ের ফলে মুসলিমরা যখন পদে পদে বিপুল চাপে পড়ছিল, দক্ষিণ ইতালির মুসলিমরা, যারা আগে আঘলাবি বা ফাতিমিদের সময়ে দ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল তাদের জীবনও ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকে।

নেপলসের আদালতে চেম সুলতানের আশ্রয়ে থাকা মুসলিমদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, তারা প্রায়শই উচ্চ সামাজিক স্তরে এবং বিশেষ কর্মের মধ্যে নিয়োজিত ছিল। বাণিজ্যিক লেনদেন, নৌপথে পরিবহন, শিক্ষাগত কর্মকাণ্ড, এমনকি সামরিক পরামর্শে তাদের অবদান ছিল। চেম সুলতান নিজেও তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন, যদিও বাস্তবে তারা রাজনৈতিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং প্রায়শই স্থানীয় খ্রিষ্টান কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল।

এই সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় নতুন প্রকারের সামাজিক দ্বন্দ্ব। কেউ কেউ চেম সুলতানের আশ্রয়ে জীবনকে নিরাপদ মনে করলেও, অন্যেরা গ্রামের মধ্যে বা শহরের অন্যান্য অংশে ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়। বিশেষ করে ইতালির ছোট শহর ও গ্রামগুলোতে মুসলিমরা প্রায়শই পৃথক বসতি গড়ে তুলতে বাধ্য হয়

একধরনের “ক্রিপ্টো-ইসলামিক” জীবন। তারা প্রকাশ্য ধর্মীয় আচরণ এড়িয়ে চলত, নিজস্ব মসজিদ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ত, তবে গোপনভাবে ধর্মীয় চর্চা অব্যাহত রাখত।

চেম সুলতানের আশ্রয় নেপলসকে একটি অদ্ভুত কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। মুসলিম পণ্ডিতরা, শিক্ষিত বণিক, এবং চেমের ব্যক্তিগত সহকর্মীরা প্রায়শই অন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তথ্য, বাণিজ্য ও শিক্ষার আদান-প্রদান করত। এভাবে, তারা ক্রমশ একটি সুনির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা বহিরাগত হুমকি এবং চাপ সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

১৫০০-এর দশকে, যখন ইতালিতে রাজকীয় ও চার্চের নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হয়, তখন মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অনেকেই হিজরাত করে উত্তর আফ্রিকা, বিশেষ করে তিউনিস ও আলজেরিয়ায় চলে যায়। অনেকে স্থানীয় অঞ্চলে ক্রিপ্টো-ইসলাম অনুসরণ করে, যেখানে বাইরের চোখে তারা খ্রিষ্টান হিসেবে পরিচিত, কিন্তু গোপনভাবে ধর্মীয় জীবন অব্যাহত রাখে। এই প্রক্রিয়ায় ইতালির মুসলিম বসতি ক্রমশ ছোট হয়ে যায়, অনেক স্থান শুন্য হয়ে যায়।

তবে এই সংকীর্ণ সময়েও মুসলিমদের প্রভাব ও উপস্থিতি ইতিহাসে অমোচনীয়। চেম সুলতানের আশ্রয়ে থাকা এই সম্প্রদায়টি একটি উদাহরণ হয়ে ওঠে যে, কঠিন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চাপ সত্ত্বেও মানুষ তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ করতে পারে। নেপলস, পালেরমো এবং অন্যান্য উপকূলীয় শহরের বাণিজ্যিক ও শিক্ষাগত নেটওয়ার্কে মুসলিমদের অবদান সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল, যা আজও ইতিহাসের পাতায় চোখে পড়ে।

নেপলসের প্রাসাদের অন্ধকার বারান্দা থেকে সূর্যাস্তের আলো যখন ম্লান হয়ে আসে, তখন চেম সুলতানের আশ্রয়ে থাকা মুসলিমদের চোখে দেখা যায় এক নতুন বাস্তবতা। ১৫০০-এর দশকে ইতালির উপকূলীয় শহরগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। পূর্বে তারা পালেরমো, নেপলস, সিসিলি ও অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত বসতি গড়ে তুলেছিল, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু স্পেনের রেকনকুইস্তার পর ও চেম সুলতানের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপ তাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিল।

অনেক পরিবার দক্ষিণ ইতালির ছোট গ্রাম ও শহর থেকে আফ্রিকার দিকে হিজরাত শুরু করে। তিউনিস, আলজেরিয়া ও অন্যান্য উত্তর আফ্রিকান শহর তাদের নতুন আশ্রয় হয়ে ওঠে। কেউ কেউ নৌপথে যাত্রা শুরু করে, যেখানে ঝড়, দস্যু ও

অনিশ্চয়তার ভয় সত্ত্বেও তারা নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তারা নতুন বসতিতে গোপনে মসজিদ স্থাপন করে, শিক্ষকের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা চালিয়ে যায় এবং গ্রামের মধ্যে সীমিত সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

ইতালিতে যারা থাকল, তাদের জীবন ক্রিপ্টো-ইসলামিক ধাঁচে চলে। বাইরের চোখে তারা খ্রিষ্টানদের মতো আচরণ করে, কিন্তু ঘরে বা নির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের সন্তানদের নামকরণ, খাদ্যাভ্যাস এবং উৎসবের কিছু দিক শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শহরের বণিক, শিক্ষিত ব্যক্তিরা কখনো কখনো বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ক্ষমতা ধারণ করতে পারে না।

ষোড়শ শতকের দিকে ইতালির মুসলিম জনসংখ্যা নগর ও গ্রাম ভিত্তিক বসতিতে আরো হ্রাস পায়। পালেরমো, সিসিলি, সালেরনো, নেপলস যেখানে একসময় মুসলিম বণিক ও পণ্ডিতেরা প্রভাবশালী ছিল সেখানে তাদের সংখ্যা খুব কমে আসে। ধর্মীয় চাপে এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে তারা ক্রমশ নগর ও উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

তবুও তাদের উপস্থিতি ইতিহাসের পাতায় অমোচনীয়। বণিকদের নিপুণ লেনদেন, শিক্ষকেরা ছড়ানো কুরআন শিক্ষা এবং ঘরোয়া স্থাপত্যের ছোট ছোট মসজিদ সবই প্রমাণ দেয় যে মুসলিম সংস্কৃতি ইতালির সমাজে লোপ পায়নি। কিছু জাহাজ ও বন্দর, কিছু লিপি ও দলিল এগুলো সেই সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। চেম সুলতানের আশ্রয়ে থাকা সম্প্রদায়ও এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ তারা ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট সেতুবন্ধন হিসেবে আফ্রিকা ও ইতালির মধ্যকার যোগাযোগ বজায় রাখে।

যখন আমি পালেরমো বা সিসিলির পুরনো বন্দর ঘুরে দেখি, তখন সেখানে কিছু ক্ষুদ্র স্থাপত্য, পাহাড়ি পথ এবং প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। মনে হয় যেন অতীতের মুসলিম সম্প্রদায়ের কণ্ঠধ্বনি এখনও বাতাসে গাইছে বাণিজ্য, শিক্ষা, ধর্মীয় চর্চা ও প্রতিরোধের গল্প শোনাচ্ছে। তবে একই সঙ্গে প্রতিটি ধ্বংসাবশেষ আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাদের অসংখ্য সংকট, দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক যে কারণে মুসলিম সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ইতালিতে হ্রাস পেয়েছে।

এভাবে ১৬০০ শতকের দিকে, ইতালির মুসলিম জনসংখ্যা নগর ও গ্রামভিত্তিক জীবনে শুধু অল্পাংশে রয়ে যায়। তবে তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব, বাণিজ্যিক দক্ষতা

এবং শিক্ষাগত অবদান প্রমাণ করে যে, ইতিহাসের প্রতিটি সংকট ও দ্বন্দ্বের মাঝেও মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এবং পরিচয় একটি স্মৃতিসূচক শক্তি হিসেবে Italic সমাজে বিরাজমান থাকে।

ভেনিসের লবণাক্ত বাতাসে যখন মশলার ঘ্রাণ ভেসে আসত, তখন ইতালির বুকে আরেক ইতিহাস নিঃশব্দে লেখা হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টাতে মুসলিমরা আর আগের মতো মুক্ত সম্প্রদায় ছিল না, তারা ছিল দাস, বন্দি, কিংবা ধর্মান্তরিত জীবনের পথে চলা মানুষ। তাদের উপস্থিতি ইতালির মাটি ও সংস্কৃতিতে অমোচনীয় দাগ রেখে গেছে।

কৃষ্ণসাগর ও উত্তর আফ্রিকার বন্দরে বন্দরে দাসবাজারে তরুণ মুসলিমদের বেচাকেনা হতো। অনেককে জাহাজে বেঁধে আনা হতো নেপলস, জেনোভা বা সিসিলির বন্দরে। কারো ভাগ্যে জুটত জমিদারের খামারে কাজ, কারো ঠাঁই হতো প্রাসাদের রান্নাঘরে বা অভিজাত নারীর সেবায়। কিন্তু যে মুসলিমরা ছিলেন বিদ্বান চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ কিংবা আরবি কপিকারক তাদের দাম ছিল আকাশচুম্বী। কারণ, ইউরোপ তখনও জ্ঞানের আলো পেতে আরবি বই ও দর্শনের ওপর নির্ভর করছিল।

একজন আলজেরিয়ান দাস চিকিৎসককে নিয়ে আসা হয়েছিল ফ্লোরেন্সে। গৃহস্বামী তাঁকে মুক্তি দিলেন না, তবে শহরের অভিজাতরা রোগে পড়লেই তাঁর কাছে দৌড়ে আসত। রাতের অন্ধকারে তিনি কুরআনের আয়াত গুনগুন করতেন, অথচ সকালে তাঁকে দেখা যেত ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াতে। কারণ সামাজিক চাপ ও মুক্তির আশায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো পথ ছিল না।

এই সময় ভেনিস ছিল ইসলামি দুনিয়ার সঙ্গে ইতালির জানালা। মিশর, সিরিয়া ও ইস্তাম্বুল থেকে আসা বণিক জাহাজে ভরে থাকত মরিচ, দারুচিনি, তুলা, এমনকি দামি সাবান। ভেনিসের বাজারে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন মশলার ঝাঁঝালো সুবাস পেত, তেমনি আরবীয় শিল্পকলা, কারুকাজ ও স্থাপত্যশৈলীর ছাপও দেখতে পেত। ভেনিসের কাচ শিল্প কিংবা বস্ত্রকলা অনেকটাই ইসলামি কৌশল থেকে ধার করা।

একজন তরুণ ভেনিসীয় চিত্রশিল্পী রং মিশানোর নতুন কৌশল শিখেছিল দামেস্কি এক বন্দির কাছ থেকে। সে জানত না, তার হাতের রঙের রেখা একদিন ইতালির রেনেসাঁসের ক্যানভাসে ইতিহাস হয়ে যাবে। এদিকে, ইউরোপের সাধারণ মানুষ মুসলিমদের কেবল দাস কিংবা ভিন্নধর্মী হিসেবেই জানত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই সম্পর্ক ছিল অনেক জটিল। কেউ কেউ ইসলামি দর্শন পড়ত গোপনে, কেউ

লিখত ভ্রমণকাহিনি। আলেসান্দ্রো ম্যাগনো নামের এক ভ্রমণকারী কায়রোর অলিগলি ঘুরে এসে লিখেছিলেন সেখানকার বাজার, মসজিদ ও মানুষের কথা। তাঁর লেখায় ধরা পড়ে ইউরোপীয় কৌতূহল, আবার ভয়ের ছায়াও।

রোমের প্রাসাদগুলোয় হয়তো মুসলিম দাসরা ক্রুশ বহন করত, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তারা নিজের মাতৃভাষায় নিঃশব্দ ইবাদত করত। আর ভেনিসের বণিকেরা, যারা দিনে ক্রুশ আঁকা পতাকা ওড়াতো, রাতে তারা আরবি হরফে লেখা হিসাবখাতা মিলাতো।

এভাবেই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালি এক অদ্ভুত দ্বৈততায় ভরা ছিল। মুসলিমরা ছিল একদিকে নিপীড়িত দাস, অন্যদিকে জ্ঞানের বাহক ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন। তাদের পদচিহ্ন অদৃশ্য হলেও ইতালির মাটিতে আজও টিকে আছে ইসলামি প্রভাবের সেই নীরব ছাপ, যা ইউরোপের খ্রিষ্টীয় একরূপতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে চিরকাল। আবার ওই সময়ে ইতালি ও ওসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কূটনীতি এবং মাঝে মাঝে সামরিক সংঘাতের সম্পর্ক বজায় ছিল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ওসমানীদের উপস্থিতি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা ইতালিয়ান শহরগুলোর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত। মুসলিম বণিকরা এখনও সমুদ্রপথে শস্য, সোনা, সুগন্ধি ও অন্যান্য দ্রব্য আনা-নেওয়ায় সক্রিয় ছিল, এবং তাদের অভিজ্ঞতা ইতালিয়ান বন্দরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখত।

পালেরমোর বন্দর একসময় ছিল নানা ভাষা আর গন্ধের মিশ্রণে ভরা। ভোর হলে সমুদ্র থেকে ফিরে আসা নৌকাগুলোতে বোঝাই হতো শস্য, মাছ, লবণ আর কাঠ। এইসব মাল তোলার কাজে সারি সারি শ্রমিক নেমে যেত। তাদের মধ্যে একদল ছিল যাদের চেহারা আর উচ্চারণে ধরা পড়ত দূরের দেশের ছাপ। তারা আরবিতে ফিসফিস করে কথা বলত, মাঝে মাঝে গান গাইতও, কিন্তু সেই কণ্ঠ ছিল ক্লান্ত, গলা শুকনো। এরা ছিল মুসলিম বন্দি, উত্তর আফ্রিকার উপকূল থেকে আনা, যাদের দিন কাটত মাল ওঠানো নামানোর মতো কঠিন কাজে। অনেক ভ্রমণকারী তাদের দেখেছেন, আর বন্দরঘাটের কলরবের মাঝেই তাঁদের দাসত্বের গল্প লিপিবদ্ধ করেছেন।

শহরের ভেতরে অন্যরকম এক দৃশ্য ঘটত। একদিন আদালতের নথিপত্রে ধরা পড়ল, কিছু কৃষক মাঠের ধারে গোপনে নামাজ পড়ছে। বিচারকের ভাষা কঠোর, কিন্তু তবুও স্পষ্ট হয় যে তারা এখনও তাদের পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিল। এ ছিল নিষিদ্ধ আর বিপজ্জনক কাজ, তবুও তারা জানত, যদি নীরবে প্রার্থনা করেও

নেওয়া যায়, তবে স্মৃতি থেকে ধর্ম মুছে যাবে না। পালেরমোর এই ছোট ছোট গল্পগুলো জানিয়ে দেয় শক্তি দিয়ে ধর্ম ভাঙা গেলেও চেতনা মুছে দেওয়া যায়নি।

ট্রাপানি শহরে একসময় দাসের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, বাজারের চেহারাই বদলে গিয়েছিল। শত শত মুসলিম বন্দি পণ্য তুলছিল, নৌকা বেঁধে দিচ্ছিল, বা খেতে কাজ করছিল। শহরের আঙিনায় তাদের দেখা যেত সর্বত্র। তারা কখনো হাসত, কখনো নিরুপায় দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত, যেন সেই দিগন্ত থেকে একদিন তাদের মুক্তি আসবে। সৈন্যদের স্মৃতিকথায় লেখা আছে বন্দিরা প্রায়ই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত, মনে হতো তারা প্রতিশোধ বা ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

অন্যদিকে, দক্ষ হাতের কাজও তাদের জীবনকে আলাদা চিহ্নিত করত। অনেক মুসলিম বন্দি ছিলেন জেলে, জালের মেরামত জানতেন, দড়ি বাঁধতে পারতেন কিংবা জাহাজের কাঠামো ঠিক করতেন। স্থানীয় মালিকরাও জানত, তাদের হাতের কাজ ছাড়া নৌযান চলবে না। তাই যদিও তারা বন্দি, শহরের বাণিজ্যিক শ্বাসপ্রশ্বাসে তারা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

আবার কখনো মুক্তির সম্ভাবনাও এসে যেত। পালেরমোর আদালতে অনেক কাগজপত্র জমা ছিল যেখানে দেখা যেত দূরের বারবারি বা ওসমানি শাসকের কাছ থেকে আসা মুক্তিপত্র, বা মুক্তির বিনিময়ে অর্থ পাঠানো হয়েছে। তখন কিছু মানুষ দীর্ঘ দাসজীবন শেষে আবার ফিরে যেত তাদের ঘরে, আর বাকিরা থেকে যেত, নীরবে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে মিশে যেত।

এই সব গল্পে ফুটে ওঠে সতেরো শতকের সিসিলি আর পালেরমোর মুসলিমদের জীবন। তারা ছিল দাস, শ্রমিক, কারিগর, বন্দি। কিন্তু একই সঙ্গে তারা ছিল স্মৃতির বাহক। বন্দরের কোণে দাঁড়ানো, মাঠের ধারে গোপন প্রার্থনা করা, সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা, কিংবা জালের ফাঁকে হাত চালানো এসব দৃশ্য একসাথে মিলে যেন এক অব্যক্ত কাহিনি বলে যায়, যেখানে বন্দিত্বের কঠিন শৃঙ্খল ছাপিয়ে উঠে আসে মানুষের বিশ্বাস, স্মৃতি আর টিকে থাকার সংগ্রাম।

আঠারো শতকের সিসিলি তখন ইউরোপের বড় শক্তিগুলোর দাবা খেলায় এক খণ্ড ঘুঁটি মাত্র। স্পেন, সাভয়, অস্ট্রিয়া আর বোর্বন সবাই একে একে দ্বীপের মুকুট পরে আবার খুলে রাখে। কিন্তু এর ভেতরে, পালেরমো আর সিসিলির অন্যান্য শহরে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল প্রায় প্রেতের মতো কোথাও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু স্মৃতি আর চিহ্নে তারা রয়ে গেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী আগে নর্মান আর পরে আরাগোনীয় শাসনে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কেউ উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে গিয়েছিল, আর কেফবা দাসত্বে হারিয়ে গিয়েছিল। তবুও আঠারো শতকে সিসিলি ভ্রমণকারী ইউরোপীয় পর্যটকরা যখন পালেরমোর সরু গলিতে হাঁটতেন, তখন তারা এক অচেনা পরিচিতি টের পেতেন। মসজিদের মিনার ভেঙে গির্জার ঘ্নাঘর দাঁড়িয়ে আছে, বাগানের জলসেচে এখনো আরব কৌশলের ছাপ, বাজারে শোনা যায় আরবিক উৎস থেকে আসা বহু শব্দ।

১৭৮০-এর দশকে ফরাসি ও ইংরেজ ভ্রমণকারীরা লিখেছেন, পালেরমো বা ট্রাপানির কিছু পরিবারে আজও এমন লোক আছে, যাদের চেহারায় উত্তর আফ্রিকার ছাপ স্পষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি ইসলাম ধর্মে জন্মেছিল, পরে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। কেউ কেউ গোপনে আরব বংশের গল্প বলত, আবার কেউ নাম পরিবর্তন করে ইতালিয় সমাজে মিশে গিয়েছিল।

আরেকদিকে, নৌবাহিনীর ইতিহাসে মুসলিমদের স্মৃতি তখনও জীবন্ত। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম জলদস্যুরা (যাদের ইউরোপীয়রা "বারবারি করসেয়ার" বলত) প্রায়ই সিসিলির উপকূলে হানা দিত। আঠারো শতকে সিসিলির কৃষকরা গ্রীষ্মের রাতে উপকূলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে থাকত, সমুদ্রের দিক থেকে কালো পাল দেখা দিলেই আতঙ্কে গ্রাম ফাঁকা হয়ে যেত। স্থানীয়রা বলত, "তুর্কি" বা "মুর" এসেছে-যদিও তারা মূলত আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া কিংবা ত্রিপোলি থেকে আসা মুসলিম দস্যু। এদের ভয়ে বহু সিসিলিয়ান উপকূল ছেড়ে ভেতরের গ্রামে বসতি গড়ে।

তবুও সিসিলির অভিজাতরা মাঝে মাঝে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। বাণিজ্যের প্রয়োজনে পালেরমো থেকে জাহাজ যেত তিউনিস আর ত্রিপোলিতে, আর সেখান থেকে ফিরত গম, লবণ বা চামড়া। এসব লেনদেনেই কিছু মুসলিম ব্যবসায়ী সিসিলিতে আসত, আবার সপ্তাহখানেক থেকে চলে যেত। তাদের উপস্থিতি স্থায়ী না হলেও পালেরমোর বাজারে কয়েকদিনের জন্য ভিন্ন রং যোগ করত।

আঠারো শতকের শেষ দিকে ইউরোপে যখন ওরিয়েন্ট নিয়ে কৌতূহল বাড়ছিল, তখন সিসিলির মুসলিম অতীত নিয়ে নতুন আগ্রহ জেগে ওঠে। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা পালেরমোর পুরোনো আরব প্রাসাদ, বাগান আর শিলালিপি দেখে বিস্মিত হতেন। অনেকে বলতেন, সিসিলি আসলে ইউরোপের মধ্যে আরব জগতের দরজা।

আসলে মুসলিমরা তখন আর সিসিলির সমাজে বাস্তব কোনো শক্তি ছিল না, কিন্তু তাদের ছায়া মিশে গিয়েছিল শহরের দেয়ালে, ভাষার ভাঁজে আর মানুষের কল্পনায়। আঠারো শতকের সিসিলিতে মুসলিমদের ইতিহাসটা তাই উপস্থিতির নয়; বরং অনুপস্থিতির এক অদ্ভুত কাহিনি, যেখানে হারিয়ে যাওয়া এক জনগোষ্ঠীকে স্মরণ করানো হতো কেবল ভয়ের গল্পে, বাজারের শব্দে, আর ধ্বংসপ্রাপ্ত মিনারের ছায়ায়।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, উনিশ শতকে এসে ইতালিতে মুসলিমদের উপস্থিতি আবার নতুনভাবে দৃশ্যমান হতে শুরু করে। এটি কোনো বড় আকারের বসতি বা সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান ছিল না; বরং ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক, ভ্রমণ এবং শিক্ষা বিনিময়ের ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষের বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি ইতালির বিভিন্ন শহরে দেখা যায়। আগের শতকগুলোর মতো মুসলিমদের উপস্থিতি আর গোপন বা নিভৃত ছিল না; বরং ইতালির নগরজীবনের ভেতরে সীমিত হলেও একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

উনিশ শতকে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছিল এবং এই প্রেক্ষাপটে ইতালির বন্দরনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। বিশেষ করে Venice, Genoa এবং Livorno শহরগুলো ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এসব বন্দরে উসমানীয় সাম্রাজ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম নাবিক, বণিক ও দূতদের অস্থায়ী উপস্থিতি ছিল। ঐ সময়কার ইতালিয় প্রশাসনিক নথি এবং ইউরোপীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে, এসব বন্দরে মুসলিম বণিকদের ছোট ছোট বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল অবস্থান করত এবং তারা প্রধানত বস্ত্র, মসলা, চামড়া এবং কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক গবেষক Francesco Gabrieli তার ইতালিতে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক যোগাযোগের কারণে ইতালির বন্দরে মুসলিম নাবিক ও বণিকদের উপস্থিতি একটি পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। যদিও তাদের অধিকাংশই অস্থায়ীভাবে অবস্থান করত এবং স্থায়ী বসতি গড়ে তুলত না, তবুও তাদের উপস্থিতি ইতালির নগরজীবনের একটি বহিরাগত কিন্তু দৃশ্যমান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতো।

উনিশ শতকে ইউরোপ ভ্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও ইউরোপ সফরের আগ্রহ তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটে ইতালিও অনেক মুসলিম ভ্রমণকারীর গন্তব্যস্থল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পণ্ডিত এবং কূটনীতিকরা ইউরোপ সফরের সময় ইতালির বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করতেন। মিশরের বিখ্যাত চিন্তাবিদ Rifa'a al-Tahtawi ইউরোপ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে মুসলিম নাবিক ও বণিকদের উপস্থিতি ইউরোপীয় শহরগুলোতে নতুন কোনো বিষয় ছিল না, বরং এটি বাণিজ্যিক যোগাযোগের স্বাভাবিক ফলাফল। যদিও তিনি মূলত ফ্রান্সে অবস্থান করেছিলেন, তার লেখায় ইতালিসহ ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোর বর্ণনাও পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে ইতালির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান University of Bologna এবং University of Pisa-তে উত্তর আফ্রিকা ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের কিছু শিক্ষার্থী অধ্যয়নের জন্য এসেছিলেন বলে বিভিন্ন ইউরোপীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদনে উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবুও এটি ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতির একটি নতুন মাত্রা নির্দেশ করে। এসব শিক্ষার্থী সাধারণত চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন এবং ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতেন এবং অনেকেই পরে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে প্রশাসনিক বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের লেখায়ও ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Edward Augustus Freeman সিসিলির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে পালের্মো ও আশেপাশের এলাকায় মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি তখনো দৃশ্যমান ছিল এবং মাঝে মাঝে উত্তর আফ্রিকা বা উসমানীয় অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম নাবিক ও বণিকদের সেখানে দেখা যেত। তার পর্যবেক্ষণে পালের্মোর বাজার ও বন্দর এলাকায় ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন জাতির মানুষের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া উনিশ শতকে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে সিসিলির মুসলিম অতীত নিয়ে গভীর আগ্রহ তৈরি হয়। বিশেষ করে Palermo শহরের আরব-নরম্যান স্থাপত্য, প্রাচীন নগর পরিকল্পনা এবং ইসলামি শিল্পকলা নিয়ে

গবেষণা শুরু হয়। ফরাসি ইতিহাসবিদ Ernest Renan এবং জার্মান প্রাচ্যবিদ Theodor Mommsen সিসিলির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুসলিম যুগের সাংস্কৃতিক অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে সিসিলির ভাষা, কৃষি ব্যবস্থা এবং স্থাপত্যে মুসলিম সভ্যতার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগে ইতালির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মুসলিম সিসিলির বিষয়টি আরও গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ইতালিয় পণ্ডিত Michele Amari তার বিখ্যাত গ্রন্থ Storia dei Musulmani di Sicilia-তে সিসিলির মুসলিম ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করেন। তার গবেষণায় মধ্যযুগীয় মুসলিম সিসিলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয় এবং ইউরোপীয় গবেষণায় এই বিষয়টি নতুনভাবে গুরুত্ব পায়।

উপলব্ধ ঐতিহাসিক দলিল থেকে বোঝা যায় যে উনিশ শতকে ইতালিতে মুসলিমদের মোট সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল এবং অধিকাংশই অস্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তাদের উপস্থিতি মূলত বন্দরনগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের মানুষের ইতালিতে আগমন আগের শতকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য, শিক্ষা, কূটনীতি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইতালির সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে। ফলে মুসলিম উপস্থিতি আর শুধু সিসিলির মধ্যযুগীয় স্মৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং উনিশ শতকের ইতালির নগরজীবনে বিচ্ছিন্ন হলেও একটি বাস্তব ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণযোগ্য উপস্থিতি হিসেবে দেখা যায়।

১৯শ শতকের শেষ এবং ২০শ শতকের শুরুতে, ইতালির ঔপনিবেশিক আগ্রাসন উত্তর আফ্রিকা ও বলকান অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। লিবিয়া, সোমালিয়া এবং আলবেনিয়ার মতো অঞ্চল থেকে মুসলিমরা ইতালিতে অভিবাসন করতে শুরু করে। এই নতুন আগতরা ছোট হলেও এটি পুনর্নবীকৃত মুসলিম সম্প্রদায় গঠন করে। তারা বাণিজ্য, শ্রম এবং সামরিক ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা রাখে। একই সাথে সমুদ্রের ধারের শহরগুলোতে হাওয়া বইছিল এক আলাদা গল্পের। পালেরমোর আঁধারি গলিপথগুলোতে, নেপলসের ব্যস্ত বাজারে, সিসিলির উপকূলীয় ছোট ছোট ঘাঁটিতে তখনও বেঁচে ছিল সেই সীমিত মুসলিম সম্প্রদায়। তারা ছিল শহরের খণ্ডিত ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ। বাইরের চোখে তারা

খ্রিষ্টানদের মতোই আচরণ করত, তবে ঘরের মধ্যে, অজান্তে, তারা তাদের ধর্মের প্রথা পালন করত। নামাজের জন্য ছোট ছোট ঘর বা গোপন মসজিদ ব্যবহার হতো, আর সেখানে তাদের জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও সংস্কৃতি সযত্নে সংরক্ষিত থাতে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা এক জায়গায় থেমে থাকে না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবার নতুন দৃশ্যপট উন্মোচিত হলো। উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া ও সোমালিয়া, যা ইতালির উপনিবেশ ছিল একসময়-সেখান থেকে বহু মানুষ ইতালিতে অভিবাসন করল। সঙ্গে এলো মরক্কো, তিউনিশিয়া, মিশর, পাকিস্তান ও আলবেনিয়া থেকে আগত অভিবাসীর ঢেউ। তারা আবার ইতালির নগরগুলোতে মসজিদ গড়ল, বাজার বানাল, নতুন জীবন শুরু করল।

আজকের ইতালি তাই বহন করছে দুই ভিন্ন যুগের ছাপ। একদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর, নামহীন ধ্বংসাবশেষ, যা বলছে এক হারানো সম্প্রদায়ের কাহিনি; অন্যদিকে আধুনিক নগরজীবনের ভেতর আবার জেগে ওঠা মুসলিম উপস্থিতি, যা প্রমাণ করছে ইতিহাস কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না, বরং নতুন রূপে ফিরে আসে।

আমার ইতালির সফরকালীন দিনগুলোতে যখন ভেনিসের বন্দর বা নেপলির বণিক এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখি, মনে হয় যেন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেছে-একদিকে মধ্যযুগীয় মুসলিম বণিকদের জীবনের ছাপ, অন্যদিকে লিবিয়া বা আলবেনিয়া থেকে আসা নবীন মুসলিম অভিবাসীদের গল্প। তারা পুরনো সিসিলিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের নিঃসৃত ইতিহাসের সঙ্গে মিশে, আধুনিক ইতালির অর্থনীতি ও শহুরে জীবনকে ধীরে ধীরে আকার দিচ্ছে।

সিসিলি আর পালেরমোর ইতিহাস যেন ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ের মতো কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল, আর প্রতিটি ঢেউ নতুন শাসক আর নতুন সংস্কৃতির ছাপ নিয়ে আসে। একসময়ে এগুলো ছিল মুসলিমদের সমৃদ্ধ কেন্দ্র। অষ্টম শতকের শেষ থেকে আরবদের হাতে পালেরমো রূপ নেয় এক ব্যস্ত মহানগরে, যেখানে বাণিজ্য, শিল্প আর জ্ঞান বিকশিত হয়েছিল।

তারপর এলো নর্মানরা। একাদশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট গুইস্কার্ড আর রজার প্রথম ধীরে ধীরে সিসিলি দখল করলেন। মুসলিম, বাইজান্টাইন আর ল্যাটিন মিলেমিশে তৈরি হলো এক আশ্চর্য মিশ্র সংস্কৃতি। পালেরমো তখন হয়ে উঠল এক রাজকীয় রাজধানী, যেখানে মসজিদের পাশে উঠল গির্জা, আরবি আর লাতিন চিঠি পাশাপাশি লেখা হতো, আর রাজার দরবারে গ্রিক, আরব আর ল্যাটিন সবাই স্থান পেত।

কিন্তু এই স্বর্ণযুগ স্থায়ী হলো না। বারবার ক্ষমতার পালাবদল আর বাইরের আক্রমণ সিসিলিকে অস্থির করে তুলল। ত্রয়োদশ শতকে ফ্রেডেরিক দ্বিতীয়ের সময়ে আবার উজ্জ্বল হলো রাজ্য, কিন্তু তার মৃত্যুর পর হোহেনস্টাউফেন আর আনজুভিনদের দ্বন্দ্ব সিসিলিকে রক্তাক্ত করল। ১২৮২ সালের বিখ্যাত "সিসিলিয়ান ভেস্পার" বিদ্রোহে ফরাসি শাসকরা বিতাড়িত হলো, আর দ্বীপ চলে গেল আরাগোনীয়দের হাতে। ধীরে ধীরে সিসিলি স্পেনীয় মুকুটের সঙ্গে মিশে গেল, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী তার ভাগ্য নির্ধারিত হলো আইবেরিয়ান রাজনীতির ছায়ায়।

অন্যদিকে ইতালির মূল ভূখণ্ডে তখন শহররাষ্ট্রগুলো মাথা তুলছে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, মিলান। সিসিলি তাদের থেকে আলাদা রয়ে গেল, প্রায় দ্বীপের মতোই বিচ্ছিন্ন। ষোড়শ শতকে স্পেনীয় শাসনের অধীনে পালেরমো ধনী ছিল, কিন্তু স্বাধীন নয়। সময় গড়িয়ে গেল, একের পর এক ইউরোপীয় শক্তির হাত বদল হলো স্পেন, সাভয়, অস্ট্রিয়া, আবার বোর্বনরা।

উনিশ শতকে ইতালিজুড়ে যখন "রিসর্জিমেন্টো" আন্দোলন শুরু হলো, তখনই ভাগ্যেও নতুন অধ্যায় খুলল। ১৮৬০ সালে গিউসেপ্পে গারিবাল্ডি তার "থাউজ্যান্ড" সৈন্য নিয়ে সিসিলিতে অবতরণ করলেন। তিনি যেন ঝড়ের মতো এলেন, আর স্থানীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে মিলে গেল। পালেরমোর রাস্তায় তখন আবার যুদ্ধেও আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এনবার লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা আর ইতালির ঐক্য। গারিবাল্ডির বিজয়ের পর বোর্বন শাসন ভেঙে পড়ল, আর সিসিলি যুক্ত হলো পিয়েডমন্ট ও সার্ডিনিয়ার রাজ্যেও সঙ্গে, যা কিছুদিন পর হয়ে গেল 'একীভূত ইতালি'।

১৮৬১ সালে ইতালি রাজত্ব ঘোষণা করা হলো, আর সেই ঘোষণার সঙ্গে সিসিলি ও পালেরমো চিরতরে ইতালির অংশ হয়ে গেল। তবে সেই মিলন কেবল মানচিত্রে নয়, মানুষের মনে নানা দ্বন্দ্বের জন্ম দিলো। উত্তর ইতালির শিল্পায়িত শহর আর দক্ষিণের কৃষিনির্ভর সিসিলির মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট ছিল। তবুও ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সিসিলি ইতালির অঙ্গ, তার সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে আজও যেন দাঁড়িয়ে আছে এক সেতু হিসেবে আরব, নর্মান, স্পেনীয় আর ইতালিয় প্রভাবের মিশ্রণে গড়া অনন্য এক ভূমি।

“পুরনো সিসিলির পাথরগুলো ও দক্ষিণ ইতালির রাস্তাগুলোতে, মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়া ফিসফিস করে তাদের কাছে যারা হারানো অতীতকে পুনরায় আবিষ্কার করতে চায়।”

হারানো ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক হতে উনিশ শতক, ইতালিতে মুসলিমদের অবস্থান ছিল এক জটিল ও সীমিত বাস্তবতা। তারা এখানে কখনো কোনো বৃহৎ ও স্বীকৃত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেনি। ইতালির বিভিন্ন নগররাষ্ট্র ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তি, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামো মুসলিমদের জন্য কোনো বৈধ জায়গা তৈরি করেনি। ফলে মুসলিমদের উপস্থিতি মূলত বিভিন্ন বিশেষ ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল দাসত্ব ও শ্রম, ধর্মান্তরিত “নিওফাইট” সম্প্রদায়, সাময়িকভাবে আগত কূটনীতিক বা ভ্রমণকারী, এবং সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিনিময়ের ক্ষুদ্র উপাদান হিসেবে।

দাসত্ব ছিল এই সময়ে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ভূমধ্যসাগর এবং অটোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চল থেকে বন্দি করা মুসলিমদের নিয়ে আসা হতো। পাপাল রোম, টাস্কানি, ভেনিস এবং বিশেষ করে বন্দরনগরী লিভোর্নো এই প্রক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পোপের গ্যালিগুলোতে মুসলিমদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো বৈঠা চালক হিসেবে। ১৫৯১ সালে পাপাল গ্যালিতে ১৬৩ জন মুসলিম দাস বৈঠা চালক ছিল, ১৬৭৯ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১৬০ জনে। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে এই প্রবণতা আরও প্রবল হয় ১৭২৪ সালে ৩৫০ জন এবং ১৭২৬ সালে ৪৭৫ জন মুসলিম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বৈঠা চালাতে বাধ্য হয়। এটি ছিল এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, যেখানে দাসরা কোনো মানবিক স্বাধীনতা বা মর্যাদা পেত না।

লিভোর্নো এই সময়ে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সতেরো শতকে এটি দাস বাণিজ্য ও সমুদ্রবাণিজ্যের জন্য পরিচিত হয়ে ওঠে। শহরের জনসংখ্যার মধ্যে দাসদের অনুপাত ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি, এবং এর একটি বড় অংশ এসেছিল মুসলিম অঞ্চল থেকে। টাস্কানি অঞ্চলে ব্যবহৃত “তাগলিও দেল্লি স্কিয়াভি” নামে পরিচিত নথিপত্র দেখায় যে বন্দিদের মধ্যে মুসলিম ভূমি থেকে আনা মানুষের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট উচ্চ। এর ফলে লিভোর্নোকে ইতালির মধ্যে মুসলিম দাসদের উপস্থিতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র বলা যায়।

তবে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দিক থেকে মুসলিমদের উপস্থিতি কিছুটা পরোক্ষভাবে দেখা যায়। অটোমান শিল্পকলা, কারুকাজ, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ইতালিতে সংগ্রহের অংশ হয়ে ওঠে। ইতালিয় সংগ্রাহক, গ্রন্থাগার ও জাদুঘরে মুসলিম অঞ্চল থেকে আসা বহু পাণ্ডুলিপি ও নিদর্শন সংরক্ষিত ছিল। এগুলোর মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতি ইতালির অভিজাত শ্রেণির কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে সরাসরি উপস্থিতি সীমিত হলেও সংস্কৃতিগত প্রভাব একধরনের অদৃশ্য উপস্থিতি তৈরি করেছিল।

তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতালিতে মুসলিমদের অবস্থান ছিল শোষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে। আইনি সংস্কার ও গ্যালি দাসত্বের ধীরে ধীরে অবসানের ফলে অষ্টাদশ শতকের পর coercive বা জোরপূর্বক শ্রমের দিকটি কিছুটা হ্রাস পায়। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় পরিবর্তনের ফলে মানবাধিকারের ধারণাক্রমে প্রভাব বিস্তার করে, এবং এর প্রভাব ইতালিতেও অনুভূত হয়। তবে মুসলিমরা কখনোই এই অঞ্চলে স্বাধীন ধর্মীয় বা সামাজিক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

অটোমান সাম্রাজ্য ও ভেনিস প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে বৈরিতা ও সহযোগিতার এক অনন্য মিশ্রণ। ষোড়শ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত উভয় শক্তি বারবার যুদ্ধে জড়ালেও, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাদেরকে কূটনৈতিক সমঝোতা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বজায় রাখতে বাধ্য করেছিল।

ভেনিস দীর্ঘদিন ধরে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। অটোমান সাম্রাজ্য, বিশেষ করে লেভান্ত অঞ্চলের মাধ্যমে, মশলা, সিল্ক, তুলা ও বিলাসবহুল দ্রব্য ইউরোপে সরবরাহ করত। যুদ্ধকালীন বৈরিতা সত্ত্বেও, ভেনিস অটোমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করত এবং এই চুক্তিগুলো ভেনিসের অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৬৯ সালে দীর্ঘ ক্যান্ডিয়া যুদ্ধ (Crete War) শেষে ক্রীট দ্বীপ অটোমানদের দখলে চলে গেলেও, ভেনিস অটোমান বাজারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

কূটনৈতিক স্তরেও উভয় রাষ্ট্র দূতাবাস ও প্রতিনিধি বিনিময় করত। ভেনিসে অবস্থানকারী অটোমান দূতেরা প্রায়ই মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করত এবং তাদের উপস্থিতি ইতালিয় অভিজাতদের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করত। অপরদিকে, অটোমান দরবারে ভেনিসি দূতেরা চেষ্টা করত নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে। এভাবে বৈরিতা ও সহযোগিতার এক অদ্ভুত ভারসাম্য বজায় ছিল।

অটোমান-ভেনিস সম্পর্ক মুসলিম বন্দিদের উপস্থিতির সঙ্গেও যুক্ত। নৌযুদ্ধ ও জলদস্যুতার কারণে বহু মুসলিম বন্দি ভেনিসে নিয়ে আসা হতো এবং গ্যালি বৈঠা চালক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে একই সঙ্গে ভেনিসের মাধ্যমে ইউরোপীয় ও অটোমান সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার ঘটে। ফলে এই সম্পর্ককে একপাক্ষিক শত্রুতার ইতিহাস না ভেবে, জটিল পারস্পরিক নির্ভরতার ইতিহাস হিসেবে দেখা উচিত।

রোমে পোপের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে মুসলিম বন্দিদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাপাল গ্যালিগুলোতে দাস বৈঠা চালক হিসেবে তাদের ব্যবহার করা হতো, যা শুধু শ্রম নয়; বরং একধরনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতীকও ছিল। মুসলিম বন্দিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা, কঠিন পরিশ্রম করানো এবং কখনো কখনো প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া ছিল রোমান কর্তৃপক্ষের জন্য নিজেদের শক্তি ও ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের উপায়।

অনেক মুসলিম বন্দিকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হতো। তারা ধর্মান্তরিত হলে “নিওফাইট” হিসেবে পরিচিতি পেত। তবে এই রূপান্তর প্রায়ই ছিল জোরপূর্বক বা কৌশলী চাপের ফল, এবং তাদের সামাজিক অবস্থান থেকে বোঝা যেত যে তারা কখনোই পুরোপুরি সমান মর্যাদা পায়নি।

তবুও, বন্দি মুসলিমদের গল্প কেবল শোষণের নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পোপাল রোমে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমও হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে ইসলামিক বিশ্বের ভাষা, কারিগরি জ্ঞান বা প্রথার ছাপ কিছুটা হলেও ইতালিয় সমাজে পৌঁছেছিল। তবে সামগ্রিকভাবে, রোমে মুসলিমদের কাহিনি মূলত দাসত্ব, নিপীড়ন ও ধর্মীয় বৈষম্যের ইতিহাস।

লিভোর্নো (Livorno) ছিল টাস্কানির একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, যা সতেরো শতকে বিশেষ আইনি কাঠামোর মাধ্যমে ইউরোপীয় বাণিজ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৫৯৩ সালে টাস্কানির গ্র্যান্ড ডিউক ফেরদিনান্দো দে’ মেডিচি “লিভোর্নো চার্টার” (Leggi Livornine) জারি করেন। এর মাধ্যমে লিভোর্নোকে একটি “মুক্ত বন্দর” ঘোষণা করা হয়। এতে বিদেশি ব্যবসায়ী, এমনকি ইহুদি ও মুসলিমদেরও বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এই আইনি ব্যবস্থা মুসলিমদের জন্য দ্বিমুখী বাস্তবতা তৈরি করে। একদিকে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা লিভোর্নোতে এসে অস্থায়ীভাবে বাণিজ্য করতে পারত। তারা এখানে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় পণ্য মশলা, বস্ত্র, চামড়া, ধাতব দ্রব্য বিক্রি করত

এবং ইউরোপীয় দ্রব্য নিয়ে ফিরত। অন্যদিকে, বন্দি মুসলিম দাসদের জন্য লিভোর্নো ছিল এক কঠিন বাস্তবতার কেন্দ্র। শহরটি দাস বাণিজ্য ও দাসশ্রমের একটি প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

"তাগলিও দেল্লি স্কিয়াভি" (Taglio degli schiavi) নামে পরিচিত নথিতে দেখা যায়, লিভোর্নোতে আনা অনেক বন্দি ছিল মুসলিম অঞ্চল থেকে। তাদের বৈঠা চালক, শ্রমিক বা গৃহকর্মী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ফলে লিভোর্নো একদিকে মুসলিমদের বাণিজ্যিক উপস্থিতি সহজ করলেও অন্যদিকে দাসত্বের কারণে তাদের জন্য হয়ে ওঠে নিপীড়নের এক করুণ ক্ষেত্র।

তবে আইনি দিক থেকে লিভোর্নো ইউরোপীয় ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ যেখানে বিদেশি ও ভিন্নধর্মীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। মুসলিমরা এর ফলে কিছু সীমিত অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। তবুও তারা কখনোই স্থায়ী সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

ওই সময়ে ইতালিতে মুসলিমদের ধর্মান্তর ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া, যা দাসত্ব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। তারা প্রায়ই বন্দি বা দাস হিসেবে ইতালিতে এসেছিল, কখনো মুক্তির শর্তে বা সামাজিক উন্নতির আশায়। কিন্তু নতুন পরিচয় পাওয়া মানেই যে তারা সমান মর্যাদা পেত, তা নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সমাজে প্রান্তিক অবস্থায় থেকে যেত।

ফ্লোরেন্সে এই ধর্মান্তরের চিত্র বিশেষভাবে স্পষ্ট। শহরের প্যারিশ ও গির্জার রেজিস্টারে ১৬০০ থেকে ১৭২৪ সালের মধ্যে অন্তত ৩০৮টি নথিভুক্ত রয়েছে, যেখানে মুসলিম পুরুষ ও নারীকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল। পুরুষদের সংখ্যা ছিল বেশি, তবে নারীর উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এদের প্রায় সবার নামের পাশে নতুন একটি খ্রিষ্টীয় নাম যুক্ত করা হতো, যেমন "জিউসেপ্পে মারিয়া মেডিচি, আগে ছিলেন তুর্কো"-এইভাবে পুরনো পরিচয়কে খ্রিষ্টীয় নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ধর্মান্তরের পরও মুসলিম অতীতের ছায়া মুছে যেত না, বরং নতুন পরিচয়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত। কিছু রেকর্ডে জন্মস্থান ও পূর্বপেশার উল্লেখও পাওয়া যায় যেমন কেউ নাবিক, কেউ সৈনিক, আবার কেউ বন্দি হিসেবে ফ্লোরেন্সে এসেছিল। এই ব্যক্তিগত তথ্যগুলো নিওফাইটদের জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

নেপলসে চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন হলেও মূলত একই কাঠামোর মধ্যে পড়ে। ১৫৬৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ মুসলিমকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার রেকর্ড

রয়েছে। নেপলস তখন স্প্যানিশ শাসনের অধীনে ছিল, এবং জেসুইট পুরোহিতরা দাস হিসেবে আনা মুসলিমদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। আদালতেও এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায় একজন মুসলিম দাস যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তবে কি সে এখনো মালিকের দাস থাকবে, নাকি মুক্ত হবে? এই প্রশ্ন বহু আইনি মামলার জন্ম দেয়। ফলে বাপ্তিস্ম ছিল শুধু ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নয়; বরং একটি রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

নেপলসের কিছু নির্দিষ্ট কাহিনি আমাদের সামনে বিশেষ দিক উন্মোচন করে। যেমন, একজন মুসলিম বন্দি মুস্তাফা বাপ্তিস্মের পর 'বালদাসারে লোইওলা' নামে পরিচিত হয়। আবার অন্য এক ব্যক্তি বিল-ঘাইথ আল-দ্রাউই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর 'ফ্রানচেসকো মেডিচি' নামে রেকর্ডভুক্ত হয়। এই কাহিনিগুলো প্রমাণ করে যে ধর্মান্তর শুধু একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পরিবর্তন নয়; বরং সমাজের দ্বারা চাপানো এক জটিল রূপান্তর যেখানে নতুন নাম গ্রহণের পরও পুরনো পরিচয়ের ছাপ অমোচনীয় থেকে যেত।

এই দুই শহরের রেকর্ড থেকে স্পষ্ট হয় যে ধর্মান্তরের পেছনে নানা কারণ কাজ করেছিল। কেউ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইত, কেউ বিয়ে বা কাজের সুযোগ পেতে চাইত, আবার কেউ ধর্মীয় প্রভাবের অধীনে আসত। তবে যে কারণেই হোক না কেন, নিওফাইটরা সব সময়ই সমাজে একটি দ্ব্যর্থক অবস্থানে ছিল তারা মুসলিম আর নয়, কিন্তু পুরোপুরি খ্রিষ্টান সমাজের অংশ হিসেবেও গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ফ্লোরেন্স ও নেপলসের উদাহরণগুলো আমাদের দেখায় যে, ধর্মান্তরের ইতিহাস শুধু সংখ্যা বা নথির পরিসংখ্যান নয়; এটি আসলে ব্যক্তিগত সংগ্রাম, সামাজিক চাপ এবং রাজনৈতিক-ধর্মীয় শক্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

সেই সময়ের মুসলিমরা ইতালিতে বড় কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেনি, তবে তাদের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানভিত্তিক প্রভাব সেখানে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। এই প্রভাব মূলত বই, পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকর্মের সংগ্রহের মাধ্যমে ইতালিয় জগতে প্রবেশ করে। ১৭শ ও ১৮শ শতকে ইতালিয় গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও অভিজাতদের কৌতূহলী চর্চা ইসলামি জ্ঞান ও শিল্পকর্মকে গ্রহণ করে নিজেদের সাংস্কৃতিক ভান্ডার সমৃদ্ধ করে তোলে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ইসলামি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। নেপলসের Biblioteca Nazionale গ্রন্থাগারে ইসলামি জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ভান্ডার গড়ে ওঠে। এখানে বর্তমানে ১৫১টি ইসলামি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এর মধ্যে ১০১টি আরবি,

১৭টি ফারসি এবং ৩৩টি তুর্কি ভাষার। এই সংগ্রহগুলোর অধিকাংশই ১৭শ শতকে ইতালিতে প্রবেশ করেছিল, যখন ইউরোপ ও ইসলামি জগতের মধ্যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বাড়ছিল। এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে ধর্মীয় গ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ইতালিয় পাঠকদের ইসলামি বিশ্বের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সিসিলির আগ্রিজেন্তো শহরের Biblioteca Lucchesiana আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এটি ছিল একটি গির্জাভিত্তিক গ্রন্থাগার, যেখানে ১৮শ শতকের মধ্যে ৩১টি আরবি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়। এদের অধিকাংশই স্পেনিশ উৎস থেকে এসেছিল। মুসলিমদের আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ফলে অনেক ইসলামি বই ও পাণ্ডুলিপি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। লুক্কেসিয়ানা লাইব্রেরির সংগ্রহ সেই প্রক্রিয়ার এক নিদর্শন, যা ইসলামের স্প্যানিশ অতীত এবং ইতালির মধ্যে এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ তৈরি করে।

শুধু গ্রন্থাগারই নয়, ইসলামি শিল্পকর্ম ও কারুকাজও ইতালিয় সমাজে প্রবেশ করে। ১৭শ শতকে বলোনিয়ার ফের্দিনান্দো কোসপি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ইসলামি নিদর্শন যুক্ত করেছিলেন। এই সংগ্রহ ইউরোপীয়দের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বহির্বিশ্বের শিল্পকলা সম্পর্কে আগ্রহের প্রতিফলন। একইভাবে মেডিচি পরিবারও তাদের দরবারে তুর্কি ও ইসলামি শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছিল। বাণিজ্য, কূটনৈতিক উপহার এবং বিদেশি শিল্পকর্মের প্রতি "কৌতূহলপূর্ণ সংগ্রহ" প্রবণতা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফলে ইসলামি বস্তুসংস্কৃতি ইতালিয় অভিজাত জীবনের আলংকারিক অংশে জায়গা করে নেয়।

এই পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান ও সংস্কৃতি ইতালিয় পরিবেশে প্রবেশ করে। যদিও মুসলিমদের সামাজিক উপস্থিতি সীমিত ছিল, তাদের বৌদ্ধিক ও শিল্পকলা-সংক্রান্ত উপস্থিতি ইতালিয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার মাধ্যমে টিকে থাকে। এই সব নিদর্শন একদিকে ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতিকে "বিদেশি কৌতূহল" হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে ইসলামি ঐতিহ্য ইতালিয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অদ্ভুত দ্বৈত রূপে দেখা দেয় একদিকে জ্ঞান ও শিল্পের উৎস, অন্যদিকে "অন্য" হিসেবে সংগ্রহ ও প্রদর্শনের বস্তু।

একই সাথে ওই সময়গুলোতে ইতালিতে মুসলিমদের আইনি ও সামাজিক অবস্থা ছিল সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিশেষত দাসত্বে থাকা মুসলিমদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে

কোনো পূর্ণ আইনি অধিকার ছিল না। পোপাল রাজ্যের মতো অঞ্চলে, দাসদের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তর করানো হলেও তারা প্রায়শই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত না। ধর্মান্তর তাদের সামাজিক বা আইনি মর্যাদা কিছুটা উন্নত করতে পারলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা সমানাধিকার নিশ্চিত করত না। নথি ও গবেষণায় দেখা যায় যে, ধর্মান্তরিত মুসলিম দাসরাও অনেক সময় বৈঠা চালক, শ্রমিক বা গৃহকর্মী হিসেবে সেবায় বাধ্য থাকত এবং তাদের সামাজিক অবস্থান প্রান্তিক থাকত।

১৭শ এবং ১৮শ শতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন মুসলিম দাসদের অবস্থায় কিছু প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিশেষত গ্যালি দাসত্বের হ্রাস এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যেমন নাপোলিয়নিক শাসন ও ইতালির একীকরণ আইনি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়। এই সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দাসত্ব অপ্রচলিত হয়ে যায়, এবং দাসদের ওপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়। একই সময়ে, মুসলিম শক্তিগুলোর সঙ্গে ইতালির কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে নতুন বন্দি আনা ও দাসত্বে বাধ্য করার প্রথাও কমে যায়।

ভেনিসের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৭৯৭ সালে ভেনিস প্রজাতন্ত্র পতনের পর, অস্ট্রিয়ান শাসনের অধীনে আইনি সংস্কার চালু হয়। এ সময়ে দাস ও নিওফাইট মুসলিমদের ওপর শাসনের নিয়ম পরিবর্তিত হয়। দাসত্বে থাকা মুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের বাপ্তিজমের হারও কমে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিবর্তন সরাসরি সামাজিক ও আইনি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মুসলিমদের আইনি ও সামাজিক অবস্থান ছিল মূলত প্রান্তিক এবং দাসত্বের কারণে সীমাবদ্ধ। তবে শতাব্দীর শেষে রাজনৈতিক পরিবর্তন, আইন সংস্কার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি তাদের জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ধর্মান্তর কখনো কখনো অবস্থার কিছুটা উন্নতি আনলেও, শুধুমাত্র ধর্মান্তরই পূর্ণ স্বাধীনতা বা সমানাধিকার নিশ্চিত করতে পারত না। এই ইতিহাস প্রমাণ করে যে মুসলিমদের সামাজিক আইনি উপস্থিতি ইতালিতে ছিল জটিল এবং পরিবর্তনশীল, যেখানে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উনিশ শতকের মধ্যে ইতালিতে মুসলিমদের স্বতঃসিদ্ধ, সংগঠিত সম্প্রদায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে দেশজুড়ে কোনো স্থায়ী মসজিদ, বৈধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা আইনি স্বীকৃতির ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায় দেখা যেত না। পূর্ববর্তী

কয়েক শতাব্দীর মুসলিম উপস্থিতি মূলত দাস, বন্দি, বিদেশি ব্যবসায়ী, কূটনীতিক বা ভ্রমণকারীর আকারে সীমাবদ্ধ ছিল।

দাসত্ব ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের প্রথা হ্রাস পাওয়ার ফলে মুসলিমদের নতুন আগমনও কমে আসে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি সম্প্রদায়ের দৃশ্যমান উপস্থিতি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়। যেসব শহরে কখনো মুসলিম নিওফাইট বা দাসদের উপস্থিতি ছিল, সেখানে তারা সমাজের প্রধান প্রবাহের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায় বা প্রান্তিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।

ফলে ১৮শ-১৯শ শতকের প্রান্তে ইসলাম ইতালিতে প্রায় “দৃশ্যমান নয়”, সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনে মুসলিমদের উপস্থিতি খুবই সীমিত। তবে এটি পরবর্তী সময়ের জন্য একটি প্রস্তুতি ছিল। ১৯শ শতকের শেষ এবং ২০শ শতকের শুরুর অভিবাসন-প্রবাহের সময় ইসলামের নতুন ঢেউ আসে, যা ইতালিতে স্থায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের পুনরাবির্ভাব ঘটায়। তাই ১৬০০-১৯০০ সালের ইতিহাসটি বোঝায় যে, মুসলিমরা ইতালিতে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত থাকলেও, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপস্থিতি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে আধুনিক সময়ের জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

ইতালিতে মুসলিমদের উপস্থিতি নিয়ে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল সীমাবদ্ধতা হলো প্রামাণ্য সূত্রের অসম্পূর্ণতা। প্রায়শই নথিগুলো এমন ব্যতিক্রমী কেসে মনোনিবেশ করে যেমন দাস, অপরাধী, বা ধর্মান্তরিত, যার ফলে সাধারণ মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন বা সমাজে তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা বোঝা যায় না।

মুসলিম ব্যক্তিরা প্রায়শই নথিতে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত থাকেন না; তাদের উপস্থাপন ঘটে মধ্যস্থ মাধ্যমের মাধ্যমে, যেমন আদালত, গির্জা বা মালিক/দাসপ্রভুর নথি। এর ফলে তাদের নিজস্ব কণ্ঠ বা অভিজ্ঞতা উদ্ধার করা কঠিন হয়। এই ধরনের পরোক্ষ সূত্রগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা ইতিহাসে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝোঁক তৈরি করে এবং তাদের বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্য আংশিকভাবে মুছে দেয়।

১৯শ শতকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। দাসত্ব হ্রাস পায়, এবং জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান ও প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে পূর্বের ধরনের মুসলিম উপস্থিতি বন্দি, দাস বা বিদেশি কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কমে আসে। তবে এই সময়ে ক্ষুদ্র মুক্ত মুসলিম বা ছোট অভিবাসী গোষ্ঠী থাকলেও এদের জীবন ও সামাজিক অবস্থার ওপর তুলনামূলকভাবে কম গবেষণা হয়েছে। এটি একটি স্পষ্ট তথ্যগত ফাঁক, যা আধুনিক ইতিহাসবিদদের জন্য নতুন অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি করে।

ফলে, ইতিহাসচর্চায় আমরা প্রায়শই মুসলিমদের একপক্ষীয় বা সীমিত উপস্থিতি দেখতে পাই, যেখানে সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জীবনবোধ সম্পর্কে জানার সুযোগ সীমিত।

১৭০০-১৯০০ সালের ইতালির ইতিহাস মুসলিমদের উপস্থিতি কেবল বৈরিতা বা শত্রুতার প্রেক্ষাপটে নয়; বরং জটিল সামাজিক, আইনি ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝায়। এই সময়কাল দেখায় যে ইসলাম এবং মুসলিমরা খ্রিষ্টান ইউরোপে শুধু "অন্য" বা শত্রু হিসেবে উপস্থিত ছিলেন না; তারা দাস, নিওফাইট, ব্যবসায়ী, কূটনীতিক বা শিক্ষানুরাগী হিসেবে সমাজে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ধর্মান্তর, দাসত্ব, মুক্তি, কূটনৈতিক উপহার এবং বাণিজ্য এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে মানুষের পারস্পরিক সংযোগ দেখতে পাই। মুসলিমদের জীবন ও অভিজ্ঞতা, যদিও প্রায়শই সীমিত ও মধ্যস্থ মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতিফলিত, ইউরোপ ও ইসলামি বিশ্বের মধ্যে ক্রস-কালচারাল সংযোগের প্রতিফলন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইতালিয়ান গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ইসলামি পাণ্ডুলিপি এবং শিল্পকর্মের উপস্থিতি দেখায় যে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চলমান ছিল। বাণিজ্য, কূটনীতি, ধর্মীয় মিশনারি কার্যক্রম ও উপনিবেশিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান এবং শিল্পকলা ইতালিতে প্রবেশ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল। এই সময়কাল তাই ইসলাম ও মুসলিমদের ইউরোপে উপস্থিতি, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, এবং ভূমধ্যসাগরীয় জ্ঞান ও শিল্পবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট প্রদান করে।

নবম থেকে চতুর্দশ শতকের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিমদের উপস্থিতি ইতালির ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় গভীর দোলা দিয়েছিল। সিসিলি, কালাব্রিয়া, বারি, ও নেপলসের উপকূল ভেদ করে মুসলিম নৌবাহিনীর আগমন ছিল এক ভিন্ন বাস্তবতার সূচনা, যেখানে ইতালি প্রথমবার সরাসরি ইসলামি সাম্রাজ্যের সামরিক ও বৌদ্ধিক শক্তির স্পর্শ অনুভব করে। তখন ভূমধ্যসাগর ছিল মুসলিমদের শক্তি ও উদ্ভাবনের সোনালি সমুদ্রপথ, আর ইতালির উপকূল ছিল সেই আলোকিত বিশ্বের দ্বারপ্রান্ত।

কিন্তু ইতিহাস কখনো একমুখী নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার পালা বদল ঘটে। মুসলিম সিসিলির পতনের পর এবং বিশেষত পরবর্তী যুগে নর্মান, স্পেনীয় ও পরবর্তীতে পাপাল শক্তির প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে ইতালি তার নিজস্ব নতুন

পরিচয় গঠনে অগ্রসর হয়। আর যখন ইউরোপ পুনর্জাগরণের আলোকস্রোতে প্রবেশ করল, তখন ইতালি-ফ্লোরেন্স, রোম ও ভেনিসকে কেন্দ্র করে জ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সেই পুনর্জাগরণ ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইতালি এবার মুসলিম বিশ্বের দিকে ফিরে তাকায় এক নতুন চেহারায়। যে পৃথিবী একদিন তাকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করেছিল সেই ইসলামি সাম্রাজ্যের ওপরই এখন ইতালি কূটনীতি, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

এ যেন ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরে যাওয়া।

যে দিগন্ত থেকে একদা জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের আলো ইতালির দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, সেখানেই এবার ইতালি নিজেকে শক্তির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভূমধ্যসাগর আর কেবল মুসলিম শক্তির সমুদ্রপথ নয়; এটি হয়ে ওঠে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও কৌশলগত দখলের ক্ষেত্র। এই রূপান্তর শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিকও, যেখানে পরিচয়ের পাল্টা স্পন্দন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, খণ্ডিত যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ইতিহাসের চিরন্তন সত্য হলেও মানুষ, সংস্কৃতি ও জ্ঞান কোনো দেয়াল মানে না। আজকের ইতালিতে, যেখানেই মুসলিমদের বসতি, নামাজের ধ্বনি, হালাল খাবার, ইসলামি শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠন দেখা যায়, সেখানেই আমরা সেই পুরোনো ইতিহাসের সেতুবন্ধনকে আবার ফিরে পাই। যে সম্পর্ক একদিন যুদ্ধ, বিনিময়, বাণিজ্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল, তা আজ আবার মানবিক সংলাপ, পরিচয় গঠন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

ইতিহাসের এই পুনরাগমন আমাদের মনে করিয়ে দেয় সভ্যতা কখনো একপাক্ষিক নয়। কখনো মুসলিম সিসিলি আলোক ছড়িয়েছে ইতালিতে, আবার কোনো একসময় ইতালি আলো নিয়ে গেছে মুসলিম সমাজে। আর আজ তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটি নতুন প্রজন্ম, যারা অতীতের ক্ষত নয়, সংযোগ, সংলাপ ও সহযোগিতার পথকে পুনর্গঠন করতে চায়।

এই ইতিহাস তাই শেষ নয়; বরং এখনো লিখিত হচ্ছে।

"Every rediscovery sparks a dialogue, and every dialogue revives the wisdom of the past for a brighter tomorrow."

পুনর্জাগরণ ও নতুন সংলাপ

১৯১১ সালে ইতালি ত্রিপোলিতানিয়া দখল করে, যা আজকের লিবিয়া। এটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইতালির সরাসরি সংঘাতের সূচনা। এই সংঘাতের ফলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে অটোমানদের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। ১৯১২ সালের অক্টোবরে ত্রিপোলিতানিয়ার ওপর ইতালির দখল স্থায়ী হয় এবং অটোমানরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারায়। এটি শুধু অটোমানদের ভূখণ্ড হারানোই নয়; বরং ভূমধ্যসাগরীয় রাজনীতিতে তাদের শতাব্দীপ্রাচীন অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। ঠিক একই সময়ে বলকান যুদ্ধের মাধ্যমে অটোমানদের ইউরোপের মাটি থেকেও বিদায় নিতে হয়।

দেখা যায় যে, ইতিহাস যে নর্মানদের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান পরিচালনার প্রায় ৯০০ বছর পর মুসলিম বিশ্বের মাটিতে ইতালি আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ শুধুমাত্র আগ্রাসন নয়; বরং এর বিনিময় ছিল অত্যন্ত রক্তাক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, অর্থাৎ ১৯১৪ সালে, ইতালি এবং অটোমান সাম্রাজ্য উভয়ই নিরপেক্ষ ছিল। তবে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়। ১৯১৫ সালে ইতালি Entente শক্তির সঙ্গে যোগ দেয় এবং অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে উভয় দেশই বলকান অঞ্চলে জটিল সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। মেসিডোনিয়া ফ্রন্টে ইতালিয়ান ও অটোমান সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়া ভূমধ্যসাগরীয় রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তনের স্পষ্ট উদাহরণ হয়ে ওঠে।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালির প্রভাব এসব অঞ্চলে আরও সুসংহত হয়। বিশেষ করে লিবিয়ায় তারা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সামরিক ও বাণিজ্যিকভাবে দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই দখল ইতালিকে শুধু একটি ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবেই নয়; বরং মুসলিম বিশ্বে অন্যতম আগ্রাসী শক্তি হিসেবে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

অন্যদিকে বলকান অঞ্চলে, বিশেষ করে আলবেনিয়ায়, অটোমানদের দীর্ঘ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ১৪২০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৯১২ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত আলবেনিয়া ছিল অটোমান শাসনের অংশ। অটোমানরা সেখানে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে এবং ইসলামে রাষ্ট্রীয় জীবনের অংশ

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর ফলেই আলবেনিয়ায় উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যা গড়ে ওঠে, যা অটোমান উত্তাধিকারের অন্যতম স্পষ্ট চিহ্ন।

অটোমান পতনের পরও আলবেনিয়ার সমাজে তাদের প্রভাব থেকে যায়। অন্যদিকে 'বেকতাশি' সম্প্রদায়, যাদের মূল উত্থান অটোমান যুগেই, স্বাধীন আলবেনিয়াতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা পালন করতে থাকে। একই সাথে ইতালি ও আলবেনিয়া নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করে। ইতালি তার ঔপনিবেশিক শক্তি প্রসারিত করতে থাকে, আর আলবেনিয়া চেষ্টা করে নিজের জাতীয় পরিচয় এবং সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে।

এই সময়ের পরিবর্তন শুধু রাজনৈতিক সীমান্তে নয়; বরং সমাজ ও সংস্কৃতিতেও প্রতিফলিত হয়। অটোমান উত্তাধিকার ইতালি এবং আলবেনিয়ার সম্পর্কের ভেতরে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপে উপস্থিত থাকে। দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইতিহাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যা আধুনিক সময়ের তাদের পারস্পরিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১৮ সালে ইতালি সরাসরি আলবেনিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আলবেনীয়রা সেই নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়নি। ১৯২০ সালে ভূলোরা বিদ্রোহের মাধ্যমে আলবেনিয়রা ফেটে পড়ে। কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যরা একত্রিত হয়ে ইতালিয় সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। পাহাড়ি পথে, গ্রামীণ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত ইতালিয় সেনারা আলবেনিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়। আলবেনিয়ার ইতিহাসে এটি ছিল এক গর্বিত মুহূর্ত, যেখানে তারা প্রমাণ করেছিল যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অটোমান শাসনের পরও তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়নি।

তবে ইতালির সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়নি। ১৯৩৯ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, ইতালি আবারও আলবেনিয়া দখল করে। মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট শাসন এটিকে ভূমধ্যসাগরে একধরনের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে। রাজা জগ নির্বাসনে যান, আর আলবেনিয়া কার্যত ইতালির এক উপনিবেশে পরিণত হয়। কিন্তু এই দখলও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৩ সালে মুসোলিনি পতনের পর জার্মানরা দখল নেয়, আর ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত প্রভাবের ছায়ায় নতুন এক আলবেনিয়া জন্ম নেয়।

এই নতুন আলবেনিয়ার নেতৃত্বে উঠে আসেন এনভার হোক্সা। তিনি দেশটিকে একদম ভিন্ন পথে নিয়ে যান এটি কঠোর কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে, যা ধর্মকে প্রায়

সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়। মসজিদ ও চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়, ইসলামি পরিচয় গোপন হয়ে যায়, আর আলবেনিয়া পৃথিবীর প্রথম “নাস্তিক রাষ্ট্র” হিসেবে পরিচিতি পায়। মুসলিম ঐতিহ্য, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, হঠাৎ করেই রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন হতে থাকে।

ইতালি দখল, আলবেনিয়ার বিদ্রোহ, আবার দখল এবং অবশেষে এনভার হোক্সার উত্থান-সব মিলিয়ে আলবেনিয়ার ইতিহাস যেন এক নাটকের মতো। একদিকে ছিল ইসলামের উত্তরাধিকার, অটোমানদের রেখে যাওয়া গভীর সংস্কৃতি, আর অন্যদিকে ছিল ইউরোপীয় শক্তির চাপ ও নিজেদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ইতালির পদচিহ্ন আজও আলবেনিয়ার উপকূলে, ভ্লোরা বা ডুরেসের পুরনো স্থাপনায় দেখা যায়। আর হোক্সার সময়ের কঠোর শাসন এখনও মানুষের স্মৃতিতে তাজা।

এই সমগ্র কাহিনি ভূমধ্যসাগরের দুই প্রান্তের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। সিসিলি থেকে শুরু করে আলবেনিয়া পর্যন্ত ইতালির দৃষ্টি সব সময়ই গিয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত ভূমির দিকে। কিন্তু আলবেনিয়া বারবার প্রমাণ করেছে, দখল স্থায়ী হয় না মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ইতিহাসের শেষ কথা বলে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইতালি যখন লিবিয়া দখল করে, তখন থেকেই মুসলিমদের নতুনভাবে ইতালিতে আগমন শুরু হয়। উপনিবেশ শাসনের কারণে কিছু লিবিয়ান মুসলিম প্রশাসনিক কাজ, সামরিক সংযোগ বা শ্রমের জন্য ইতালিতে প্রবেশ করেছিল। সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না, তবে এই আগমন ছিল আধুনিক সময়ে মুসলিমদের প্রথম পদচিহ্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ যখন ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্গঠনে ব্যস্ত, ইতালিও শ্রমশক্তির তীব্র সংকটে পড়ে। সেই সময় উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো ও মিশর থেকে ধীরে ধীরে শ্রমিকেরা ইতালিতে আসতে শুরু করে। এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ইতালির কৃষি অঞ্চলে কাজ করত। সিসিলি, নেপলস ও উপকূলীয় এলাকাগুলোতে মৌসুমি কৃষিকাজের জন্য তাদের উপস্থিতি ছিল স্পষ্ট।

ষাটের দশকে এই প্রবাহ আরও দৃশ্যমান হয়। ইতালির শিল্পায়নের প্রসার ঘটে, আর শ্রমিক চাহিদা বেড়ে যায়। উত্তর আফ্রিকার মুসলিমরা এবার শুধু কৃষিকাজে নয়, কারখানা, নির্মাণশিল্প ও ছোটখাটো ব্যবসাতেও যুক্ত হতে শুরু করে। এ সময় মুসলিমদের বসতি গড়ে ওঠে প্রধানত রোম ও মিলানে।

সত্তরের দশক থেকে ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতি আরও বহুমুখী রূপ নেয়। এবার শুধু উত্তর আফ্রিকা নয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকেও অভিবাসীরা আসতে শুরু করে। সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক সোমালি মুসলিম ইতালিতে আশ্রয় নেয়। শহরগুলিতে শ্রমিক বসতি গড়ে ওঠে, বিশেষত রোম, মিলান, তুরিন, বলনিয়া ও পালেরমোতে। এই সময় ছোট ছোট সাংস্কৃতিক সংগঠনও তৈরি হতে থাকে, যদিও আনুষ্ঠানিক মসজিদের অস্তিত্ব তখনও সীমিত ছিল।

আশির দশকে মুসলিম আগমন আরও তীব্র হয়। মধ্যপ্রাচ্যেও দেশ যেমন সিরিয়া ও লেবানন থেকেও ইতালিতে মানুষ আসতে শুরু করে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও নিরাপত্তার কারণে ইতালি অভিবাসীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে ওঠে। এসকল অভিবাসীরা শ্রমিক হিসেবেই নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। এ সময় ধীরে মসজিদ বা নামাজঘর তৈরি হয়, প্রায়শই সাধারণ অ্যাপার্টমেন্ট বা ভাড়া করা ভবনে।

১৯৯০-এর দশকে পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায়। ১৯৯১ সালে আলবেনিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পতনের সময় হাজার হাজার আলবেনীয় মুসলিম নৌকা ও জাহাজে করে ইতালির উপকূলে পৌঁছায়। হঠাৎ করেই ইতালির দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে আনকোনা, পুগলিয়া ও কালাব্রিয়ার উপকূলীয় শহরগুলোতে অভিবাসীদের ঢল নামে। এই সময় ইতালি মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। আলবেনীয় মুসলিমরা পরবর্তীকালে শ্রমবাজারে যুক্ত হয়ে শহুরে জীবনে নিজেদের জায়গা করে নেয়।

ধীরে ধীরে মুসলিমদের উপস্থিতি শুধু শ্রমিক শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ও একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে থাকে। তখন রোম, মিলান, তুরিন ও বোলোনিয়ার মতো শহরে ছোট ছোট মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মুসলিম অভিবাসীরা তাদের প্রজন্মকে ইতালিয় শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে, ফলে নতুন প্রজন্ম ইতালিয় ভাষা ও সমাজের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

এভাবে দেখা যায়, লিবিয়া থেকে সীমিত সংখ্যায় শুরু হওয়া অভিবাসন কয়েক দশকের মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে এক ধারাবাহিক প্রবাহে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি মুসলিম অভিবাসীদের এটি

স্থায়ী আবাসস্থল হয়ে ওঠে, যা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

আনকোনার ইয়েসি শহর দেখতে শান্ত, পাহাড় আর আঙুরের বাগান দিয়ে ঘেরা। চারপাশে ইতালির পুরনো গির্জা, ছোট ছোট দোকান, পাথরের রাস্তা। নব্বইয়ের দশকে এখানে এসে বসবাস শুরু করে মিজান, ইমরান, ইয়াসিন আর হামজা। প্রত্যেকের গল্প ভিন্ন, কিন্তু বাস্তবতায় মিল তারা সবাই কষ্টের তলদেশ থেকে উঠে এসেছে, বাঁচার জন্য, বাঁচানোর জন্য।

মিজান, বাংলাদেশের মাদারীপুরের ছেলে। শৈশবেই বাবাকে হারিয়েছে, মা একা হাতে সংসার সামলেছেন। গ্রামে কাজ না পেয়ে স্বপ্ন দেখেছিল ইউরোপ যাওয়ার। ধাপে ধাপে পা ফেলেছে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া, তারপর ইউক্রেন, হেঁটে, ট্রেনে, কখনো লুকিয়ে, কখনো ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে। শেষমেশ ইতালির সীমান্তে ঢোকার আগে দুবার পুলিশ ধরেছিল। সে বলত, “যদি একবার ফিরিয়ে দেয়, আবার চেষ্টা করব। কারণ বাড়িতে ফিরে গেলে মা কী খাবে?”

ইমরান, পাকিস্তানের গুজরানওয়ালার। দারিদ্র্য আর রাজনৈতিক অস্থিরতা তার পরিবারকে গিলে খাচ্ছিল। কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ইরান হয়ে তুরস্ক, গ্রিস, তারপর বলকান রুট পেরিয়ে ইতালি। পথে একবার পাহাড় থেকে পড়ে পা ভেঙেছিল, মাসের পর মাস ঠিক মতো হাঁটতে পারেনি। এখন ইয়েসিতে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে রাতের শিফটে কাজ করে। বলে, “যন্ত্রের শব্দে কান ব্যথা করে, তবুও বেতন হাতে আসার পর মনে হয় বেঁচে আছি।”

ইয়াসিন, মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কা শহরের। দারিদ্র্য নয়; বরং স্বপ্ন তাকে টেনে এনেছে। ইউরোপ মানেই ছিল সুযোগ। সেউটা সীমান্ত পেরোনোর সময় সৈন্যরা ধাওয়া করেছিল। কারও সাহায্য ছাড়া রাতের অন্ধকারে তার কাঁটাতার টপকে আসা-শরীর ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে থামেনি। এখন ইয়েসিতে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করে। মাঝে মাঝে সে বলে, “মরক্কোয় থেকে গেলে হয়তো বাঁচতাম, কিন্তু কিছু অর্জন করতাম না। এখানে আমি কিছু গড়তে চাই।”

হামজা, তিউনিসিয়ার উপকূল থেকে ছোট্ট নৌকায় ভেসে উঠেছিল লিবিয়ার সাগর পথে। ভিড়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া ছেলেটির চোখ আজও তাকে তাড়া করে। সে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু বাঁচার দায় আজীবনের মতো বুকের ভেতর বহন করছে। এখন ইয়েসিতে গুদামে কাজ পায়, দিনে ১২ ঘণ্টা। অনেক রাতে তার চোখ ভিজে

ওঠে "আমি কেন বেঁচে আছি আর ও কেন সমুদ্রে ডুবে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর নেই।"

ইয়েসির স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও বেশ বহু বিদেশি এখানে বসবাস করে। একেক জন একেকভাবে তাদের নিয়েছে। কাজ খুঁজতে গেলে অনেকেই বলত, "আমাদের শহরে কাজ কম, তোমরা অন্য কোথাও যাও।" বাড়ি ভাড়া নিতে গেলেও মালিকেরা দ্বিধায় থাকত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান বদলাতে শুরু করল। রেস্টুরেন্টে কাজ করা ইয়াসিন গ্রাহকদের ভরসা জিতল তার পরিশ্রম আর আন্তরিকতায়। মিজান শহরের নিকটস্থ এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়ে গেল। তখন স্বপ্ন দেশে যাবে, একটা বিবাহ করবে আর বউকে সাথে নিয়ে আসবে।

ইমরান ফ্যাক্টরির ইতালিয়ান সহকর্মীদের সাথে ফুটবল খেলতে শুরু করল। মাঠে ঘাম ঝরানোর পর একসাথে কফি খেতে খেতে তাদের মধ্যকার ভিন্নতা একটু একটু করে কমতে লাগল। হামজা শহরের পাশ্ববর্তী একটা মুরগির ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়ে গেল।

তবুও সমস্যার শেষ নেই। কাগজপত্রের জটিলতা, কাজের অস্থিরতা, বৈষম্যের দৃষ্টি প্রতিদিন তাদের ছায়ার মতো তাড়া করে। কিন্তু এই বাস্তবতাই তাদের নতুন করে লড়তে শেখাচ্ছে। তারা বুঝে গেছে এটা শুধু বেঁচে থাকার লড়াই নয়; বরং সম্মান আর পরিচয়ের জন্য সংগ্রাম।

ইয়েসির রাতগুলোতে চারজন মাঝে মাঝে একসাথে বসে। কেউ গান শোনায়, কেউ বাড়ির গল্প বলে। দূরের আকাশে যখন তারা জ্বলে ওঠে, তখন তাদের মনে হয় দীর্ঘ পথের কষ্ট, সাগরের ঢেউ, কাঁটাতারের ক্ষত সবই যেন নতুন জীবনের বিনিময়মূল্য। তারা স্বপ্ন দেখে, একদিন এই শহরই তাদের নিজের হবে, যেখানে তারা আর "বিদেশি" থাকবে না, বরং সমাজের অংশ হয়ে যাবে। আজ তারা সকলে এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। মিজান নিজের নামে বাড়ি কিনেছে। গল্পটি ১৯৯৬ সালের।

আশির দশকের শেষ দিকে যখন বিভিন্ন দেশ হতে ইতালিতে অভিবাসীদের আসা শুরু হয়। বাংলাদেশ হতে ইতালিতে আসা তাদের একজন সালেহ উদ্দিন। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার নদনা ইউনিয়নের বাসিন্দা। বর্তমানে অবসরে আছেন। একটা মেটাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। পরিবার পরিজন ও

সন্তানসহ নাতি-পুতিদের নিয়ে জীবনযাপন করছেন। তিনি লন্ডনের একটা রেস্তরায় বসে তার জীবনের ইতিহাস শুনান।

বাংলাদেশ হতে সর্বপ্রথম সরাসরি ফ্লাইটে রাশিয়ার মস্কোতে যান। তখন মস্কো ছিল ইউরোপে অভিবাসীদের অন্যতম নিরাপদ রুট। সেখানে কয়েক ঘণ্টার ট্রানজিটের পর সরাসরি ফ্লাইটে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অন্যতম ছোট দেশ মাল্টায় এসে উড়োজাহাজ অবতরণ করে। এবার সেখানে এক দীর্ঘ যাত্রা। অপেক্ষা, কবে ডাক পড়বে। ঠিক একদিন মাঝ রাতে পাকিস্তানি এক দালাল তাদের ক্যাম্পে গিয়ে ডাক মারে "বের হয়ে পড়ো, উঠো–এখনই বের হতে হবে।" এতদিন ধরে এই ডাকটিরই অপেক্ষায় ছিলাম। হেঁটে হেঁটে শহরের এক প্রান্তে গিয়ে স্পিডবোটে চড়ে বসি। সেখানে আমার সাথে আরও সাতজন।

দালাল বলল, "রাত আরেকটু গভীর হোক, একটু অপেক্ষা করো।" আরও দুই ঘণ্টা এখানে স্পিডবোটে বসে থাকার পর এক সাদা মাঝ বয়সী লোককে দেখলাম ওই পাকস্তানি দালালের সাথে কি বলাবলি করতে। ভাষা বুঝি না। যাই হোক, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এবার সেই লোকটি তার স্পিডবোট স্ট্রার্ট দিলো। সমুদ্রের গর্জন, পানির ঢেউ ওপরে নীল আকাশ এরই মাঝে আমরা ভোরবেলায় যখন আধাঘুমে চোখ মেললাম তখন দেখলাম পাহাড় আর সবুজের এক ঘন সৈকত। ড্রাইভার খুব সতর্কভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে তীরে গিয়ে আমাদের ছোট জ্বলযান ভিড়ালো। লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়লাম। কোমর হাঁটু পরিমাণ পানিতে ভিজতে ভিজতে তীরে উঠে গেলাম। পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের দেশ ইতালিতে।

সেদিন ছিল রবিবার। ভোর তখন পাঁচটা হবে। অজানা ও অচেনা পথে রাস্তা ধরে হাঁটছি। একটু পর জঙ্গলের পাশ থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। ভয়ে আঁতকে উঠি। কুকুরের অবিরাম ঘেউ ঘেউ শব্দে কিছুক্ষণ পর পুলিশের এক টহল গাড়ি এলো। কিছু না বলে আমাদের মধ্য হতে দুজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে একটা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেল। আটজন হতে এখন আমরা দুজন। বাকিরা কোথায় বা কীভাবে আছে কিছুই জানি না। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করার পর একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল যে "তোমাদের ভিসার মেয়াদ পনেরো দিন। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের দেশে ফেরত পাঠাব"–এই বলে একটা রুমে ডেকে নিল। সেখানে গিয়ে দেখি যে বাকি আরও ছয়জন। যেই আটজন কয়েক ঘণ্টার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম, তাদের আবার ফেরত পেলাম।

তিনি জানান, “ইতালিতে তখনও ইউরো চালু হয়নি। তখনকার মুদ্রাকে লিরা বলা হতো। আমাদের হাত খরচের জন্য রাশিয়া হতে কয়েক শ লিরা বানিয়ে নিই। কোনো একজন বলল যে, এখান হতে তোমরা ট্রেনে রাগুসা (যে শহরের কথা আগে আলোচনা করেছি) চলে যাও। তারপর সেখান হতে ট্রেনে যেদিকে যেতে চাও সেদিকে যেতে পারবে। আমাদের সকলের গন্তব্য রোম। রাগুসা হতে ট্রেনে সবাই রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হই। প্রায় ছয় ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। রোম গিয়ে ‘রুপসি-বাংলা’ হোটেলে উঠি। এরপরের আরেক যাত্রা।”

ওপরের গল্পটি যদিও একজন, কিন্তু বলা যায় অধিকাংশ অভিবাসীদের গল্প অনেকটা এমন। কারও গল্প হয়তো আরও করুন ও নির্মম।

সিসিলির মাজারা দেল ভাল্লোর একাদশ শতাব্দীর ক্যাথেড্রালের প্রবেশমুখে আজও দাঁড়িয়ে আছে একটি ভাস্কর্য নর্মান রাজপুত্র রজার প্রথম, হাতে তলোয়ার, মনে হচ্ছে তিনি মুসলিমদের সিসিলি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ষোড়শ শতকে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি ছিল মুসলিম বিজয়ের অবসান এবং ইউরোপের খ্রিষ্টীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক প্রতীক। কিন্তু একই সঙ্গে এটি ছিল একধরনের সতর্কবার্তা যদি মুসলিমরা কখনো ফিরে আসে, তবে তাদের ভাগ্য কী হতে পারে।

নয় শ বছর পর, ইসলাম আবার ফিরেছে ইতালিতে, তবে যুদ্ধের পতাকা নয়, জীবিকার আশায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার দরিদ্র ও বেকার যুবকেরা এখন ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছাচ্ছে, কেউ কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক, কেউ রাস্তার দোকানি, কেউ উচ্চশিক্ষার্থী। তারা বিজেতা নয়; বরং শ্রম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহক।

সিসিলির মাজারা দেল ভাল্লো আজও ইতালির “সবচেয়ে আরব শহর” বলে পরিচিত। এখানেই নবম শতকে প্রথম মুসলিম সৈন্যরা অবতরণ করেছিল, এখানেই নর্মানরা তাদের শেষ দুর্গ জয় করে, এবং এখানেই ১৯৬০-এর দশকে আধুনিক যুগের প্রথম মুসলিম অভিবাসীরা এসে পৌঁছায়। শহরের সরু গলি ও অঙ্গনগুলো আজও বহন করে সেই আরব স্থাপত্যের ছাপ। প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ, এখানে বসবাস করছে। তাদের সন্তানরা স্থানীয় স্কুলে পড়ে, তারা মাছ ধরার ব্যবসা ও ছোট দোকান চালায়। একপাশে তিউনিসীয় শিক্ষক পরিচালিত আরবি স্কুল, অন্য পাশে কুসকুসের রেস্তোরাঁ পিৎজারিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এ যেন এক শান্ত সহাবস্থানের প্রতীক।

তবুও শহরের প্রধান সড়ক থেকে কিছু দূরেই সেই নর্মান ভাস্কর্য আজও রজারের তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে আছে। এই দুটি প্রতীক ভাস্কর্য ও মসজিদ ইতালির মুসলিমদের প্রতি সমাজের দ্বৈত মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। একদিকে সহাবস্থানের আশা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক সন্দেহ ও প্রতিরোধ।

১৯৯৫ সালে রোমে উদ্বোধন করা হয় ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ ভ্যাটিকান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে, নগর সরকারের দানকৃত জমিতে, সৌদি আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশের অর্থায়নে নির্মিত এই বিশাল স্থাপনা আজ ইতালিতে ইসলামের স্থায়ী উপস্থিতির প্রতীক। কিন্তু ক্লদিও হোল্‌জনার সতর্ক করেছিলেন এই মসজিদের আড়ালে যে সহিষ্ণুতার বার্তা লুকানো, তার বিপরীতে রজারের ভাস্কর্যের দৃষ্টি এখনও অনেক ইতালিয়ের মনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯৯০-এর দশকের ইতালিতে মুসলিম অভিবাসীদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম প্রায় আট লাখের মতো। কিন্তু সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাদের দৃশ্যমানতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে অসহিষ্ণুতা ও জেনোফোবিয়া। ডানপন্থি ও নব্য-ফ্যাসিবাদী দলগুলো অভিবাসীবিরোধী প্রচারে বিপুল সাফল্য পায়। এক জরিপে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালে যেখানে ৫০% ইতালিয় মনে করত দেশে-বিদেশি বেশি, ১৯৯১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৫%।

অন্যদিকে মুসলিমদেরর ছিল সীমাহীন অনিশ্চয়তা-বেকারত্ব, নিম্নমানের বাসস্থান, ও সামাজিক অবহেলা। অনেকেই গ্যারেজ, পরিত্যক্ত ভবন বা চার্চের বেজমেন্টে ছোট ছোট নামাজঘর স্থাপন করে। এই মসজিদগুলো শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র নয়, ছিল সম্প্রদায় গঠনের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৯০ সালের অ্যামনেস্টি আইন প্রায় দেড় লক্ষ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দেয়। এর ফলেই ইতালিতে কিছু মসজিদ ও ইসলামি স্কুল, এবং হালাল দোকান দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সমাজের প্রান্ত থেকে তারা ক্রমে দৃশ্যমান হতে থাকে, যা ইতালিয় নীতিনির্ধারকদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়।

কিন্তু মুসলিমদের সংগঠিত উপস্থিতি অনেক ইতালিয়ের মনে নতুন আশঙ্কা জাগায় “ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম” ছড়িয়ে পড়বে, রোমের মসজিদ “ইউরোপে ইসলামের সদর দফতর” হয়ে উঠবে এমন মন্তব্য করেছিলেন নর্দার্ন লিগ নেতা

জুলিও ফেরারি। এমনকি এক ক্যাথলিক সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, “পোপ নিশ্চয়ই খুশি নন যে, ঈশ্বরের শহরে এখন খ্রিষ্টধর্মের শত্রুরা আশ্রয় পেয়েছে।”

তবুও হোল্‌জনার আশার এক আলোকরেখাও দেখেছিলেন বেশ কিছু ক্যাথলিক সংগঠন মুসলিম অভিবাসীদের জন্য খাবার, আশ্রয় ও আইনগত সহায়তা প্রদান করে মানবিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। নেপলসের কাছে ভিলা লিতেরনো শহরে এক ক্যাথলিক পুরোহিত একাই হাজারো আফ্রিকান শ্রমিকের আইনগত প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন।

হোল্‌জনার তাঁর প্রবন্ধের শেষে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তা আজও সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে:

“ইতালির সরকার ও নাগরিকদের বুঝতে হবে ইসলাম এখন ইতালিয় সমাজের স্থায়ী অংশ। কেবল এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সমাধানের পথ খোঁজা সম্ভব, বিরোধিতা করে নয়।”

আজ চার দশক পর, ইতালিতে মুসলিমের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় মিলিয়নের কাছাকাছি। সেই পুরনো ভাস্কর্য হয়তো এখনো রজারের তলোয়ার উঁচিয়ে আছে, কিন্তু রোমের মসজিদের মিনার আজ সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। দুই প্রতীকের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ইতালি যেখানে ইসলাম আর বাইরের কোনো আগন্তুক নয়; বরং এক নতুন নাগরিক বাস্তবতার অংশ। রোমে গিয়ে আমি আরও বড় প্রতীক দেখলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের অন্যতম বড় মসজিদ ভ্যাটিকানের কাছাকাছি, বিশাল জমিতে। ১৬টি গম্বুজ, ১৩০ ফুট উঁচু মিনার, আর ৫০ মিলিয়ন ডলার খরচে নির্মাণ। অর্থ এসেছে সৌদি আরব ও আরও কয়েকটি মুসলিম দেশ থেকে। সেই মসজিদে যখন ঢুকলাম, মনে হলো এ যেন ঘোষণা করছে ইসলাম ইতালিতে স্থায়ী হয়ে গেছে। কিন্তু মনের ভেতর অদ্ভুত দ্বন্দ্ব কাজ করছিল: একদিকে রোমের মসজিদ বৈচিত্র্যের প্রতীক, অন্যদিকে মাজারার ভাস্কর্য প্রত্যাখ্যানের প্রতীক।

আজ ইতালির পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় মুসলিমদের জীবনের বাস্তবতা। মুসলিমদের বড় একটা অংশ এখনো ভ্রাম্যমাণ-এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে কাজ খোঁজে, কেউ টমেটো মৌসুমে দক্ষিণে আসে, কেউ রোমের রাস্তায় ব্যবসা

করে। আবার কেউ আনকোনা, রিমিনি, বারি ও ভেনিসের সৈকতের বুকে ফেরি করে। আমি এমনও দেখেছি, কয়েকশ মানুষ এক বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকে। তুরিনে শুনলাম ১২০ জন সেনেগালি অভিবাসী দশ কক্ষের ঘরে থাকে। রোমে একটি খালি ভবনে কয়েক হাজার মানুষ রাত কাটায়। যদিও এই দৃশ্য নব্বই দশকের।

সরকার অনেক দেরিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। একবার দেখলাম রোমের কর্তৃপক্ষ অভিবাসীদের একটা ভাঙা ভবন থেকে উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেনি। ফলে তারা পরের দিনই হাজির হলো রেলস্টেশনের টানেলে কিংবা অন্য খালি জায়গায়। তবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে লাগল। ১৯৯০ সালের ক্ষমা আইন অনেক কে অবাক করেছিল। প্রায় দেড় লাখ অবৈধ অভিবাসী বৈধতা পেল, কাজ, স্বাস্থ্যসেবা, এমনকি বাসস্থানের অধিকার। এর প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে। নতুন মসজিদ গড়ে উঠছে, হালাল দোকান ছড়িয়ে পড়ছে, আর কুরআনিক স্কুল খোলা হয়েছে নানা শহরে।

ভবিষ্যতের পথ সহজ নয়। দক্ষিণের দারিদ্র্য আর উত্তরের সমৃদ্ধি যতদিন থাকবে, অভিবাসনের ঢল থামবে না। আমি রাস্তায় হেঁটে দেখেছি তাদের চোখের দৃষ্টি অপেক্ষা, দৃঢ়তা, বাঁচার তাগিদ। তারা যে করেই হোক উত্তরমুখী হবে। তাই ইতালির সামনে একমাত্র সমাধান হলো মুসলিমদের স্থায়ী অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। মসজিদের গম্বুজ আর রজারের ভাস্কর্য এই দুই প্রতীক আমার মনে একসাথে বাজতে লাগল। ইতিহাস হয়তো কঠিন, কিন্তু সহাবস্থান ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

ইতালির রাস্তায় যখন ভোর নামে, মিলান কিংবা রোমের কোনো স্কুলের করিডোরে দাঁড়িয়ে মুসলিম তরুণরা হয়তো অনুভব করে এক অদৃশ্য টানাপোড়েন। একদিকে তারা নিজেদের বাবা-মায়ের উল্টরাধিকারসূত্রে পাওয়া ইসলামি বিশ্বাস ধরে রাখতে চায়, অন্যদিকে চারপাশের ইতালিয় সমাজের রীতিনীতি, অভ্যাস, এমনকি পোশাক তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এটি কেবল বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নয়; ভেতরের গভীর প্রশ্নও "আমি আসলে কে?"

এই দ্বন্দ্বের জন্ম হয়েছে এক দীর্ঘ প্রবাসী জীবনের বাস্তবতা থেকে। প্রথম প্রজন্মের মুসলিম অভিবাসীরা যখন ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে ইতালিতে কাজের সন্ধানে আসে, তাদের চোখে ভাসতো কেবল টিকে থাকার লড়াই। কৃষি, নির্মাণ বা হোটেল যেখানেই হোক কাজ পেয়ে তারা পরিবারকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম, যারা ইতালিতে জন্মেছে বা ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে, তাদের সামনে প্রশ্নটা অন্যরকম। তারা কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, নিজেদের পরিচয়ের জন্য লড়ছে।

বিশ্বাসের জায়গাটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায়, তরুণ মুসলিমরা ধর্মীয় আচার যেমন নামাজ, রোজা বা হালাল খাদ্য নিয়ে বাবা-মায়ের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন। কারণ তারা বুঝতে পারে, এই বিশ্বাসই তাদেরকে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে দেয়। কিন্তু সেই আলাদা হওয়াটাই কখনো কখনো কষ্টের কারণ হয়। ক্লাসরুমে সহপাঠীদের ঠাট্টা, চাকরির সাক্ষাৎকারে নাম বা হিজাবের কারণে প্রশ্ন-এসব তাদের মানসিকতাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

অর্জনের জায়গাটা বা belonging এখানে ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। ইতালির নাগরিক হিসেবে তারা নিজেকে ইউরোপীয় বলে ভাবতে চায়, কিন্তু প্রায়ই মনে হয় সমাজ তাদের পুরোপুরি গ্রহণ করছে না। অনেকেই তাই দ্বৈত পরিচয় নিয়ে বাঁচতে শেখে বাড়িতে মুসলিম, বাইরে ইতালিয়ান। কেউ কেউ আবার মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়, যেখানে তারা ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলো ধরে রাখে কিন্তু সামাজিকভাবে ইতালিয়ান রীতি-নীতি মেনে চলে।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেও কিছু ইতিবাচক দিক আছে। নতুন প্রজন্ম নিজেদের সংগঠন, মসজিদ ও সাংস্কৃতিক ক্লাব গড়ে তুলছে। তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, ছেলেরা স্থানীয় খেলাধুলা ও রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে। এর ফলে বিশ্বাস ও অর্জনের টানাপোড়েন এক নতুন শক্তিতে রূপ নিচ্ছে যেখানে তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় ধরে রেখে ইতালির সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চাইছে।

কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ নয়। অনেক তরুণীর মুখে শোনা যায় এই আক্ষেপ "আমাদের ওপর সব সময় প্রমাণ করার চাপ থাকে। আমরা যেন ইতালিয়ান

সমাজে বলি, হ্যাঁ, আমরা মুসলিম, কিন্তু আমরা তোমাদের অংশ।" এই দোটানা তাদের ভেতরে বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে আরও বাড়ায়, যদিও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সব সময় সহজে আসে না।

তাহলে কি সমাধান? হয়তো এই প্রজন্মের মধ্যেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে। তারা একদিকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরছে, অন্যদিকে নতুন ইতালিয়ান বাস্তবতার ভেতর নিজেদের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। সেই টানাপোড়েনই হয়তো ভবিষ্যতের ইতালিয় মুসলিম সমাজকে গড়ে তুলবে।

অনেক তরুণ-তরুনীরা মনে করে মুসলিম এখানে শুধু সংখ্যালঘু নয়; বরং বহুমাত্রিক পরিচয়ের ভার নিয়ে বেঁচে ইতালিয়ান। বিশেষ করে তরুণ মুসলিম নারীরা হিজাব পরার কারণে জনপরিসরে সহজেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠেন। এ দৃশ্যমানতাই তাদের প্রায়শই বৈষম্য বা কক্তর শিকার করে। দুই দশক আগে, অনেক সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচিত কারও কণ্ঠে তারা শুনে, "তোমরা অন্য দেশে ফিরে যাও।" অথচ এসব তরুণীরা জন্ম থেকেই ইতালিয় নাগরিক, তাদের শিকড় ইতালির মাটিতেই রোপিত।

পরিবারের ভেতর তাদের জীবন ভিন্ন ছন্দে চলে। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী পরিবারগুলো ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আঁকড়ে রাখে। বাবা-মা চান তাদের মেয়েরা নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক, শালীন পোশাক পরুক। অথচ স্কুলে গিয়ে তারা সমবয়সী ইতালিয়দের ভিন্ন জীবনযাপন দেখে। সেখানেই জন্ম নেয় দ্বৈত পরিচয়ের টানাপোড়েন। একদিকে তারা মুসলিম, অন্যদিকে তারা ইতালিয়; কিন্তু সমাজ প্রায়ই তাদের কোনো দিকেই পুরোপুরি গ্রহণ করে না।

এই অবস্থায় তরুণীরা সৃজনশীলতার জায়গা খুঁজে নিতে শুরু করে। কেউ বিদ্রুপ বা আত্মবিদ্রুপের মাধ্যমে কটূক্তিকে মোকাবিলা করে, কেউ আবার সামাজিক মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। কেউ লিখতে বসে। রান্দা গাজি নামের এক তরুণী তাঁর উপন্যাসে মুসলিম কিশোরীদের জীবন, বৈষম্য ও স্বপ্নের আখ্যান তুলে ধরেন। সুমাইয়া আবদেল কাদের তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন, "আমি হিজাব

পরি, কিন্তু কুইন ব্যান্ডও শুনি।” এই কথাগুলোতে প্রতিফলিত হয় নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাস আর আধুনিক সংস্কৃতি পাশাপাশি চলতে পারে।

এই তরুণদের জন্য সংগঠনও তৈরি হয়েছে। Giovani Musulmani d’Italia (GMI) নামক সংগঠন মুসলিম যুবকদের জন্য এক প্ল্যাটফর্ম যেখানে মেয়েরা নেতৃত্ব দেয়, সমাজের প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এসব কর্মকাণ্ড তরুণীদের মনে আস্থা জাগায় যে তারা ইতালিয় সমাজের অঙ্গ, তাদের কণ্ঠস্বরও মূল্যবান।

সংগীত ও শিল্পও হয়ে উঠেছে আত্মপ্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম। ইতালিতে জন্ম নেওয়া র‍্যাম্পার আমির ইস্‌সা তাঁর গানে তুলে ধরেছেন অভিবাসী জীবনের টানাপোড়েন। আরেক তরুণ শিল্পী মাহমুদ ২০১৯ সালে Sanremo মিউজিক ফেস্টিভ্যালে বিজয়ী হয়ে গোটা ইতালিকে দেখিয়েছিলেন কীভাবে এক মুসলিম পরিবারের সন্তানও জাতীয় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, সংস্কৃতি শুধু বিনোদন নয়; বরং আত্মপরিচয় পুনর্গঠনের হাতিয়ার।

গবেষণায় দেখা যায়, অনেক তরুণ মুসলিম ইতালিয় ভাষায় কবিতা লিখে, আবার কেউ আরবি, বাংলা বা উর্দুতে গান গায়। কেউ বাসার ভেতরে নামাজ পড়ে, আবার কেউ সাহস করে জনসমক্ষে হিজাব পরে বের হয়। তারা নিজেদের গল্পের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করছে পরিচয় স্থির নয়, প্রতিদিন বদলায়, প্রতিদিন গড়ে ওঠে।

এই আখ্যানগুলো শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন একজন বাংলাদেশি বা আরবি তরুণী ইতালির রাস্তায় হেঁটে নিজের ভবিষ্যৎ দেখছে। যদি সে এখানে জন্মাত, তবে হয়তো একই দ্বন্দ্ব তাকে ঘিরে ধরত। পরিবার বলতো এক কথা, সমাজ বলতো আরেক কথা। তবুও এই দ্বন্দ্বের ভেতরেই জন্ম নিত সৃজনশীলতা, জন্ম নিত আত্মপ্রকাশের নতুন ভাষা।

সিসিলি, পালেরমো আর মাজেরার পুরোনো রাস্তায় যেমন একসময় আরবদের ছায়া ছিল, বিশ শতকের ইতালির শহরগুলোতে আবারও সেই পদচিহ্নের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু এবার তারা ছিল না সৈন্য বা বিজেতা, বরং শ্রমিক, দোকানি, ছাত্র কিংবা পেশাজীবী, যাদের হাতের কাজ আর পরিশ্রমে ইতালির শহরগুলো নতুন প্রাণ পেল। অথচ সেই জীবনকে তারা গড়ে তুলেছিল অদৃশ্য প্রার্থনার জগতের ভেতর। দোকানের ভেতর, পুরোনো গুদামঘর, কারখানার কক্ষ কিংবা

খেলার মাঠে তারা দাঁড়িয়েছিল নামাজের জন্য। আইন বলেছিল, নতুন মসজিদ বানানো যাবে না, অথচ তারা হাল ছাড়েনি।

উত্তর ইতালির এক পুরোনো সুপারমার্কেটের কোণে কাঠের মোবাইল মিহরাব বসিয়ে তারা কেবল দিক নির্ধারণ করেছিল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো ঘর হয়ে উঠেছিল মসজিদ। কিছুদিন পরে সেই মিহরাব আবার সরিয়ে নেওয়া হলো, আর ঘরটা ফের জিমে পরিণত হলো। উদিনের পুরোনো বাস পরিষ্কারকেন্দ্রের বিশাল দরজা খুলে রাখা হয়েছিল গ্রীষ্মের রাতে, যাতে রমজানের ইফতারের আগে নামাজের ভিড় একটু শীতল বাতাস পায়। শত শত শ্রমিক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, দিনের পরিশ্রম শেষে রোজার ক্লান্তি সত্ত্বেও প্রার্থনার জন্য একত্র হলো।

রোমের মসজিদ, যা ইউরোপের বৃহত্তমগুলোর একটি, সেই সময় মুসলিমদের জন্য ছিল দৃশ্যমানতার প্রতীক। কিন্তু ইতালির অন্য শহরগুলোতে ঈদের দিন মানে ছিল ভাড়া করা কোনো স্টেডিয়াম বা স্পোর্টস সেন্টার। হাজার হাজার মানুষ কাদা আর ধুলোয় বসে ইবাদত করেছে, যেন এভাবেই তারা একদিনের জন্য হলেও নিজেদের উপস্থিতিকে স্বীকৃত করতে পারে। এক সংবাদমাধ্যম তখন এই দৃশ্য ছাপিয়েছিল, আর ইতালিয় সমাজ বুঝেছিল, মুসলিমরা আর গোপন নেই, তারা এখন প্রকাশ্যে।

তুরিনোর শিল্পনগরী ছিল অভিবাসী মুসলিমদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। সেনেগাল, মরক্কো আর সাহারার দক্ষিণের দেশগুলো থেকে আসা শ্রমিকরা কারখানার এক কোণ ভাড়া নিয়ে সেখানে জুমার নামাজ আদায় করত। ধীরে ধীরে সেই কারখানার ঘরই হয়ে উঠেছিল কুরআন শেখার জায়গা, শিশুদের আরবি পড়ানোর কেন্দ্র আর একেকটি সাংস্কৃতিক সমিতি। কখনো স্থানীয় কোনো এনজিও এগিয়ে এসে প্রশাসনের কাছে অনুমতি জোগাড় করে দিত, আর ছোট্ট সেই ঘরটি পরিণত হতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এক কেন্দ্রবিন্দুতে।

মাজারার উপকূলবর্তী শহরে তখন তিউনিশিয়ান বংশোদ্ভূত মুসলিমরা নতুন করে জীবন গড়ছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে আসা সেই ঢেউ আজও শহরের জেলে আর শ্রমিকদের ভেতরে টিকে আছে। এই শহরেই আবার যেন অতীত ফিরে আসে এক হাজার বছর আগে যেখানে আরব যোদ্ধাদের পা পড়েছিল, আজ সেখানে

আবার মুসলিম অভিবাসীরা জাল ফেলে মাছ তোলে, দোকান চালায়, সন্তানদের কুরআন শেখায়।

কিন্তু প্রতিটি শহরে গল্পটা ছিল না এত সহজ। ট্রেভিসো অঞ্চলে শ্রমিকরা তাদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে একটি ভবন কিনেছিল, যা তারা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে নিবন্ধন করেছিল। কিন্তু স্থানীয় সরকার সেখানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে দিলো। মুসলিমরা বাইরে ছাউনি ফেলে প্রার্থনা শুরু করলে পুলিশ এসে সেটি ভেঙে দিলো। প্রচণ্ড গরমে, রোজার তৃষ্ণায়, পানির এক ফোঁটা ছাড়াই তারা খোলা আকাশের নিচে চট বিছিয়ে প্রার্থনা করল। দৃশ্যটা যেন একদিকে ছিল তাদের দৃঢ়তার প্রমাণ, আবার অন্যদিকে ছিল এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

এইসব অদৃশ্য জগতের ভেতর জন্ম নিল ইতালির মুসলিম জীবনের আসল গল্প। শুক্রবারে গাড়ির ভিড় দেখে আন্দাজ করা যেত কোথায় মসজিদ আছে। কখনো ভুল করতেও হয়েছে, যেমন স্পিনেয়ায়, যেখানে একটি সাধারণ গুদামঘর দেখে প্রথমে ভেবেছিল কেউ সেটিই মসজিদ। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে দেখা যেত একেবারে অন্য ছবি-গুগল ম্যাপে স্থান চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, যেন বলা যায়, "আমরা কিছু লুকাচ্ছি না।"

এই সময়কালে প্রার্থনা আর রোজার মতো ধর্মীয় বিধান ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল টিকে থাকার হাতিয়ার। শ্রমিকরা দিনের পরিশ্রম শেষে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেই নামাজে দাঁড়াত, ইফতারের সময় একে অপরের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেত, আর সন্তানদের হাতে তুলে দিত আরবি অক্ষর। ঈদের দিন তারা একসাথে হতো, মাঠে বা ভাড়া করা কোনো হলে, যেখানে শত শত মানুষ একসাথে আলিঙ্গন করত, দূরদেশে থেকেও নিজেদের পরিচয় ধরে রাখত।

এভাবেই বিশ শতকের ইতালি এক অদৃশ্য অথচ প্রাণবন্ত মুসলিম সমাজের জন্ম দিলো। তারা গোপন গুদামঘর, কারখানার কোণ, কিংবা খোলা মাঠে নামাজ পড়ে নিজেরা এক কমিউনিটি গড়ে তুলেছিল। কেউ যদি বাইরে থেকে তাকাত, হয়তো বুঝতেই পারত না, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই শোনা যেত প্রার্থনার সুর, রোজার ধ্বনি, আর সেই অটল বিশ্বাস যা বিদেশের মাটিতেও তাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

Our office promotes a model of integration based on inclusion. This means each community learns from each other and is enriched by the other-as opposed to assimilation which says, I accept you if you become like me. - By Dino Cocchianella, Institute for Social Inclusion

নিভৃতে বেঁচে থাকা বিশ্বাসের কাহিনি

ইতালির প্রায় ছয় মিলিয়ন (৫.৭৫ বা প্রায় ষাট লাখ) মুসলিমদের জন্য আছে মাত্র আটটি অনুমোদিত মসজিদ। যদিও প্রায় ৪০০০-র মতো অননুমোদিত মসজিদ রয়েছে। নতুন মসজিদ বানানো আইনত নিষিদ্ধ, তাই তারা নিজেরাই তৈরি করেছে এক অদৃশ্য জগৎ, যেখানে দোকান ঘুরে হয়ে গেছে নামাজের জায়গা, কারখানার ভেতর জন্ম নিয়েছে ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

গত বিশ বছরে ইতালিতে ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। নব্বইয়ের দশকের তুলনায় মুসলিমের সংখ্যা এখন দশ গুণ বেশি, আর ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তর আফ্রিকা, সাহারা-উত্তর আফ্রিকা, বলকান, দক্ষিণ এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অভিবাসীরা এই জনসংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলছে। অথচ সরকারিভাবে ইসলামকে ইতালি কখনো স্বীকৃতি দেয়নি। তাই মুসলিমরা নামাজ পড়তে পারলেও, মসজিদ গড়তে পারে না।

বিখ্যাত ফটোগ্রাফার নিকোলো দেজিওর্গিস পাঁচ বছরের শ্রমে তুলে ধরেছেন এই গোপন জগৎ। তার বই Hidden Islam (২০১৪) দেখায় কীভাবে উত্তর ইতালির অজস্র গুদাম আর হলঘরে অচেনা দরজা খুলে যায় নামাজের স্থানে।

Hidden Islam-এর ছবি যখন দেজিওর্গিস মুসলিম সম্প্রদায়কে দেখালেন, তারা অবাক হয়ে বলেছিল, “আমরা তো ভাবিইনি আমরা নিজেদের লুকিয়ে রেখেছি।” আসলে এগুলো লুকোনো নয়; বরং প্রত্যেক কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তাদের এলাকার প্রয়োজন মতো।

কখনো সুপারমার্কেট, কখনো গুদামঘর, কখনো বাস ডিপো এইসব সাধারণ জায়গার ভেতরই জন্ম নিয়েছে ইতালির লুকানো মসজিদ। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারে না, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই ভেসে আসে প্রার্থনার শব্দ। এভাবেই ইতালির মুসলিমরা গড়ে তুলেছে এক অদৃশ্য, কিন্তু টিকে থাকা জগৎ।

ইতালিতে গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করার বিষয়টি সব সময়ই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে এসেছে। ইতিহাসের পরতে পরতে কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে খ্রিষ্টান ধর্মীয় স্থাপনা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে মুসলিম প্রার্থনার স্থানে পরিণত হয়েছিল, আবার কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক সময়ে গির্জার ভেতরে এমন প্রয়াস দেখা গেছে যা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড রোডের ওপর এমন চিত্র দেখা যায় যে, বিশাল বড় পরিত্যাক্ত গির্জার একটা অংশকে মসজিদ ও মাদরাসায় রূপান্তরিত করে পরিচালনা করা হচ্ছে। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় কাউন্সিলের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত গির্জাকে ক্রয় করে নিয়েছে।

সিসিলির সিরাকিউজ ক্যাথেড্রালই এই ধারাবাহিকতার প্রাচীনতম উদাহরণগুলোর একটি। অষ্টম শতকের শেষভাগে আরব মুসলিমরা দ্বীপটি দখল করলে এই বিশাল ক্যাথেড্রালকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নর্মানরা ক্ষমতায় ফিরে আসলে সেটি আবার গির্জায় রূপান্তরিত হয়। এটি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মীয় স্থাপনার পরিচয়ও বদলেছে, কিন্তু স্থাপত্যের ভেতর এখনো সেই অতীতের ছাপ রয়ে গেছে।

আধুনিক কালে এই প্রসঙ্গ আবার সামনে আসে ২০১৫ সালে, যখন ভেনিসে সান্তা মারিয়া দেল্লা মিজেরিকোর্ডিয়া নামের একটি পরিত্যক্ত গির্জা ভেনিস বিয়েনাল আর্ট ফেস্টিভালের অংশ হিসেবে সাময়িকভাবে “লা মোশেয়া” নামক একটি প্রকল্পে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভেতরে মুসলিমরা নামাজ আদায়ও করেন। কিন্তু শহর কর্তৃপক্ষ শিগগিরই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। কারণ তাদের মতে এটি নিরাপত্তাজনিত এবং অনুমোদনহীন ধর্মীয় কার্যকলাপ। প্রকল্পটি আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনার জন্ম দিলেও স্থায়ীভাবে গির্জাকে মসজিদে পরিণত করার অনুমতি মেলেনি।

এর বাইরে বার্গামো শহরের একটি প্রাক্তন হাসপাতাল-গির্জা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। স্থানীয় মুসলিম সংগঠনগুলো এটি কিনে মসজিদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতি এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কারণে এই প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হয়। গির্জার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, ক্যাথলিক চার্চের আপত্তি এবং স্থানীয় জনগণের সংবেদনশীলতা এমন উদ্যোগকে থামিয়ে দিয়েছে।

এই সব উদাহরণ প্রমাণ করে যে ইতালিতে গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তরের প্রচেষ্টা একদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের প্রতিফলন, অন্যদিকে খ্রিষ্টান

ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে থাকা সংবেদনশীলতার মুখোমুখি দাঁড়ানো। ইতালিতে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও নতুন মসজিদ নির্মাণের অনুমোদন পেতে তারা প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। এজন্য কখনো পুরনো গির্জা বা চ্যাপেলকে মসজিদে রূপান্তর করার চিন্তা সামনে আসে। কিন্তু প্রশাসনিক আইন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে এর বাস্তবায়ন খুব সীমিতই থাকে।

আমার মনে আছে, আজ হতে প্রায় ১৩ বছর আগে ইতালির আনকোনা প্রদেশের ক্রমান্বয়ে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে বড় পরিসরে মসজিদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মসজিদের কোনো এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় মেয়রকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ হতে তার কাজে এই বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি হেঁসে হেসে বলেন, “আর কয়টা বছর অপেক্ষা করো, তোমাদেরকে মসজিদের জন্য জায়গা খুঁজতে হবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও জনবলের অভাবে এই শহরে বহু গির্জা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে। সেগুলিই তোমাদেরকে ক্রয় করে মসজিদ পরিচালনা করতে হবে।” তার কথায় যদিও বাস্তবতা ছিল তবুও পরবর্তীতে সরকারের বিভিন্ন আইন ও প্রতিবাদকারীদের বাধার মুখে তা আর হয়ে ওঠেনি।

যদিও ইতালিতে গির্জা থেকে স্থায়ীভাবে মসজিদে রূপান্তরের উদাহরণ বাস্তবে নেই বললেই চলে। কিছু সময়ের জন্য আর্ট প্রকল্প বা সাময়িক প্রার্থনার জায়গা হিসেবে এটি ব্যবহার হলেও সেটি স্থায়ী হয়ে ওঠেনি। তবে এ ঘটনা একটি গভীর সামাজিক প্রশ্ন সামনে আসে ইতালির মুসলিমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পরিচয় রক্ষায় কতটা জায়গা পাচ্ছে, আর খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের সাথে মেলবন্ধনের জায়গা কতটুকু তৈরি হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে ইতালির মুসলিম জনসংখ্যা আর গোপনে থাকা গল্প নয়; বরং শহরগুলোর রাস্তায়, বাজারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কর্মক্ষেত্রে দৃশ্যমান এক বাস্তবতা। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে যে তরঙ্গ শুরু হয়েছিল, তা একুশ শতকে এসে আরও বিস্তৃত আকার নিয়েছে। আজ মিলান, রোম, তুরিনো, ভেনিস, বলোনিয়া, ফ্লোরেন্স, নাপোলি আর পালেরমো সবখানেই মুসলিম উপস্থিতি এমনভাবে মিশে গেছে যে শহরের সামাজিক মানচিত্রে তাদের ছাপ অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেখা যায় যে, মিলানে মুসলিমরা গড়ে তুলেছে ছোট ছোট ব্যবসা। কেউ চালাচ্ছে টেক্সটাইল দোকান, কেউ ছোট রেস্তোরাঁ, কেউবা আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যে

জড়িত। রোমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেখা যায় তরুণ মুসলিম ছাত্রছাত্রী, যারা ইতালিয়দের মতোই শিক্ষাজীবন চালাচ্ছে, তবে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও ধরে রেখেছে। তুরিনোতে শিল্প কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে আইটি খাতে কাজ করা মুসলিম তরুণ সবাই মিশে আছে ইতালিয় অর্থনীতির চাকার সঙ্গে।

ইতালিয় সমাজে মুসলিমদের অংশগ্রহণ শুধু অর্থনীতিতেই সীমিত নয়। শহরগুলোর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে তারা নতুন রং যোগ করেছে। রোজা ও ঈদের দিনগুলোতে এখন মিলান বা রোমের পার্কগুলোতে বড় সমাবেশ দেখা যায়, যেখানে স্থানীয় ইতালিয় প্রতিবেশীরাও কৌতূহল নিয়ে এসে দাঁড়ায়। হালাল খাবারের দোকান বা তুর্কি-মরোক্কান রেস্তোরাঁ ইতালিয় তরুণদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফ্যাশন আর সংগীতেও মুসলিম প্রভাব লক্ষ করা যায়, বিশেষত অভিবাসী তরুণদের উদ্যোগে তৈরি ফিউশন কালচারে।

তবে এই মিশ্রণের ভেতরে দ্বন্দ্বও আছে। একদিকে অনেক ইতালিয় মুসলিমদের অবদানকে ইতালির নতুন বাস্তবতার অংশ হিসেবে দেখছে। তারা স্কুলে তাদের সন্তানদের মুসলিম সহপাঠীর সঙ্গে খেলতে দেখে, বাজারে মুসলিম দোকানদারের কাছ থেকে কেনাকাটা করে, কিংবা হাসপাতালে মুসলিম চিকিৎসকের সেবা নেয়। এসব অভিজ্ঞতা ইতালিয় সমাজের একাংশকে মুসলিম উপস্থিতিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে।

অন্যদিকে কিছু গোষ্ঠী এখনো উদ্বেগ পোষণ করে। তাদের মতে, মুসলিম সম্প্রসারণ ইতালির সাংস্কৃতিক পরিচয় বদলে দিতে পারে। এই সন্দেহ থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে অভিবাসনবিরোধী বক্তব্য শোনা যায়। তবে একুশ শতকের শহুরে জীবন প্রমাণ করেছে, মুসলিমরা শুধু টিকে থাকেনি, তারা ইতালিয়দের সঙ্গে একসাথে কাজ করছে, কর দিচ্ছে, সন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং সমাজের ভেতরে নিজেদের অবস্থান মজবুত করছে।

বিভিন্ন শহরে হাঁটলে আরও দেখা যায় মসজিদের কাছাকাছি একটি ইতালিয় কফিশপে স্থানীয়রা বসে আছে, আর পাশের গলিতে মুসলিম দোকানির হালাল মাংস বিক্রি হচ্ছে। রোমের ক্যাম্পাসে কোনো এক ক্লাসের ভেতরে মুসলিম তরুণীর হিজাব আর ইতালিয় সহপাঠীর টিশার্ট একসাথে বসে আছে। এই দৃশ্যগুলো একুশ শতকের ইতালির বাস্তবতা, যেখানে মুসলিম সম্প্রসারণ শুধু সংখ্যায় নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন ছাপ রেখে চলেছে।

তখন গ্রীষ্মকাল, ইয়েসির সরু পাথরের রাস্তা দিয়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের চত্বরগুলোয় ভিড় জমেছে, চারদিকে আড্ডা আর কফির কাপের টুংটাং শব্দ। আমি হাঁটছিলাম পুরনো দুর্গের দেয়ালের কাছে, আর দেখছিলাম শহরের ছন্দ যেন একদিকে শতাব্দীর পুরনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে নতুন জীবনের গতি। এই শহরের কোনো এক ঘরে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের জন্ম।

শহরে আমি কাছ থেকে দেখেছিলাম ইতালির নতুন মুসলিম প্রজন্মের জীবন। তারা একেবারে সাধারণ ইতালিয়ান কিশোরদের মতোই স্কুলে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশোনা করে, রবিবারে ফুটবল খেলতে নামে। কিন্তু যখন রমজান আসে, তখন সেই একই ছেলেমেয়েদের চোখে আমি অন্য এক শৃঙ্খলা দেখতাম। দুপুরের দিকে যখন বন্ধুদের সঙ্গে তারা শহরের কোনো পিজারিয়ায় যায়, তখনও তারা পানির বোতলে হাত দেয় না। রোজার নীরব গর্ব তাদের ভেতরেই বাজতে থাকে।

একবার আমি শহরের এক পুরনো গুদামঘরের ভেতরে ঢুকেছিলাম, যেটা মুসলিমরা ভাড়া নিয়ে নামাজের জায়গায় পরিণত করেছে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারত না, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই দেখা যেত নীল কার্পেট বিছানো, দেয়ালের এক কোণে ছোট্ট কাঠের মিহরাব রাখা। সেদিন মাগরিবের আগে সবাই জড়ো হচ্ছিল, তাদের হাতে খেজুর আর বোতলজাত পানি। সূর্য অস্ত গেলে একসাথে ইফতার হলো। সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম তাদের জীবনের ভেতরে ইসলাম কতটা দৃঢ়ভাবে বেঁচে আছে, অথচ তারা আবার শহরের প্রতিটি রাস্তায় ইতালিয়ান সমাজের সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে।

ইয়েসির তরুণ মুসলিমদের মুখে আমি প্রায়শই দ্বিধা দেখতাম। তারা কখনো বলে উঠত "আমি কি শুধু মুসলিম, নাকি ইতালিয়ানও?" একদিকে শুক্রবারের নামাজ, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ইতালিয়ান ইতিহাস ও সাহিত্য। কখনো তারা মনে করত এই দুই পৃথিবী আলাদা, আবার অনেক সময় তাদের কথা, আচার আর ভেতরের আত্মবিশ্বাস বলে দিত দুটো আসলে একই সাথে বেঁচে থাকে।

ঈদের দিনে ইয়েসির মতো ছোট ছোট শহরে মুসলিম সম্প্রদায়টা একসাথে হয়, শহরের ভাড়া করা হলে নারী-পুরুষ মিলে ঈদের জামাত আদায় করে। জামাত শেষে এ বাড়ি ওই বাড়ি, এই ঘর ওই ঘরে একে অপরের সাথে কুশল বিনিময়। ইদানীং দেখা যায় যে, স্থানীয় অনেক ইতালিয়ানও মুসলিমদের উৎসবে শরিক হয়। টেবিলে রাখা হয় কুসকুস, বিরিয়ানি, আবার ইতালিয়ান পাস্তা আর অলিভ তেল।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের ইতালিয়ান বন্ধুরাও। হাসি, ছবি তোলা আর গল্প সব মিলিয়ে যেন এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে।

আমার দিনগুলো আমাকে শিখিয়েছে, এই নতুন মুসলিম প্রজন্মের জীবন আসলে এক সেতুর মতো। এক পাশে আছে ধর্মবিশ্বাস, অন্য পাশে আছে নতুন সমাজে আপন হয়ে ওঠা। সেই সেতুর ওপর দিয়েই তারা হাঁটছে, কখনো দ্বিধায়, কখনো দৃঢ়তায়। আর এই দৃশ্যগুলো আমাকে আজও মনে করিয়ে দেয় বিশ্বাস আর আপন হওয়া, দুটো মিলেই তাদের পরিচয়ের আসল গল্প।

২০২৫ সালের গ্রীষ্মে যখন আমি আনকোনার সাগরপাড়ের বাতাসে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখনই বুঝতে পারলাম ইতালির ছোট ছোট পাহাড়ি শহরগুলোর ভেতর কীভাবে নতুন এক জীবন জন্ম নিচ্ছে। সেনেগালিয়া, ফালকোনারা, ক্যাস্টেলপ্লানিও প্রতিটি শহরেই রঙিন বাজার, সরু গলি, আর দূরে পাহাড়ের ছায়া। কিন্তু সেই ছবির ভেতর আরও একটি ছায়া ছিল প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিমের এক সম্প্রদায়, যাদের ভেতরে দুই হাজারের মতো বাংলাদেশি, আর বাকি এসেছে পাকিস্তান, মরক্কো, আলবেনিয়া ও তিউনিশিয়া থেকে।

তখনকার দিনে, ২০১২ সালে, পুরো অঞ্চলে ছিল ৫টি মসজিদ। শুক্রবারে নামাজ পড়তে গেলে অনেককেই ভিড় সামলাতে হতো, কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে নামাজ শেষ করত। তবুও নামাজের সময় এলে সবাই এসে হাজির হতো কারও হাতে বাজারের ব্যাগ, কেউ আবার কাজের পোশাকেই। মনে হতো, প্রবাসের ভেতরে এটাই একমাত্র আশ্রয়, যেখানে সবাই মিলেমিশে দাঁড়ায়। আজকের দিনে, যখন আমি ফিরে তাকাই, দেখি সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১টি মসজিদে। মুসলিমরা এখন আর এক জায়গায় গাদাগাদি করে না, তাদের জন্য জায়গা তৈরি হয়েছে, যেমনটা তাদের অস্তিত্বও এখন আরও দৃশ্যমান হয়েছে।

আমি আনকোনার সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি কীভাবে ইতালিয়ান ছেলেদের সঙ্গে মুসলিম তরুণরা ফুটবল খেলছে। স্কুলে তারা একসাথে পড়াশোনা করছে, কেউ কেউ ক্যাথলিক যুবকেন্দ্রেও গিয়েছিল খেলাধুলার জন্য। কিন্তু আবার সেই একই ছেলেমেয়েরা রমজানের রোজায় বিকেল গড়িয়ে আসতেই ক্লান্ত মুখে মাঠ থেকে ফিরে ঘরে বসে ইফতারের জন্য অপেক্ষা করছে। দুই জগৎ যেন একসাথে চলছে তাদের জীবনে একদিকে ইতালির সংস্কৃতি, অন্যদিকে ইসলামের চর্চা।

সেনেগালিয়ার সমুদ্রতীরে আমি দেখেছি একদল বাংলাদেশি শ্রমিক সারাদিন কাজের পর বসে গল্প করছে। তাদের কথার ভেতরে ঢুকে পড়ে নস্টালজিয়া কেউ ঢাকার

গলি মনে করে, কেউ সিলেটের হাওর। কিন্তু তারপরেই আবার আলোচনা চলে ইতালির রাজনীতি, কাগজপত্রের ঝামেলা, কিংবা স্থানীয় মসজিদের কার্যক্রম নিয়ে।

ফালকোনারার ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটে যায়, আর আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাই ছোট ছোট দোকান কোনোটায় হালাল মাংস বিক্রি হচ্ছে, কোথাও আবার পাকিস্তানি মুদি দোকান। এই দোকানগুলো শুধু কেনাকাটার জায়গা নয়, ছিল সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র। সন্ধ্যায় সেখানে বসে আলোচনা হতো কেউ কাজের কথা বলত, কেউ সন্তানদের স্কুলের কথা, আবার কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করত।

ক্যাস্টেলপ্লানিও, পাহাড়ের কোলে শান্ত ছোট্ট শহর, সেখানে মুসলিম পরিবারগুলো আরও গোপনে বেঁচে ছিল। সকালে পুরুষরা কাজে বের হয়ে যেত, আর নারীরা ঘরে সন্তানদের নিয়ে থাকত। স্কুলের আঙিনায় ছোট্ট বাচ্চারা ইতালিয়ানদের মতো খেলা করে, কিন্তু ঘরে ফিরলেই মায়ের কাছ থেকে শিখত কুরআনের আয়াত। সেই দ্বৈত জীবন তাদের বেড়ে ওঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

এই সময়কার মুসলিম সম্প্রদায় বৈচিত্র্যময় জীবনে ভরা। কেউ নিয়মিত মসজিদে যায়, কেউ আবার শুধু ঈদে দেখা দেয়। কেউ ইসলামি শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহী, কেউ আবার শুধু সামাজিক পরিচয়ের জন্য মুসলিম। তবুও, যখন ঈদের দিন এলো, সবাই নতুন পোশাক পরে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেও একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ঈদ মোবারক, তাকাব্বাল আলাল্লাহ।"

আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম এই শহরগুলোয় মুসলিমরা ছিল একই সাথে দৃশ্যমান আবার অদৃশ্য। দৃশ্যমান তাদের কাজ, বাজার আর দোকানের মাধ্যমে; কিন্তু অদৃশ্য তাদের প্রার্থনার স্থান, তাদের ভেতরের সংগ্রাম আর আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াই। সময় গড়িয়েছে, মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে, জনসংখ্যাও বেড়েছে। আজ হয়তো আনকোনা, সেনেগালিয়া, ফালকোনারা আর ক্যাস্টেলপ্লানিও আরও বড় মুসলিম সম্প্রদায় ধারণ করছে।

এই পাহাড়ি শহরগুলোয় দাঁড়িয়ে আমার মনে হতো ইতালির বাতাসে এখন মিশে গেছে আজানের প্রতিধ্বনি, শিশুদের কুরআন পড়ার শব্দ আর এক নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন, যারা ইতালিয়ানও, আবার মুসলিমও।

আজ ইতালির পাহাড়ি শহরগুলোর রাস্তায় হেঁটে গেলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির পরিবারগুলো কীভাবে সমাজের সাথে একীভূত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকান

আরব নারী যেমন সাধারণত গৃহিণী হয়ে ঘরের ভেতর থাকতেন, তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম পরিবারগুলোর মায়েদেরও অনেকটা একই চিত্র। মায়েরা একসময় কাজে যেতে অভ্যস্ত হলেও বর্তমানে সেটা অনেকটা কমে এসেছে। কাজ ও অর্থ উপার্জনের চেয়ে সন্তানদের মানুষ করাই এখন তাদের প্রধান টার্গেট। একসময় তারা টিভির আরবি বা বাংলা চ্যানেল দেখে সময় কাটাতেন, বাজারে গেলে প্রায়ই সন্তানদের নিয়ে যেতেন, যেখানে ছোট্ট বাচ্চারা দোভাষী হয়ে দাঁড়াতো ইতালিয় দোকানির সঙ্গে কথোপকথনে। পাকিস্তানি নারীরা অনেক সময় পরিবারের বাইরে বের হতেন না, ধর্মীয় রীতিনীতি ও পোশাকে দৃঢ় থাকতেন, যেন সন্তানদের সামনে তাদের পরিচয় অটুট রাখার চেষ্টা।

এই শহরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল মুসলিম শিশুদের বড় পরিবর্তনের দ্বার। বাংলাদেশি পরিবার থেকে আসা বাচ্চারা দ্রুত ইতালিয় ভাষা শিখে ফেলত, কারণ তারা স্কুলে বন্ধু বানাতো, খেলাধুলায় মিশে যেত। অনেক সময় মায়ের হোমওয়ার্কে সাহায্য করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যেত, তখন তারা স্থানীয় বন্ধু বা শিক্ষককে ভরসা করত। পাকিস্তানি শিশুরা স্কুলে গিয়েই প্রথমবার শিখতো কীভাবে সমাজের নিয়মে মিশতে হয়, কিন্তু বাড়ি ফেরার পর আবার ফিরত কুরআনের ক্লাসে, যেখানে সপ্তাহান্তে মসজিদ বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আরবি শেখানো হতো।

এই পরিবারগুলোতে মসজিদ ছিল শুধু নামাজের জায়গা নয়; বরং ছিল একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার কেন্দ্র। মরক্কোর মানুষ কুরআনের আরবি পড়তে শিখত, বাংলাদেশিরা একে অপরকে কাজের খবরাখবর দিত, পাকিস্তানিরা সেখানে তাদের সংস্কৃতির রীতি ধরে রাখত। কিন্তু সবার গল্পে মিল ছিল একটাই সন্তানদের দ্বৈত জীবন। স্কুলে তারা ইতালিয় হয়ে উঠছিল, বাড়িতে বাবা-মায়ের ভাষা ও রীতিতে মুসলিম রয়ে যাচ্ছিল।

বাংলাদেশি শিশুদের অনেক সময় বাবা-মায়ের জন্য কাগজপত্রে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো। আমি নিজেই আনকোনায় এক পরিবারে দেখেছিলাম, ছোট্ট এক ছেলে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে পৌরসভায় গিয়েছিল। অফিসারের সঙ্গে সে ইতালিয় ভাষায় কথা বলছিল, আর মা বাংলায় পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বলছিল কী বলতে হবে। সেনেগালিয়ায় আরেক পাকিস্তানি মেয়ে হিজাব পরে স্কুলে গিয়েছিল, এবং ক্লাসে এক সহপাঠী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল কেন সে মাথা ঢেকে রাখে। মেয়ে হেসে বলেছিল, “এটাই আমার পরিচয়।”

তবুও সমস্যা ছিল অনেক। দ্বিগুণ পাঠ্যক্রম একদিকে ইতালির স্কুল, অন্যদিকে সপ্তাহান্তে আরবি ক্লাস শিশুদের ক্লান্ত করত। অনেক সময় তাদের মুখে বিরক্তি দেখা যেত, তারা বলত, "কেন আমাদের এত পড়তে হয়?" কিন্তু পরিবারগুলো আশা করত, এই দ্বৈত শিক্ষা সন্তানদের মুসলিম পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখবে, আবার ইতালির সমাজেও জায়গা করে দেবে।

এই পাহাড়ি শহরগুলোতে পরিবারগুলো নিজেদের টিকিয়ে রেখেছিল ধর্মীয় বিধান মেনে চলার মধ্যে দিয়ে। রোজার সময় সন্ধ্যা নামলে রাস্তার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ত ভাঙা রোজার খাবারের ঘ্রাণ। কোথাও বাংলাদেশি ইফতারে ছোলা, পেঁয়াজু আর খিচুড়ির গন্ধ, কোথাও মরক্কোর হারিরা স্যুপ আর খেজুর, আর পাকিস্তানি পরিবারগুলো বানাতো সামোসা বা কাবাব। নামাজের সময় মসজিদে জায়গা না হলে গ্যারেজ বা ঘরোয়া জায়গা হয়ে উঠতো জামাতের স্থান।

এভাবেই আনকোনা, সেনেগালিয়া, ফালকোনারা আর ক্যাস্টেলপ্লানিওতে গড়ে উঠেছিল এক ভিন্ন জগৎ, যেখানে মুসলিম মায়েরা, বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি শিশু, আর মরক্কোর পরিবারগুলো নিজেদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে নতুন সমাজের ভেতর বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছিল।

ইতালির শহরগুলোতে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের জীবনে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তার রূপ ভিন্ন হলেও মূল সুরটা প্রায় একই। আনকোনা, বোলোনিয়া, মিলান কিংবা তুরিন সব জায়গায় একই ধরনের গল্প শোনা যায়। পরিবার আর সমাজের টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে তাদের বড় হতে হয়, আর ধর্মীয় পরিচয় সেখানে এক জটিল মাত্রা যোগ করে।

রমজানের মাস এলে এই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়। স্কুলে সহপাঠীরা জিজ্ঞেস করে "তুমি কেন দুপুরে কিছু খাচ্ছ না?" অন্যদিকে পরিবার আশা করে সন্তানরা পুরোপুরি রোজা রাখবে। আনকোনার এক পাকিস্তানি কিশোরী বলেছিল, দুপুরে লুকিয়ে পানি খাওয়ার জন্য সে প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগত, কারণ বাড়িতে ফিরে মা তাকে গর্ব করে বলতেন, "তুমি আমাদের পরিবারের মান রেখেছ।"

সেনেগালিয়ায় এক মরক্কো পরিবারে কিশোরী মেয়েকে হিজাব পরতে বলা হয়েছিল। মেয়েটি চাইত ইতালিয় বান্ধবীদের মতো খোলা চুলে স্কুলে যেতে। একদিন প্রতিবাদ করলে বড় ভাই, মাত্র এক বছরের বড় হলেও, তাকে ধমক দিয়েছিল। পরিবারে ভাইয়ের কথাই শেষ কথা, যা ইতালিয় সমাজে একেবারেই

অচেনা ব্যাপার। মেয়েটি তখন শিখে নিল কৌশল স্কুলে যেত হালকা স্কার্ফে, বাড়ি ফেরার সময় পুরু হিজাব পরে দরজায় ঢুকত।

তুরিনে ঘটেছিল আরেক ভিন্ন ঘটনা। এক তরুণী মুসলিম মেয়ে ইতালিয় এক ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পরিবার প্রথমে হতবাক হলেও, শেষ পর্যন্ত তাকে বর্জন করেনি। বরং বলেছিল, "ভুল হয়েছে, তবে তুমি আমাদেরই অংশ।" মিডিয়া এ গল্প নিয়ে কিছু বলেনি, কারণ এটি তাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে। অথচ এটি দেখায় যে মুসলিম পরিবারগুলোর প্রতিক্রিয়া সব সময় একরকম কঠোর নয়।

মিলানে আমি নিজে দেখেছি ভিন্ন আরেক চিত্র। সেখানে তরুণ মুসলিমদের একটা অংশ মসজিদের সাথে নিয়মিত যুক্ত নয়। তারা শুধু ঈদে বা বড় কোনো উৎসবে যায়, আর নিজেদের বলে "প্রাইভেট মুসলিম।" তাদের কাছে ধর্ম অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে কিছু তরুণ আবার সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক জীবনে যুক্ত, স্থানীয় সংগঠন বা স্বেচ্ছাসেবী কাজে অংশ নেয়, নিজেদের বলে "ইতালিয় মুসলিম।" তারা ধর্মকে নতুনভাবে মিশিয়ে নিচ্ছে ইতালির বাস্তবতায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস আর চর্চা এখানে তরল একেবারে প্রবাহমান। যেমন ভেনিসে এক তরুণ ছেলেকে আমি দেখেছিলাম, সে ঈদের দিন মসজিদে গিয়ে জামাতে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু পরদিনই বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে গিয়েছিল, একেবারে ধর্মীয় চিহ্ন ছাড়াই। যেন পরিস্থিতি বদলালে বিশ্বাসের প্রকাশও বদলে যায়।

শিক্ষকেরা এই বৈপরীত্য প্রায়ই লক্ষ করেন। পালের্মোর এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেছিলেন, ছোট বাচ্চারা মায়ের হয়ে দোকানে বা হাসপাতালে দোভাষীর ভূমিকা নেয়, অথচ বড় হতে হতে নিজেরাই দ্বিধায় পড়ে পরিবারের প্রত্যাশা পূরণ করবে, নাকি নিজের মতো করে জীবন গড়বে।

আরেকদিকে, নেপলসে এক মসজিদে কুরআনের ক্লাসে পড়ানো হতো আরবি। কিন্তু শিশুরা বলত, "এটা তো আমাদের ঘরে ব্যবহার হয় না।" তাদের জন্য এটা ছিল এক প্রকার তৃতীয় ভাষা, যা শুধু মসজিদের ভেতর টিকে থাকে। সপ্তাহান্তে তারা বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যেতে চাইত, কিন্তু বাবা-মা চাইতেন মসজিদের ক্লাসে উপস্থিত হতে।

এই দ্বন্দ্বে অনেক সময় জন্ম নেয় ক্ষোভ, আবার সৃষ্টিশীলতাও। কেউ বিদ্রোহ করে, কেউ হাস্যরসের মাধ্যমে নিজের পরিচয় সামলায়। বোলোনিয়ার এক তরুণী হিজাব

পরে বাসে উঠেছিল। এক যাত্রী বিদ্রুপ করে তাকালে সে মুচকি হেসে বলেছিল, "আজ চুল না ধোয়ার জন্য হিজাবটাই কাজে দিলো।" এমন আত্মবিদ্রুপ তাকে শক্তি দেয়, আর প্রমাণ করে যে মুসলিম তরুণরা নিজেদের পরিচয় নিয়ে খেলার এক অভিনব কৌশল শিখে ফেলেছে।

এভাবেই ইতালির নানা শহরে মুসলিম নতুন প্রজন্ম তৈরি করছে দ্বৈত জীবন একদিকে পরিবার ও ধর্মীয় প্রত্যাশা, অন্যদিকে ইতালিয় সমাজের নিয়ম। কোথাও সংঘর্ষ তীব্র, কোথাও নরম। তবে প্রতিটি গল্পেই ভেসে ওঠে এক জটিল বাস্তবতা, যেখানে ধর্ম, পরিবার, সমাজ আর ব্যক্তিগত স্বপ্ন একসাথে গেঁথে আছে।

ছোটবেলায় তারা স্কুলের প্রথম দিনগুলিতে প্রবেশ করে। ক্লাসরুমের সব শিশু একসাথে বসে বই পড়ছে, খেলা করছে। ত্বকের রং, নাম বা খাদ্যের ভিন্নতা যেন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। কিছু পরিবার তাদের সন্তানদের আরবি ভাষার স্কুলে পাঠায়, আবার কেউ বাড়িতেই আলাদা শিক্ষা পায়। তবু বেশির ভাগ শিশু নিজেদের মতোই স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়, কোনো বড় দ্বন্দ্ব নেই।

কিন্তু কিশোর বয়স এলেই সবকিছু পাল্টে যায়। স্কুলের মাঠে, বন্ধুদের সঙ্গে বসে তারা নিজেদের ভাবনা ভাগ করে। কেউ পরিবারের নিয়মের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ায়, কেউ সমঝোতার পথে হাঁটে। হঠাৎ করে সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয় নিজেদের পরিচয়, পরিবার, স্কুল, বন্ধু। মনে হয় প্রতিটি পদক্ষেপেই তাদেরকে নতুন করে নিজেদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে কিছুটা শিথিলতা আসে। পরিচয়ের প্রশ্নগুলো অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে পড়ে। কিন্তু পরিবারগুলোর যারা আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান তারা ছাত্রদের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার জন্য উৎসাহ দেয়। কারণ এই পথ তাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং সফলতা দেয়। তবে মানবিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে পড়াশোনা কম হওয়ায়, নিজেদের পরিচয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সুযোগ কমে গেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা আরও জটিলতা নিয়ে আসে। স্থানীয় মসজিদে বিদেশি ইমাম আছেন, যারা স্থানীয় সমাজের সংস্কৃতি খুব ভালোভাবে জানে না। কমিউনিটি অনেক সময় তাদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। অনেক যুবক অনুভব করে, পরিচয় ও ধর্মীয় নেতৃত্ব নিয়ে এই ফাঁক মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে।

অনেক সময় তারা বা তাদের পরিবার মনস্তাত্ত্বিক সাহায্যের খোঁজে যায়। পরিচয় নিয়ে দ্বন্দ্ব, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলা, ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়া সবকিছু একসাথে চাপ তৈরি করছে।

ছোটবেলায় সবকিছু শান্ত ছিল, কিশোরী সময়ে দ্বন্দ্বপূর্ণ, বড়বেলায় বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তবুও পরিচয় খোঁজা, নিজের স্থান বোঝা, নিজেদের চেনা এই যাত্রা কখনো শেষ হয় না। তারা এগিয়ে যায়, হাঁটে, শেখে, হাসে, এবং ধীরে ধীরে নিজেদের স্থান খুঁজে নেয় এক নতুন সমাজে।

ইতালির বুকে জন্মানো মুসলিম যুবকরা তাদের পরিবার থেকে আসে, যারা সমাজে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। তাদের বাবা-মা ইসলামি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং সমাজসেবায় নিজেদের সময় ও শক্তি উৎসর্গ করেছে। ছোটবেলায় তারা এই কেন্দ্রগুলোতে বেড়ে ওঠে, যেখানে সবাই একত্রিত হয়, নতুন আগতদের সাহায্য করে, এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের মূল্য বোঝায়।

তরুণরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শনিবার বা রবিবারের বিকেলে তারা একত্রিত হয়, বসে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ভাবতে শুরু করে কীভাবে ইতালিয়ান জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের জীবন সাজানো যায়। তারা নিজেদের পরিচয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ, এবং ইতালিয়ান সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা করে।

তাদের মধ্যে কেউ কখনো মনে করেনি যে তাদের বাবা-মায়ের পথ অনুসরণ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। বরং, তারা সম্মান জানায় এবং বোঝে যে বাবা-মায়ের সক্রিয় ভূমিকা অনেকটা আত্মত্যাগের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই ইসলামি কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থান নয়; এটি হলো নতুন আগতদের জন্য আশ্রয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহায়তার কেন্দ্র।

ইতালিয়ান সমাজের সঙ্গে মিশে থাকা এই যুবকদের জীবনও কিছুটা ভিন্ন। মুসলিম যুবক-যুবতিদের জন্য আলাদা স্থান নেই, ছেলেরা এবং মেয়েরা একসাথে অংশগ্রহণ করে এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব নেয়। অনেক সময় মেয়েরাই ছেলেদের চেয়ে বেশি সক্রিয় এবং নেতৃত্বে এগিয়ে থাকে। বাবা থেকে ছেলে পর্যন্ত প্রজন্মান্তরে এই কেন্দ্রের নেতৃত্ব স্থানান্তর হয়-প্রায় একধরনের পরিবারের রীতিতে পরিণত হয়। তবুও তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতালিয়ান অভ্যাস, ভাষা, পোশাক সবকিছু

ধরে রাখে। এমনকি প্যান-ইউরোপীয় মুসলিম যুবক সমাবেশে পৌঁছালে, তারা সহজেই ইতালি থেকে এসেছে বলে চেনা যায়।

আমি একবার বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে একদল ইতালিয়ান ছেলে মেয়েদের দেখলাম। তারা "ট্যানেল অব হোপ" ভিজিট করছিল। আমিও তখন "ট্যানেল অব হোপ" ভিজিট করছিলাম। তাদের সেই দলে তিন চার জন মুসলিম তরুনীদের দেখলাম যারা ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে, আবার তাদের মাথায় হিজাব। গায়ের রং দেখে বোঝা যায় যে বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি। এসব দৃশ্য এখন আর নতুন নয়।

তাদের জীবন অন্যান্য অভিবাসী যুবকদের মতোই একপাশে খোলামেলা মনোভাব, অন্যপাশে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। তবে ধর্মীয় পরিচয় তাদের বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। যারা ইতালিতে জন্মেছে, তারা নিজেদের "ইতালিয়ান" মনে করে এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানও বেশি। তবুও নিজেদের পরিচয় খুঁজে পাওয়া সব সময় সহজ নয়। কারো জন্য ধর্ম উত্তরাধিকার, যা ধীরে ধীরে নিজেরভাবে বোঝা যায়; কারো জন্য ধর্ম জীবনের মূল অংশ। অনেক সময় তারা ধর্মকে শুধু পরিচয়ের অংশ হিসেবে ধারণ করে একধরনের "ফ্যাসাদ", যা তাদের জীবনের মজাদার, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের সঙ্গে মিলিত হয়।

রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, এই যুবকরা প্রায়শই বামপন্থী দল বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ডানপন্থি দলে অভিবাসীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থাকায় এটাই স্বাভাবিক। তবে তাদের পরিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিবার, নারীর ভূমিকা, শৃঙ্খলা বেশির ভাগ সময় রক্ষণশীল আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি ভিন্ন ধরনের দ্বিতীয় প্রজন্ম হলো ইতালিয়ান পিতামাতার সন্তানরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের বাবা-মা প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে চরম বামপন্থি বা ডানপন্থি ছিল, এবং ইসলাম গ্রহণকে নতুন প্রতিরোধের রূপ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মিশ্র দম্পতিদেরও এক ভিন্ন গল্প আছে। একজন মুসলিম এবং অন্যজন খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের পরিবারে জন্মানো। তারা সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা কীভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কেউ সন্তানদের বড় হয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয়, কেউ দু-ধর্মের উৎসব উদ্‌যাপন করে। কখনো কখনো একজন অংশগ্রহণকারী ধর্মের অধীনে চলে আসে এটি অনেক সময় পারিবারিক সম্মান বা আনুষ্ঠানিকতার

কারণে হয়। তবে কিছু দম্পতি সত্যিই উভয় ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করে, এবং priest বা imam-এর তত্ত্বাবধানে এই মিলন ঘটিয়ে থাকে।

যখন পরিবারের পছন্দও বিবেচনা করা হয়-সঙ্গে ধর্ম এবং জাতীয়তার ব্যাপার, তাহলেও এই মিশ্র দম্পতিদের অস্তিত্ব দেখায় যে ইয়েসীর মুসলিম দ্বিতীয় প্রজন্মের জীবনে গভীর পরিবর্তন এবং নতুন দিগন্ত আসছে। তারা শুধু পরিবার বা ধর্মের উত্তরাধিকার নয়; তারা নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব জীবনধারা, এবং নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলছে।

একবার ইতালির মিলান ও উত্তর ইতালির কিছু যুবক ও যুবতি মিলে একটা সেমিনারে অংশ নেয়। আলোচনার বিষয়গুলো তাদের বয়সের এবং বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নিজেকে বোঝা, ধর্ম এবং আধুনিক জীবন, নারীর স্থান, রাজনীতি, বিশ্বাস ও যুক্তি, সব মিলিয়ে একটি জটিল পরিপ্রেক্ষিত। তারা চায় মুক্তি-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইতালিয়ান নাগরিক হিসেবে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের পরিচয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে।

এই আলোচনা থেকে একটি ডিভিডি তৈরি হয় “Conosciamo l’Islam: Giovani musulmani italiani”। এখানে তারা নিজেদের বাস্তবতা তুলে ধরেছে। ভিডিওতে ছিল সিরিয়ার এক যুবক, যিনি মিলানের Stazione Centrale-এ হত্যার শিবিরে পাঠানো ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, এবং পরে সেই অনুষ্ঠানে প্যালেস্টাইনির একটি মেয়ের উপস্থিতিও ছিল। এ ছাড়াও ছিল এক মিশরীয় মেয়ের গল্প, যিনি ইতালিতে জন্মেছেন, কাথলিক ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং স্থানীয় প্যারিশ যুবক কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদ্যোগ হলো মাসিক ম্যাগাজিন “Yalla Italia”। এখানে মুসলিম যুবকরা, খ্রিষ্টান আরব এবং অ-ধর্মীয় আরব যুবকরা নিজেদের লেখা প্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যার বিষয় ছিল হাস্যরস। তারা শিখেছে “হাসুন, পৃথিবীও আপনাকে হাসাবে।” আরব যুবকদের মধ্যে ভাষার সঙ্গে খেলা করা একটি প্রাচীন আনন্দ, কিন্তু কখনো কখনো তারা ভাষাকে ব্যবহার করে নিজেদের আবেগ ও সীমা প্রকাশ করতে পারে।

পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। মিলানের এক মিশ্র পরিবারে বড় হওয়া মেয়েটি যখন স্কুলে আরবি ভাষার কোর্সের প্রস্তাব পায়, সে হেসে বলে: “আমি কোনো অভিবাসী নই!” অন্যেরা আনন্দের সঙ্গে

কোর্সে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা প্রায়শই মধ্যবয়সী স্কুলে এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের পার্থক্য দেখায়। এই পরিচয় খোঁজার জটিলতা তাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ।

তাদের বড় হওয়া, ধর্ম ও ইতালিয়ান সমাজের মধ্যে মানিয়ে নেওয়া, পরিবারিক মানসিক চাপ সবকিছুই একটি অবিরাম, জটিল যাত্রা। এই যুবকরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে তাদের পরিচয় খুঁজে পেতে, নিজেদের স্থান তৈরি করতে এবং সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে। তারা জানে, যদিও প্রতিদিনের বাস্তবতা জটিল, তবে চলতে চলতে তারা নিজেদের পথে এগোতে পারে “And yet it moves.”

রোমের ভোরবেলা। মসজিদের মিনার থেকে আজান ভেসে আসছে না, বরং ভ্যাটিকানের ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে শহরজুড়ে। তবুও, এই নগরীতেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ-গ্র্যান্ড মসজিদ অব রোম। ইতালি আসলে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে এক দ্বিধার মোড়ে: একদিকে গভীর খ্রিষ্টান ঐতিহ্য, অন্যদিকে মুসলিম অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি।

দোকানপাট খোলার আগে শহরের অলিগলিতে হাঁটলে চোখে পড়ে নানা দেশের মানুষ। মরক্কোর তরুণেরা ছোট রেস্টুরেন্টে কাজ করছে, বাংলাদেশিরা বাজারে সবজি বিক্রি করছে, পাকিস্তানিরা চালাচ্ছে টেলিফোন-ইন্টারনেটের দোকান, মিশরীয়রা ট্যাক্সি চালাচ্ছে। সংখ্যাটা ছোট নয়; প্রায় ৬০ লক্ষ মুসলিম এখন ইতালিতে বসবাস করছে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। ২০৫০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে দ্বিগুণের কাছাকাছি। (অফিসিয়্যালি ইতালিতে মুসলিমদের প্রকৃত সংখ্যা কোথাও উল্লেখ নেই, কারণ আদমশুমারিতে ধর্ম পরিচয় উল্লেখ করা হয় না।)

তবে তাদের ধর্মীয় পরিসর একেবারে সহজ নয়। ইতালির সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু ইসলাম এখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে দেশজুড়ে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি নামাজের স্থান থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত মসজিদ মাত্র আটটি। অধিকাংশ নামাজঘরই মূলত কমিউনিটি ভিত্তিক, যেখানে মরক্কানরা মরক্কানদের সঙ্গে, বাংলাদেশিরা বাংলাদেশিদের সঙ্গে, পাকিস্তানিরা পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিলিত হয়। ভাষা, সংস্কৃতি আর মাজহাবের ভিন্নতা তাদের আলাদা করে রাখে। মালিকি মাজহাব যেমন মরক্কানদের মধ্যে প্রচলিত, আবার দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমরা হানাফি মাজহাব মেনে চলে।

এ বিভাজনের ভেতরেও কিছু বড় নাম উঠে আসে। রোমের গ্র্যান্ড মসজিদের ইমামরা পড়াশোনা করেছেন আল-আজহার থেকে, রাভেন্নার ইমাম এসেছেন সৌদি আরব থেকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে-এমন শিক্ষিত আলেমের সংখ্যা হাতেগোনা। অধিকাংশ মসজিদেই স্থানীয় ভ্রাতারা নিজেরাই ইমামের দায়িত্ব পালন করেন, অথচ তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ভেতর ঘাটতি স্পষ্ট। অনেক সময় সলাফি, সুফি কিংবা শিয়া-সুন্নি, তাবলিগ ও জামায়াত বিভেদ আরও বাড়িয়ে তোলে কমিউনিটিকে।

এদিকে ইতালিয়ান সমাজে ইসলামকে প্রায়শই দেখা হয় অভিবাসনের আলোকে। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে আসা নতুন ঢল মুসলিম পরিচয়ের সঙ্গে মিলে গেছে, আর ডানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে একধরনের হুমকি হিসেবে প্রচার করছে। উত্তরাঞ্চলীয় লোম্বার্দিয়া অঞ্চলে গৃহীত "অ্যান্টি-মসক ল" প্রমাণ করে কতটা জটিলতা তৈরি হয়েছে নতুন মসজিদ নির্মাণে। ফলে অনেক মুসলিম সংগঠন বাধ্য হয়ে গ্যারেজ, দোকান কিংবা ছোট হলঘর ভাড়া করে নামাজ আদায় করে।

তবুও ইসলাম ইতালির অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হালাল পণ্যের বাজার ২০২৪ সালেই সাত বিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে গেছে। ইতালির নামকরা কোম্পানিগুলো এখন হালাল সার্টিফিকেশন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শুধু আরব দেশগুলোতে রপ্তানির জন্য নয়; বরং ইউরোপের ভেতরে ক্রমবর্ধমান মুসলিম বাজারের জন্যও। মুসলিম নারীরা অনলাইনে পোশাক, হালাল প্রসাধনী আর গৃহস্থালী সামগ্রী বিক্রি করে গড়ে তুলছে নতুন উদ্যোক্তা সংস্কৃতি।

কিন্তু এই সবকিছুর ভেতরে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ইতালির রাজনীতিতে হঠাৎ পরিবর্তন হলে মুসলিমদের অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনেক সময় স্থানীয় মেয়র বা প্রশাসনের কাছে মসজিদের অনুমোদন চাইতে গিয়ে অবিশ্বাসের দেয়ালে ঠেকে যায় কমিউনিটি। এজন্য প্রয়োজন এমন নেতাদের, যারা ইতালিতে জন্ম নেওয়া মুসলিম এবং স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

শহরের অলিগলিতে যখন শুক্রবারের দুপুরে ছোট ছোট জামাতে নামাজের জন্য লোকজন ভিড় করে, তখন মনে হয় এই প্রার্থনার জায়গাগুলো আসলে শুধু ইট-পাথরের স্থান নয়। এগুলোই হলো একধরনের নতুন সাংস্কৃতিক সেতু, যেখানে মরক্কান, আলবেনীয়, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি কিংবা মিশরীয় একই কাতারে

দাঁড়ায়। যদিও সমাজ তাদের এখনো "অভিবাসী" হিসেবে চেনে, তবুও ধীরে ধীরে এ কাতারগুলোই ইতালির ভবিষ্যৎ বহুসাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলছে।

ইতালির মাটিতে মুসলিম অভিবাসীদের জীবন অনেক সময় শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং আইন আর সংস্কৃতির দোটানায় বিপাকে পড়তে হয়। প্রতিটি পরিবার নিজের সন্তানকে ইসলামি শিক্ষা দিতে চাইছে-এ যেন তাদের কাছে ধর্মীয় দায়িত্ব। নামাজের বিষয়ে কড়াকড়ি করা, সন্তানকে শাসন করে শৃঙ্খলায় রাখা এসব মুসলিম বাবা-মায়ের কাছে শুধু পারিবারিক দায়িত্ব নয়; বরং রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ পালন।

কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে বিষয়টা ভিন্নভাবে দেখা হয়। এখানে শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মানসিক সুরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ফলে বাবা-মা যদি সন্তানের ওপর সামান্য কড়া শাসনও করেন, কিংবা নামাজের জন্য জোর দেন, তখনই আশঙ্কা তৈরি হয় যে এটি শিশু-অধিকার লঙ্ঘনের আওতায় পড়তে পারে। কোনো প্রতিবেশী বা স্কুল শিক্ষক বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিল বা সোশ্যাল ওয়ার্কারদের কাছে জানালে সেই পরিবার কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। শিশুটি যখন স্কুলে যায়, সন্দেহজনক কোনো আচরণ টের পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকগুলো বিষয় তারা জানতে চেষ্টা করে। অনেক সময় শিশুর চোখ, মুখ ও শরীরের দৃশ্যমান অংশও চেক করে। কারণ, শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতনের প্রাথমিক চিহ্নগুলো তো এসব স্থানেই দৃশ্যমান হয়। কখনো কখনো শিশুর চোখের নিচের দিকেও তল্লাশী করা হয়।

এমনও ঘটনা ঘটেছে যে বাবা-মায়ের সামান্য বকাঝকা বা শাসনের কারণে পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করেছে। কখনো কখনো শিশুকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ক্যাম্পে রাখা হয়। এই ক্যাম্পে বাচ্চাদের রাখার নাম দেওয়া হয় "নিরাপত্তা," অথচ বাস্তবে পরিবার ভেঙে যায়, বাবা-মা আর সন্তান বছরের পর বছর দূরত্বে কাটায়। বাবা-মায়ের জন্য এটি কেবল আইনি লড়াই নয়, হৃদয়ের গভীরে এক অসহনীয় বেদনা।

এই দ্বন্দ্বের মূলেই রয়েছে দুটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলিম পরিবারের কাছে ধর্মীয় শৃঙ্খলা মানে আল্লাহর নির্দেশ পালন, আর ইতালিয় আইনের চোখে শিশুর ওপর চাপ মানেই সম্ভাব্য মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি বারবার একে অপরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, আর অভিবাসীরা হয়ে পড়ে অসহায়।

ইতালির সমাজে ইসলাম এখনো মূলত অভিবাসীদের ধর্ম হিসেবে দেখা হয়। তাই মুসলিম পরিবারের প্রতিটি অভ্যাস, প্রতিটি রীতি প্রায়শই অতিরিক্ত নজরে আসে।

ফলে নামাজ শেখানো বা সন্তানকে ইসলামের নিয়ম মেনে চলার শিক্ষা দিতে গিয়ে যে শাসন বা কড়াকড়ি করা হয়, সেটাই হয়ে ওঠে আইনি বিপত্তির কারণ। অনেক পরিবার তাই দ্বিধায় ভোগে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করবে, নাকি আইনগত জটিলতার ভয়ে তা থেকে বিরত থাকবে।

এই সংকট কেবল আইন বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মুসলিম অভিবাসীদের মনোজগতে একধরনের অব্যক্ত চাপ তৈরি করে। পরিবার ভেঙে যাওয়ার ভয়, সন্তানকে হারানোর আতঙ্ক এসব তাদের প্রবাস জীবনের বাস্তবতা, যা কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানসিক সংগ্রামকেও প্রতিদিন নতুন করে উসকে দেয়।

বইয়ের বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা মেলে ইতালির মিলান শহরে একসময় বসবাসকারী আজাদ হোসেন নামে এক বাংলাদেশির সাথে। তার বিশেষ অনুমতি নিয়েই এই প্রবন্ধ লিখেছি। আজাদ হোসেনের গল্প আসলে কোনো একক পরিবারের কাহিনি নয়; বরং অভিবাসী মুসলিম জীবনের গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। প্রায় চার বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটি আজও প্রমাণ করে কীভাবে আইন ও সংস্কৃতির দোটানায় পড়ে পরিবারগুলো ভেঙে যায়, আর সন্তানরা হারিয়ে ফেলে তাদের শেকড়, বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ।

আজাদের মেয়ে (সংগত কারণে নাম গোপন রাখা হলো), যে ছিল একজন সাধারণ স্কুলছাত্রী, তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। স্কুলের পড়াশোনার অংশ হিসেবে কম্পিউটার শিখতে গিয়ে সে পরিচিত হয় এক ইতালিয় ছেলের সঙ্গে। প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর ধীরে ধীরে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, যা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নয়। বাবা-মায়ের কাছে বিষয়টি তবুও সন্দেহজনক মনে হলে তারা স্বাভাবিকভাবেই মেয়েকে প্রশ্ন করেন এবং কিছুটা বকাঝকাও করেন। মুসলিম পরিবারে এটি অস্বাভাবিক নয়, বিশেষ করে ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকে বাবা-মা সন্তানকে নামাজ ও নৈতিকতার বিষয়ে কড়া হতে চায়। কিন্তু এখানেই শুরু হয় বিপত্তি।

পরদিন মেয়েটি স্কুলে না গিয়ে তার বন্ধুকে পুরো ঘটনা বলে দেয়। বন্ধুটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায়, আর স্কুল কর্তৃপক্ষ খবর দেয় সোশ্যাল সার্ভিস ও পুলিশকে। তদন্তে বাবা-মায়ের বকাঝকা প্রমাণিত হয়, এবং তা শিশু অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ মেয়েকে পরিবার থেকে আলাদা করে নিয়ে যায়। আজও সে সোশ্যাল কেয়ারের অধীনে আছে, মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল আছে।

আজাদ ও তার স্ত্রী লোকলজ্জা ও সামাজিক চাপের কারণে ইতালি ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে চলে গেছেন। অথচ এই বিচ্ছেদ তাদের জীবনে শুধু ভৌগোলিক নয়, মানসিক ব্যবধানও তৈরি করেছে।

আমি নিজে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার বাবার থেকে নম্বর সংগ্রহ করে অনেক সময় ধরে কথা বলার চেষ্টা করেছি। অকপটভাবে সে তার মনের কথাগুলো বলে ফেলে। কথার শুরুই হয়েছিল তার বাবার রূঢ় আচরণ ও উগ্র মেজাজের বিভিন্ন বিষয় দিয়ে। তার কথায় ফুটে উঠল এক অদ্ভুত শূন্যতা "আমার হাতে আর কিছু নেই। আমি আমার দ্বীন হারিয়েছি, সংস্কৃতি হারিয়েছি, বিশ্বাস হারিয়েছি, আমি এখন আর মুসলিম না।" সে আরও বলেছিল, "আমি সমাজে ফিরতে চাই না। কারণ, সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না।"

এই একটি বাক্যে ধরা পড়েছে অভিবাসী মুসলিম পরিবারের পুরো সংকট। একদিকে আছে ইতালির আইন, যেখানে শিশুদের স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে আছে মুসলিম পরিবারিক সংস্কৃতি, যেখানে বাবা-মা সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলায় রাখতে চান। এই দুই ব্যবস্থার সংঘর্ষের শিকার হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

ইতালির আইনি কাঠামোতে শিশুদের শারীরিক বা মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ করা গুরুতর অপরাধ। এমনকি ধর্মীয় কারণে হলেও বাবা-মায়ের কড়া শাসন আইন ভঙ্গের শামিল। অথচ ইসলামি শিক্ষায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তানকে নামাজ শেখানো ও শাসন করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। এই দ্বন্দ্বই অনেক সময় পরিবারগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

আজাদের ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় সোশ্যাল সার্ভিসের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ। অভিযোগ উঠেছে, অনেক সময় মুসলিম পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া মাত্র সন্তানদের আলাদা করে নেওয়া হয়, অথচ তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি বিবেচনায় আনা হয় না। একবার সন্তান সোশ্যাল কেয়ারের আওতায় চলে গেলে বাবা-মায়ের জন্য তাকে ফেরত পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কীভাবে তারা নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখবে, অথচ একই সঙ্গে ইতালির আইনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে?

আজাদের কাহিনি হৃদয়বিদারক, কিন্তু একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে না। ইতালির বিভিন্ন শহরে এমন বহু পরিবার একই সংকটে আছে। অনেক বাবা-মা ভয়ে সন্তানদের সাথে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করেন না, আবার যারা করেন, তারা আইনের কবলে পড়ে যান। ফলে প্রজন্মের মধ্যে একধরনের দূরত্ব ও অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে।

আজাদের মেয়ের মতো অনেক তরুণী ও তরুণ আজ প্রশ্ন করছে "আমরা আসলে কার? আমরা কি মুসলিম সমাজের অংশ, নাকি ইতালিয় সমাজের?" এই অনিশ্চয়তা শুধু তাদের নয়, পুরো অভিবাসী সমাজকেও গ্রাস করছে।

এই গল্প তাই কেবল একটি পরিবারের দুঃখগাথা নয়; বরং ইউরোপে বসবাসরত মুসলিম অভিবাসী সমাজের ভবিষ্যতের জন্য এক বড় সতর্কবার্তা।

ইতালির বোলোনিয়া শহরে ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আজ এক জটিল কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তবতা। একসময় শহরের প্রান্তে একটি পুরনো গুদামঘর রূপান্তরিত হয়েছিল ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে, যা আজ বোলোনিয়ার বৃহত্তম নামাজঘর। সেখানে প্রতি শুক্রবার শত শত মুসলিম একত্র হন একসময়ের ছোট সম্প্রদায় এখন হাজারো মানুষের প্রাণের আশ্রয়। সেন্টারের সভাপতি মোহাম্মদ রেদওয়ান আলতুনজি, যিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সিরিয়া থেকে ইতালিতে আসেন, বলেন, "আমরা একসময় কয়েকজন ছিলাম, এখন আমরা হাজারে পৌঁছেছি।"

তবে এই সম্প্রসারণের সাথে এসেছে বিরোধ ও বিভাজনের রাজনীতি। ২০০৭ সালে যখন শহরে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তখন ডানপন্থি "লেগা নর্দ" দলের নেতারা "পিগ ডে" পালনের আহ্বান জানায় যেন মসজিদের জমি 'অপবিত্র' করা যায়। এমনকি কিছু ক্যাথলিক গির্জার নেতারাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। স্থানীয় প্রশাসন প্রথমে অনুমোদন দিলেও পরবর্তীতে জনমতের চাপে পিছিয়ে যায়।

বোলোনিয়া সমাজ অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির পক্ষে থাকলেও, যেমন শহরের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক "ডিনো কোক্কিয়ানেলা" বলেন, "আমরা এমন এক সমাজ চাই যেখানে ভিন্ন সম্প্রদায়গুলো একে অপরের কাছ থেকে শেখে একীভূত নয়, অন্তর্ভুক্ত হয়।" কিন্তু বাস্তবতা হলো, শহরের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ এখন বিদেশি নাগরিক এবং এর ফলে "আক্রমণের ভয়" বা "Islamophobia" ক্রমেই বেড়েছে।

এ অবস্থায় তরুণ নেতা “ইয়াসিন লাফরাম” ও তাঁর সংগঠন “Islamic Community of Bologna (CIB)” এগিয়ে আসে। তাদের লক্ষ্য নতুন মসজিদ নির্মাণ নয়; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃশ্যমানতা ও ইতিবাচক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। লাফরাম বলেন, “আমরা চাই মানুষ বুঝুক আমরাও বোলোনিয়ার নাগরিক। আমরা এখানে আছি, এবং এখানেই থাকব।”

বোলোনিয়ার তরুণ ক্যাথলিক শিক্ষক “আইরিন” যেমন বলেন, “আমাদের ভয়টা অযৌক্তিক ‘অন্যের’ উপস্থিতি মানে নিজের পরিচয় হারানো নয়।” আবার পাদরি “ডন স্টেফানো ওতানে” আশা করেন, “একদিন হয়তো বোলোনিয়ার আকাশে মিনার দেখা যাবে। কিন্তু সে পথে যেতে হলে দরকার পারস্পরিক প্রার্থনা ও বোঝাপড়া।”

বলনিয়ার একটা মসজিদ। ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বাহিরেও মুসুল্লিরা নামাজ আদায় করছেন।

আজকের বোলোনিয়া তাই এক প্রতীক যেখানে মুসলিমরা সংগ্রাম করছে তাদের ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার জন্য, আবার একই সঙ্গে গড়ে তুলছে সহাবস্থান ও নাগরিক পরিচয়ের নতুন সংলাপ। যেমন ইয়াসিন লাফরাম বলেন,

"আমরা বোলোনিয়ার মুসলিম। আমাদের প্রয়োজন যেন শহরের প্রয়োজন হয়ে ওঠে, তবেই প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি সম্ভব।"[৪৩]

কিন্তু এই সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ইতালির মুসলিমরা কেন ঈদের দিনে জাতীয় বা স্কুল পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ছুটি পান না? এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি জড়িত ইতালির রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মীয় নীতিমালা এবং "ইন্তেসা" (intesa) নামক একটি আইনি চুক্তির সঙ্গে।

ইতালির সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলেও, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী সরকারিভাবে বিশেষ অধিকার পেতে হলে তাদেরকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি ইন্তেসা স্বাক্ষর করতে হয়। খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম, বৌদ্ধধর্মসহ বহু ধর্ম ইতোমধ্যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ইসলাম এখনো একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে "ইন্তেসা" সম্পন্ন করতে পারেনি। কারণ ইতালির মুসলিম সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধারা, ভাষা, জাতিগত পরিচয় ও নেতৃত্ব কাঠামোর কারণে একটি একীভূত প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে পারেনি। ফলস্বরূপ, ইসলাম এখনো ইতালিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ স্বীকৃত ধর্মের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অনুপস্থিতিই মুসলিমদের ঈদের ছুটি না পাওয়ার মূল কারণ। ইতালিতে ঈদকে এখনও একটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা হয় না। তবে কিছু বিদ্যালয়, বিশেষত যেসব অঞ্চলে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি তারা নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ঈদের দিনে স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সিসিলি, লোম্বার্ডি বা টুরিনোর কয়েকটি বিদ্যালয় এভাবে তাদের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান জানাতে বিকল্প ছুটির ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু এগুলো স্থানীয় সিদ্ধান্ত, জাতীয় নীতির অংশ নয়।

সম্প্রতি এই ইস্যু রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। একজন ইতালিয় পার্লামেন্ট সদস্য সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যাতে ঈদুল ফিতরকে জাতীয় ছুটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনা শুরু হয়। যদিও এই আলোচনা এখনো বাস্তব পরিবর্তনের স্তরে পৌঁছায়নি, তবে এটি সংকেত দিচ্ছে যে মুসলিম উপস্থিতি এখন আর অদৃশ্য বা উপেক্ষিত নয়; বরং ইতালির সামাজিক কাঠামোতে এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান গ্রহণ করছে।

---

[43] সূত্র আলজাজিরা-সিয়ান ও'লৈইল। ২৮ জুলাই ২০১৫

ইতালির দীর্ঘ খ্রিষ্টান সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব স্বীকার করেই বলা যায় সমতা ও নাগরিক অধিকার কোনো একক ধর্মের সম্পত্তি নয়।

ঈদের ছুটি শুধু একটি ধর্মীয় আচার পালনের সুযোগ নয়, এটি সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতির প্রতীক। সমাজে মর্যাদার প্রতীক যখন সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সহাবস্থান আরও ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক হয়ে ওঠে।

ইতালিতে ঈদের ছুটির প্রশ্নটি কেবল প্রশাসনিক নিয়ম নয় এটি সমানাধিকার, নাগরিকত্ব, নৈতিক ন্যায় ও সাংস্কৃতিক সম্মানের এক বৃহত্তর আলোচনার অংশ। ভবিষ্যতে মুসলিম সম্প্রদায় যদি ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ফলপ্রসূ সংলাপের পথ তৈরি করতে পারে, তবে একদিন ঈদের সকাল ইতালিতে শুধু ঘরোয়া আনন্দ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আলোয় উদ্ভাসিত হবে এমন প্রত্যাশা অসম্ভব নয়।

নবম শতকের ইউরোপ এবং মেডিটেরিয়ান

"For us Muslims in Italy, inter-religious dialogue has a fundamental role in today's world ... the underlying principles that religions have in common need to be underlined, starting with faith in the same God." — Ahmad Gianpiero Vincenzo

একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম ইতালিয়ান

হামজা রবার্তো পিকার্দোর জীবনের কাহিনি ইতালিয়ানদের মাঝে মুসলিম উপস্থিতির এক বাস্তব দিকচিত্র। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে ইতালির ইম্পেরিয়া শহরে জন্ম নেন তিনি। শৈশব ও কৈশোর ছিল একেবারেই ইতালিয় পরিবেশে, খ্রিষ্টান সংস্কৃতির ছায়াতে বেড়ে ওঠা। কিন্তু ১৯৭৪ সালে সামরিক সেবা শেষ হওয়ার পর তাঁর জীবনে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। তিনি আফ্রিকার পথে যাত্রা করেন, সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেন, এবং সেখানে মুসলিমদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ইসলামের সঙ্গে প্রথম এই পরিচয় তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এর ফলেই ১৯৭৫ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলামে প্রবেশের পর তাঁর অনুশীলন ছিল ধাপে ধাপে। নামাজ শুরু করেন ১৯৮৪ সালে, আর রোজা পালনে নিয়মিত হন প্রায় পাঁচ বছর পরে। জীবনধারায় এই পরিবর্তন ধীরগতি হলেও ছিল স্থায়ী ও দৃঢ়। ইসলামকে কেবল বিশ্বাস নয়, একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও তিনি দেখতে শুরু করেন।

১৯৯৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "আল হিকমা প্রকাশনা সংস্থা"। এই সংস্থা ইসলামি গ্রন্থের ইতালিয় অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকে। তারই উদ্যোগে ইতালিয় ভাষায় প্রথমবার মুসলিমদের দ্বারা কুরআনের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি ইতালিয় মুসলিমদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ মাধ্যম হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে ইতালির মুসলিমরা কুরআনের পাঠে ভাষাগত বাধায় ভুগছিলেন। তাঁর অনুবাদ সে অভাব পূরণ করে এবং ইসলাম চর্চায় নতুন এক সুযোগ সৃষ্টি করে।

কেবল প্রকাশনা নয়, তিনি ইতালির মুসলিম সংগঠন "ইউসিওআইআই"-এর সঙ্গেও যুক্ত হন। তিনি ছিলেন সংগঠনের পর্ষদ সদস্য ও মুখপাত্র। যদিও বর্তমানে তিনি কোনো নির্বাহী দায়িত্বে নেই, তবুও দীর্ঘদিন ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম

সম্প্রদায়ের বিষয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া ইউরোপীয় মুসলিম নেটওয়ার্কেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তাঁর কাজ সব সময় ইতিবাচকভাবে গৃহীত হয়নি। কুরআনের অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত কিছু টীকা ও ব্যাখ্যা সমালোচিত হয়, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টান প্রসঙ্গে। তবুও তাঁর অনুবাদ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকে তাঁকে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখেছেন, আবার অনেকে সমালোচনা করেছেন।

পিকার্দো বিশ্বাস করতেন ইসলাম ও ইতালিয় পরিচয় একসঙ্গে চলতে পারে। তিনি মনে করতেন, ইসলাম মানে শুধু ইবাদত নয়; বরং সমাজে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ। স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম পালনকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সম্প্রদায়কে ইতালির মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করেছে।

তিনি শুধু অনুবাদক নন, লেখকও। তিনি ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও গবেষণা প্রকাশ করেছেন। নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন নিয়ে বই লিখেছেন, ইসলামি সংস্কৃতি ও পরিচয় বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ইতালিয় পাঠকদের মধ্যেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মুসলিম সমাজের ভেতরে বিভাজন, রাজনৈতিক চাপ, এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সবই তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। তবুও তিনি ইসলাম প্রচার ও শিক্ষার কাজে অবিচল থেকেছেন।

এইভাবে হামজা রবার্তো পিকার্দো ইতালিতে ইসলামকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবন কেবল একজন ধর্মান্তরিত মুসলিমের গল্প নয়; বরং ইতালিতে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশের বাস্তব ইতিহাসের অংশ।

এক হামজা শুধু নয়; বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের প্রারম্ভে এসে ইতালিজুড়ে প্রায় লাখ খানেক হামজার উত্থান ঘটেছে। তাদের প্রত্যেরকের কাহিনি এক একটা উপাখ্যান। যদি কখনো সুযোগ হয় এসব হামজাদের জীবনগল্প নিয়ে আলাদা বই রচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

হামজার কাজের প্রভাব খুব দ্রুত ইতালির বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরই মাঝে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশের মুসলিম অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রয়োজন হয়ে পড়ে মুসলিম তরুণদের সংগঠিত করার পাশাপাশি তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এরই

ধারবাহিকতায় ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে আনকোনা শহরে কয়েকজন মুসলিম ছাত্রের উদ্যোগে UCOII-এর জন্ম হয়। তখনকার দিনে এটি ছিল ছোট্ট একটি উদ্যোগ, শুধু মুসলিমদের জন্য সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সমর্থনের জন্য। শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল ইতালিতে মুসলিম সম্প্রদায়কে সংবিধানসম্মত অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা। ছোট্ট এই সূচনাটি ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ সংগঠনে রূপ নেয়, যা আজ পুরো ইতালির মুসলিম সমাজের জন্য কার্যকর একটি কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম থেকেই UCOII চেষ্টা করেছে মুসলিমদের ইতালিয় সমাজে মান্যতা দেওয়ার জন্য। তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র নামাজের স্থান তৈরি করা নয়; বরং তারা চাইছে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত কর্মকাণ্ডকে দৃশ্যমান করা। আব্রুজ্জো বা এমিলিয়া রোমাগনারের ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের সময় তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। লাম্পেদুসায় সিরীয় শরণার্থীদের জন্য ইসলামিক কেন্দ্রগুলো খুলে দেয়, মানবিক সহায়তা প্রদান করে।

তাদের কাজ শুধু সহায়তা বা হিউম্যানিটারিয়ান কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। UCOII সচেতনতা বাড়াতে, ইতালির সমাজে মুসলিমদের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরতে নানা প্রচারণা চালায়। ভাষা শেখানো, সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতা, পরিবার ও ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজকে নিজস্ব পরিচয় রেখে সমাজে একীভূত করতে সাহায্য করে।

যদিও ইতালিতে ইসলাম এখনও একটি "মাইগ্র্যান্টের ধর্ম" হিসেবে দেখা হয়। অনেক সময় সমাজ মুসলিম ও অভিবাসীকে এক করে দেখে এবং কখনো কখনো নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। কিছু স্থানীয় প্রশাসনিক বাধা, মসজিদ নির্মাণে প্রতিরোধ এবং সামাজিক সন্দেহ এসবই মুসলিমদের অবস্থানকে কঠিন করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে UCOII সদস্যদের আইনি সহায়তা প্রদান করে, প্রশাসনিক ঝুঁকি মোকাবিলা করে এবং সংবিধানসম্মত অধিকার রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

UCOII-র আরেকটি দিক হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে তারা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভ্রাতৃত্বের সেতু গড়ে তোলে। বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো, ভ্যাটিকানের সভা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ এসব কার্যক্রম ইতালির মুসলিম সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

এভাবে, ১৯৯০ সালে ছোট্ট উদ্যোগ হিসেবে শুরু হওয়া UCOII আজ ইতালিয়ার মুসলিম সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমদের অধিকার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, মানবিক সহায়তা এবং ধর্মীয় সংলাপ এসব ক্ষেত্রে সংগঠনটির ভূমিকা অত্যন্ত প্রভাবশালী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনও ইতালির মুসলিমরা রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও চুক্তি না থাকায় তাদের অধিকার এবং স্থায়ী উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে সীমিত।

UCOII বুঝতে পেরেছে যে, শুধুমাত্র মানবিক বা সামাজিক কাজ করলেই হবে না; ইতালিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ এবং আইনি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় অপরিহার্য। এই দীর্ঘ পথের মধ্যে তারা শিক্ষিত ইমাম তৈরি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং আইন ও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় এসব মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক এবং স্বীকৃত জীবন নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

উপরোক্ত UCOII-৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইতালিয়ার মুসলিম সমাজকে সংবিধান-সম্মত অধিকার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা প্রদান করছে। এই প্রক্রিয়ায় তারা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক, মানবিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দৃঢ় ভূমিকা রাখছে, যা ভবিষ্যতে মুসলিমদের ইতালিয়ান সমাজে পূর্ণ স্বীকৃতির পথকে সুসংহত করবে।

ইউসিওআইআই জানায় যে তারা অন্যান্য ইসলামি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যাতে ধর্মীয় জ্ঞান, আইন ও শিক্ষা প্রসারিত করা যায়। ইউরোপীয় ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সংযোগ মূলত ধর্মীয় দিকনির্দেশনা, শিক্ষণীয় কোর্স এবং ইসলামি গবেষণার জন্য। একইভাবে মিশরের মুফতি আলী গোমা এবং ইসলামি পণ্ডিত তারিক রমজানের সঙ্গে সংযোগ থাকায় তারা ইতালির মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

ইউসিওআইআই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামি জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে এবং ধর্মান্তরিত ইতালিয় ও মুসলিম তরুণদের লেখালেখির ওপর গুরুত্ব দেয়। নারীদের অংশগ্রহণ এবং ইসলামি শিক্ষার প্রসারও তাদের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংগঠনটি বোঝাতে চেষ্টা করে যে এসব কার্যক্রম সামাজিক

সংহতি, সম্প্রদায়ের বিকাশ এবং ইতালিয়ান সমাজের সঙ্গে একীভূতির লক্ষ্যে পরিচালিত।

আমার এই গবেষণার সময় ইউকোই (সংক্ষেপে) (UCOII–Union of Islamic Communities in Italy) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত প্রায় ৯০,০০০ ইতালিয় নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যা ইতালিয় সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচক। এই ঘটনা এসেছে এমন একসময়ে যখন দেশটি মানসিক ও নৈতিক সংকটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিল। ইউকোই-এর সদস্য ইলজির ইজজেদিন "KlausCondicio" ইউটিউব প্রোগ্রামে মন্তব্য করেছেন, এই প্রবণতা কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের প্রতিফলন নয়; বরং অনেক ইতালিয় নাগরিক ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফল।

বর্তমানে ইতালিতে প্রায় ৬ মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করছে, যার মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজারের মতো ইতালিয় নাগরিক। দেখা যায় যে, মসজিদগুলোতে ইসলাম শিখতে আগ্রহী ইতালিয় নাগরিকদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এই বৃদ্ধি দেখায় যে মুসলিম সম্প্রদায় ইতালিয় সমাজে ক্রমবর্ধমানভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং স্থানীয় সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে। বিশেষ করে বড় শহরগুলো যেমনঃ রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স এবং বোলোনিয়ায় ইসলামি কেন্দ্র এবং মসজিদগুলো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, সামাজিক, শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

দেখা গেছে যে হালাল খাদ্য শিল্পও ইতালিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। এখন বড় শহরগুলোতে শুধু ছোট মুসলিম দোকান নয়, রেস্টুরেন্ট, সুপারমার্কেট এবং খাদ্য উৎপাদন কারখানাগুলোতে হালাল মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে। রোমের বড় হালাল ফুড শপ এবং সুপারমার্কেটগুলোতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মুসলিম গ্রাহকদের জন্য সহজলভ্য পণ্য সরবরাহ করা হয়। এই খাতটি কেবল ভোক্তা সম্প্রদায়কে সুবিধা দিচ্ছে না, বরং নতুন উদ্যোক্তা, ছোট ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করেছে। অনেক মুসলিম যুবক এবং ইতালিয় নাগরিক এখন হালাল ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

ইসলামি শিক্ষা ও মাদরাসা কার্যক্রমও সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী হয়েছে। শিশু এবং যুবকদের কুরআন শিক্ষা, ইসলামিক ইতিহাস, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে। রমজান, ঈদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো স্থানীয়

মুসলিমদের মধ্যে একতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রও তৈরি করছে। ফ্লোরেন্স এবং বোলোনিয়ার উদাহরণ দেখায়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় শহরের নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। তারা শুধুমাত্র মসজিদে নামাজ পড়েনি, বরং সমাজের জন্য এটি একটি পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেখা গেছে যে, আশির দশকে যে সব মুসলিম দোকান ও রেস্তোরাঁয় অ্যালকোহল এবং মদ বিক্রি করতে, তা এখন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে বিকল্প হিসেবে পাশাপাশি অন্য পণ্য বিক্রি করছে। মুসলিম অভিবাসীদের মাঝে এ এক বিপ্লবী পরিবর্তন। বহু শহরের এমন চিত্র। প্রায় প্রতিটি গ্রোসারী শপে এখন হালাল মাংস বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র মুসলিমরা নয় বহু ইতালিয়ানের পাশাপাশি অন্য অভিবাসীরাও সেসব মাংস ক্রয় করছে।

বিভিন্ন সংস্থা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এবং শহরের নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপ মুসলিম সম্প্রদায়কে সমাজের বৈধ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে। নতুন এবং তরুণ নেতৃত্ব এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা মুসলিম সম্প্রদায়কে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজের সঙ্গে সংলাপে সম্পৃক্ত করছে। এই উদ্যোগগুলি ইতালিয় মুসলিমদের জন্য স্থানীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করছে এবং তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ দিচ্ছে।

এইভাবে ইতালির মুসলিম সম্প্রদায় কেবল ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামাজিক, শিক্ষামূলক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজের সক্রিয় অংশ হয়ে উঠেছে। ইসলামি শিক্ষা, হালাল খাদ্য শিল্প, সামাজিক কার্যক্রম এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে মুসলিমরা ইতালিয় সমাজের সঙ্গে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যা আগামী দিনের ইতালিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করছে।

ইতালিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উপস্থিতি আজকের দিনে আরেক মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে হালাল ফুড শিল্পে এই পরিবর্তন সবচেয়ে দৃশ্যমান। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে কেউ ভাবতেই পারত না যে, রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স বা অন্যান্য বড় শহরে হালাল শপ এবং রেস্টুরেন্টগুলো এইভাবে ছড়িয়ে পড়বে। রোমের বিভিন্ন প্রান্তে এখন হালাল বাজার এবং দোকানগুলোতে কুরআন অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত মাংস, মশলাযুক্ত খাবার, তাজা সবজি ও ফলসহ

বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এমনকি সুপারমার্কেটের বড় শাখাগুলোতে এখন আলাদা হালাল সেকশন দেখা যায়, যা শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নয়, ভ্রমণকারী মুসলিম পর্যটক এবং স্থানীয় ক্রেতাদের জন্যও সুবিধাজনক।

শহরগুলোর বড় রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেগুলোও হালাল খাদ্য সরবরাহে অংশগ্রহণ করছে। ইতালিয় গ্রোসারি চেইন এবং হোটেলগুলোতে এখন বিশেষভাবে হালাল মেনু রাখা হয়। এই প্রবণতার কারণে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কুকিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, দোকান পরিচালনা, হোটেল ও রেস্তোরাঁর ম্যানেজমেন্ট মুসলিম যুবক ও যুবতীরা উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছে। তারা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করছে, হালাল কফি শপ, মিষ্টান্নের দোকান, অনলাইন হালাল খাদ্য বিক্রির প্ল্যাটফর্ম, এমনকি হালাল খাদ্য উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলছে।

হালাল মুরগি ও গরু ছাগলের গোশত যেখানে একসময় পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স হতে আমদানি করতে হতো; তা বর্তমানে নিজেদের দেশেই প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। বিভিন্ন শহরে হালাল মাংসের "প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র" (যেটাকে স্থানীয় ভাষায় মার্শেল্লারিয়া বলা হয়) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে মুসলিম কর্মচারীদের মাধ্যমে সরাসরি জবাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতালিয়ান মুসলিমদের উদ্যোগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। হালাল ফুড শপগুলোতে কেবল খাদ্য বিক্রি হয় না, বরং স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক মিলন ও সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিরও সুযোগ থাকে। মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারগুলোর পাশে অনেক সময় এই শপগুলো পরিবার ও যুবকদের জন্য মিলনক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। তারা শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ধর্মীয় নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোকে সমর্থন করে।

মাদরাসা এবং ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রমও সম্প্রদায়ের ভিত শক্তিশালী করেছে। শিশু ও কিশোররা কুরআন শিক্ষা, ইসলামিক ইতিহাস, নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। রমজান, ঈদ, কুরবানির মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কেবল প্রার্থনার জন্য নয়, সামাজিক সংহতি ও স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এবং নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপ মুসলিম সম্প্রদায়কে সমাজের বৈধ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে।

অন্যদিকে ইতালির মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং আধুনিক কার্যক্রম বোঝার জন্য COREIS বা The Islamic Religious Community of Italy-এর

উদাহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে মিলান শহরে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল-তাওহীদ মসজিদ। ইমাম ইয়াহ্যা সার্জিও ইয়াহে পল্লাভিচিনি, যিনি তরুণ নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি দেখেছিলেন যে মুসলিমরা কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইতালিয়ান সমাজের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে পারে। আজ COREIS কেবল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়; এটি সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসেবেও কাজ করে, যেখানে মুসলিমরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিক উদ্যোগ এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণের মাধ্যমে নিজেদের এবং সমাজের উন্নয়নে নিয়োজিত থাকে।

মিলান, রোম, টুরিনসহ অন্যান্য শহরেও COREIS-এর মসজিদগুলো কেবল নামাজের স্থান নয়; বরং স্থানীয় মানুষের জন্য বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত লাভ করেছে। শিশু ও যুবকদের কুরআন শিক্ষা, ইসলামিক ইতিহাস, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো COREIS-এর মূল কার্যক্রমের অংশ। তাদের বিশেষ তৎপতার ফলে হালাল খাদ্য শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে; খাদ্য উৎপাদন ও রেস্টুরেন্টগুলোতে হালাল মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে, যা স্থানীয় মুসলিমদের পাশাপাশি ভ্রমণকারী মুসলিমদের জন্যও সুবিধাজনক। রমজান, ঈদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রও তৈরি করে।

২০২০ সালে ইমাম ইয়্যা পল্লাভিচিনি নাহদ্লাতুল উলমা থেকে সার্কুলার জারি করা হয় যে তাদের প্রতিষ্ঠান যেন কোনোভাবেই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোনো রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হয়। প্রতিষ্ঠান যে সমাজ সংস্কার, তালিম-তারবিয়াত এবং সামাজিক কাজের মাধ্যমে নিজেদের সামগ্রিত তৎপরতাকে চলমান রাখে।

COREIS আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সক্রিয়। মুসলিম এবং নন-মুসলিমদের মধ্যে সংলাপ ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। ইমাম ইয়াহ্যা পল্লাভিচিনি বারবার জোর দিয়ে বলছেন, ২১ শতকে মুসলিমদের জন্য সুযোগ রয়েছে নন-মুসলিম সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে মানবতার কল্যাণে কাজ করার। ধর্মকে রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসেবে নয়; বরং শান্তি, শিক্ষা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

ইতালির মুসলিম সম্প্রদায়ের এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে দেখায় যে ধর্মীয় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, হালাল খাদ্য শিল্প এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ—সব মিলিয়ে

মুসলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে ইতালির সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই গল্প কেবল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়; বরং সমাজের সঙ্গে সমন্বিত ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের চিত্রও ফুটিয়ে তোলে। বইয়ের এই বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সহযোগিতা এই বইয়ের পাঠকদের সামনে চিন্তার জগৎতে নতুন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

গত কয়েক বছর আগে আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোমের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সেন্টোসেলে একটি পাড়া রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের মুসলিম অভিবাসীরা বসবাস করেন। এখানে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, উত্তর আফ্রিকার আরবি থেকে শুরু করে স্থানীয় রোমান ভাষা পর্যন্ত। একটি পুরনো পোস্ট-ওয়ার ভবনের তলায় একটি নামাজের ঘর রয়েছে। শুক্রবারের জামাতের দিনে স্থানীয় মুসলিমরা মসজিদ ছাড়িয়ে রাস্তার পাশেও নামাজের বিছানা বিছিয়ে দেন এবং ইমামের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

ইতালিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত মসজিদ খুব কম যা আগেই উল্লেখ করেছি। রোমেই আনুষ্ঠানিক মসজিদের সংখ্যা মাত্র একটা হলেও বিভিন্ন এলাকা ও স্থানে আরও প্রায় ষাটেরও অধিক অনানুষ্ঠানিক "প্রেয়ার হোম" রয়েছে। আলজাজিরার তথ্যমতে ইসলাম দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলেও এটি এখনও বৈধভাবে স্বীকৃতি পায়নি। অন্যান্য ধর্মের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো চুক্তি নেই। ফলে মসজিদগুলো সরকারি তহবিল পায় না, ধর্মীয় ছুটি ও বিবাহের স্বীকৃতি নেই এবং ধর্মীয় স্থান স্থাপনের নিয়মও স্পষ্ট নয়।

সেন্টোসেলে ওই নামাজের জায়গাটি ১৯৯৩ সাল থেকে ব্যবহার হচ্ছে। তবে কয়েক বছর ধরে এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভবনের নির্মাণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এটি বন্ধ করতে চেয়েছে। একই ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে রোমের আরও কিছু নামাজের জায়গা ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কলোস্সিয়ামের কাছে মুসলিমরা নামাজ সংক্রান্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরে এই নামাজের স্থানগুলোকে পুনরায় খোলা হয়।

ইমাম মোহামেদ বেন মোহামেদ বলেন, "মসজিদগুলি নিয়মিতভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। আইন অস্পষ্ট এবং প্রতিটি পৌরসভা নিজস্বভাবে ব্যাখ্যা করছে। সালভিনির নির্বাচনী প্রচারণায় নতুন মসজিদ খোলা যাবে না বলার বক্তব্য এই

মানসিকতার প্রতিফলন।” এই ধরনের বক্তব্য মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে।

ইউকোই-এর সভাপতি ইয়াসিন লাফ্রাম বলেন, “আমি মনে করি না ইতালি জাতিগতভাবে বৈষম্যপূর্ণ দেশ। তবে কিছু রাজনীতিবিদ বারবার বিভাজন সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সামাজিক মিডিয়ায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী বার্তা বাড়ছে, যা কখনো কখনো হিংসার ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে।”

শহরগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন তাদের সংগ্রাম এবং সহাবস্থানের চিত্র তুলে ধরে। তোরপিগনাতারা এলাকার একটি নামাজের তিন বছর ধরে নামমাত্র বন্ধ রয়েছে। কিন্তু মুসলিমরা এই জটিলতার মধ্যেও শিক্ষা, সামাজিক কার্যক্রম এবং সম্প্রদায়ের জন্য স্থান তৈরি করছে। ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া এবং মিলানে মুসলিম সম্প্রদায় অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ তৈরি করছে এবং মসজিদকে কেবল প্রার্থনার স্থান হিসেবে নয়; বরং শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক প্রচারণা এবং আইনগত অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও, ইতালির মুসলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে সমাজের অংশ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতালিয়ান সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করছে।

ইতালির মুসলিম জনসংখ্যার একটা অংশ ইতালিয়ান নাগরিক যারা বিভিন্ন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইতালিয় নাগরিকদের ইসলাম গ্রহণের হার। UCOII-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৭০,০০০ ইতালিয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যদিও এই সংখ্যা বর্তমানে আরও অনেক। এই প্রবণতা মূলত মান ও নৈতিকতার সংকট, পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবেও ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন, যা ধর্মীয় চেতনার বিস্তার ও সমাজের মধ্যে ইসলামিক সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াচ্ছে।

মুসলিম অভিবাসীরা ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছেন। প্রায় অর্ধেক উত্তর ইতালিতে বসবাস করেন। তারা মূলত মরক্কো, আলবেনিয়া, তিউনিশিয়া, মিশর, সেনেগাল, পাকিস্তান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সিরিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে আগত। মরক্কোর সম্প্রদায় এখনও সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘদিন

ধরে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রদায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী এবং ১৬-৪০ বছরের মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম যুবকরা।

মুসলিমদের জীবিকার প্রধান উৎস হলো ছোট উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ, কৃষি ও গৃহসেবা। ধর্মীয় চর্চার দিক থেকে, সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ নিজের ঘরে ধর্ম পালন করে। নিয়মিত মসজিদে যাওয়া এবং ইসলামি বিভিন্ন গ্রুপে অংশ নেওয়া মুসলিমদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত ৯/১১-এর পর। যদিও মৌলিক বা কঠোরপন্থি মুসলিমের সংখ্যা কম, তারা ধর্মের মূলনীতি অনুসারে জীবন পরিচালনা ও ইসলামের আদর্শিক চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন।

মুসলিমরা অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না। যেমন, ব্যক্তিগত আয়কর থেকে সম্প্রদায়কে তহবিল বরাদ্দ করা, দান থেকে কর ছাড়, মসজিদ স্থাপন, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ধর্মীয় ছুটিতে কাজ থেকে অব্যাহতি, ইসলামি চেতনানুযায়ী জানাজার ব্যবস্থা—এই সুবিধাগুলো এখনও সীমিত।

তবুও মুসলিম সম্প্রদায় সমাজের নানাবিধ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। হালাল খাদ্য শিল্প, ইসলামিক শিক্ষা ও মাদরাসা কার্যক্রম, রমজান, ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্প্রদায়ের একতা ও স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করছে। ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া এবং রোমের মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্রগুলো কেবল ধর্মীয় স্থান নয়; বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ও নাগরিক সংলাপ মুসলিম সম্প্রদায়কে সমাজের স্বীকৃত ও বৈধ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করছে।

এই সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, বৈচিত্র্য এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড ইতালির সংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনে মুসলিমদের গুরুত্বকে আরও দৃঢ় করছে, যেখানে তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অবদান রাখছে।[৪৪]

ইতালিতে মুসলিম অভিবাসীদের কর্মসংস্থান একদিকে যেমন তাদের জীবিকার প্রধান ভরকেন্দ্র, অন্যদিকে এটি বৈষম্য, অনিশ্চয়তা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জেরও কেন্দ্রবিন্দু। ২০২৩ সালের সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, ইতালিতে তৃতীয় দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০.৭%, যা স্থানীয় ইতালিয়দের ৬১.৫% হারের প্রায় সমান। যদিও এই অগ্রগতি একটি ইতিবাচক দিক, তবুও বেকারত্বের হার তাদের জন্য বেশি-non-EU অভিবাসীদের মধ্যে ১১.৪%, যেখানে স্থানীয়দের ক্ষেত্রে তা ৭.২%।

---

[44] Al Jazeera (2018), UCOII (2012), Allievi (1999, 2003), Caritas/Migrantes (2008), Coppi & Spreafico (2008), Zincone (2006).

এই চিত্র মুসলিম অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত। মুসলিমরা প্রধানত মেটাল শিল্প, কৃষি, নির্মাণ, আতিথেয়তা ও গৃহস্থালি কাজে যুক্ত। এগুলো সাধারণত শ্রমঘন, কম মজুরির, এবং প্রায়শই চুক্তি-বিহীন বা অনিরাপদ কাজ। গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন অভিবাসীদের একটি বড় অংশ বৈধ কর্মচুক্তির বাইরে কাজ করে, ফলে তারা সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক মুসলিম তরুণ, বিশেষ করে যারা পড়াশোনার বাইরে, তাদের জন্য এই শ্রমবাজার প্রায় একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে শুধু বেতন বা চুক্তির সমস্যাই নয়, মুসলিম পরিচয়ও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ সালে প্রকাশিত FRA-এর এক সমীক্ষা বলছে, ইউরোপের মুসলিমরা কাজ খোঁজার সময় প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হন। বিশেষত ইতালিতে মুসলিম নারীরা হিজাব পরলে চাকরির সুযোগ হারানোর আশঙ্কায় থাকেন। ভেরোনা ও পারমার কয়েকজন নারী জানিয়েছেন যে, চাকরি ধরে রাখতে গিয়ে তারা হিজাব খুলতে বাধ্য হয়েছেন। এক তরুণ সিরীয় ছাত্রী বলেন, "আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তারা আমার পোশাক দেখে অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে যান।"

এই বৈষম্যের আরেকটি রূপ হলো "working poor"-যেখানে মানুষ কাজ করলেও পর্যাপ্ত আয়ে টিকে থাকতে পারে না। ২০২৪ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতালিতে প্রায় ২৮.১% অভিবাসী শ্রমিক এই শ্রেণিতে পড়েন। অর্থাৎ তারা শ্রম দিচ্ছেন, কিন্তু আয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে দারিদ্র্য থেকে বেরোতে পারছেন না। মুসলিম পরিবারগুলো এ বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করছে।

তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। গত কয়েক বছরে ইতালিতে বিদেশি শ্রমিকদের নিয়োগ বেড়েছে ২০১৯ সালে নতুন নিয়োগের মধ্যে যেখানে বিদেশিদের অংশ ছিল ১৩.৬%, ২০২৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.২%। মুসলিম অভিবাসীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উদ্যোগেও এগিয়ে আসছেন, যা ইতালির অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তবুও সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় পরিচয়জনিত সমস্যাবলি এবং নারীদের উচ্চ বেকারত্ব মুসলিম অভিবাসীদের শ্রমবাজারে পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি ব্যাহত করছে। অনেক সমাজকর্মী আশঙ্কা করছেন যে, বিশেষ করে মুসলিম নারীরা যদি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা থেকে দূরে থাকেন, তবে তা ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদেরও মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৪৫]

---

[45] Migrant Integration Portal, *Italy – Third-country nationals in the labour market (2023)*, European Commission. European Union Agency for Fundamental Rights

মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে গড়ে ওঠেনি, বরং বহির্বিশ্ব থেকে আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও তা নির্মিত হয়েছে। বিশেষত গণমাধ্যম এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তরুণ মুসলিমরা প্রায়ই তাদের পরিচয়কে এমন এক প্রতিরোধী কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলছে, যা আসলে নেতিবাচক প্রচারের বিপরীতে দাঁড় করানো। এভাবে তাদের ভেতরে একটি নতুন "আমরা" বোধের উদ্ভব ঘটেছে, যা বহির্বিশ্বের চাপ ও ভুল বোঝাবুঝির বিরুদ্ধে একধরনের যৌথ প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করছে।

বেশ কিছু তরুণ মুসলিম সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইতালিতে ইসলামভীতি (Islamophobia) বেড়ে যাওয়ায় তারা জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে আরও দৃঢ়ভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে ফিরে গেছেন। কিন্তু এই পরিচয়টি তৈরি হয়েছে এমন এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, যেখানে তারা নিজেদের দুর্বল, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে ভুলভাবে বোঝা হচ্ছে বলে অনুভব করেন।

ইতালির জনপ্রিয় কল্পনায় ইসলাম অনেক সময় বিদেশি বা অভিবাসীর সমার্থক হয়ে গেছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে ইসলামকে প্রায়শই সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একজন তরুণ সিরীয় বংশোদ্ভূত ইতালিয় নাগরিক বলেছিলেন: "পত্রিকা আর টেলিভিশনে ইসলামের ভালো কোনো ছবি দেখা যায় না। সব সময়ই সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এতে সংহতি নয়; বরং বিভাজন তৈরি হয়।" আরেকজন মরোক্কান যুবক মন্তব্য করেন: "সংবাদে ইসলামকে কেবল তখনই আনা হয়, যখন বোমা হামলা হয় বা স্বামী স্ত্রীকে নির্যাতন করে। কিন্তু ইসলাম আসলে কী, সেটি দেখায় না।"

গণমাধ্যমের এই একপেশে উপস্থাপনা মুসলিমদের "সমস্যা সৃষ্টিকারী" হিসেবে দেখায়, যেন তারা ইতালির সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাদেরকে অবৈধ অভিবাসী, ইতালিয় সংস্কৃতির বিরোধী বা নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক মুসলিম মনে করেন, ৯/১১-এর পর থেকে গণমাধ্যম একধরনের ইসলামোফোবিক ভাষা ব্যবহার শুরু করেছে। ফলে গত দুই দশকে ইতালিতে জনমত ধীরে ধীরে কৌতূহল ও সহনশীলতা থেকে ভয়ে ও অসহিষ্ণুতায় পরিণত হয়েছে।

(FRA), *Muslims in Europe face more racism and discrimination* (2024). ANSA English News, *Rising number of working poor among migrants says report* (2024). European Commission, *Third-country nationals in the Italian labour market 2023*

২০০৮ সালে ENAR-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়, ইতালিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বর্ণবাদী আচরণ ও ইসলামোফোবিক হামলার ঘটনা ঘটেছে বিশেষত মসজিদে হামলা, ভাঙচুর ও শারীরিক আক্রমণ। এসব কেবল সংবাদে ভুল উপস্থাপন নয়; বরং মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। ভেরোনার এক মুসলিম নেতা মন্তব্য করেছিলেন: "আমরা গত চল্লিশ বছরে ইতালির সমাজে আইন মেনে, শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করেছি। রাষ্ট্রের উচিত ছিল আমাদের প্রশংসা করা, কিন্তু গণমাধ্যম আমাদের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অংশ বানিয়ে দিয়েছে।"

এই নেতিবাচক প্রচারের প্রতিফলন দেখা যায় দৈনন্দিন জীবনে। হিজাব পরা এক নারী জানালেন, "আমি যখন হিজাব পরা শুরু করি, আমার ডাক্তার আর আমাকে দেখতে চাননি। রাস্তায় মানুষ বলে, "নিজের দেশে ফিরে যাও। আমি যদি কোনো ভুল করি, তা ইসলাম বলে গণ্য হয়; কিন্তু একই কাজ কোনো ইতালিয় নারী করলে কিছুই হয় না।" এক তরুণ বললেন, একদিন বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটার সময় এক বৃদ্ধ সাইকেল থেকে চিৎকার করে বললেন, "নিজের দেশে ফিরে যাও।"

এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ করে, গণমাধ্যমে তৈরি নেতিবাচক ইমেজ কেবল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রভাবিত করছে না, বরং মুসলিমদের প্রতিদিনের জীবনে বৈষম্য, অবিশ্বাস এবং সরাসরি অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে ইতালির মুসলিম পরিচয় এক দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে একদিকে তারা ইতালিয় সমাজের অংশ হতে চায়, অন্যদিকে গণমাধ্যম ও জনমতের চাপ তাদের বারবার বাইরের লোক হিসেবে চিহ্নিত করছে।

তরুণ মুসলিমদের রাজনৈতিক চিন্তা ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এক ভিন্ন বাস্তবতার প্রতিফলন। অনেকেই ইসলামি রাষ্ট্র গঠনকে কোনো বাস্তব লক্ষ্য হিসেবে দেখেন না। বেশির ভাগ তরুণের মতে, একটি দেশ যদি বহু-ধর্মীয় হয় তবে তার আইন ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াই যথার্থ। কেবল এমন সমাজে, যেখানে শতভাগ মানুষ মুসলিম, সেখানে ইসলামি আইন প্রযোজ্য হতে পারে বলে তারা মনে করেন। তাদের কাছে মুসলিম হিসেবে পূর্ণতা লাভ মানে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস নয়; বরং ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাওয়া। প্রার্থনা করার সুযোগ, ধর্মীয় জীবনযাপন ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু তরুণ ইসলামকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একটি বার্তা হিসেবে দেখেন। তাদের মতে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় ন্যায়বিচার, শান্তি, সমতা ও করুণার বার্তা আছে, যা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। তবে অনেকেই একে নিছক ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরিচয়ের বিষয় বলে মনে করেন। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে এই ভিন্নমতই বোঝায় যে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে এখনো একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ধারণা গড়ে ওঠেনি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামোফোবিয়া, পশ্চিমা রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ঘটনাবলি যেমন ইরাক যুদ্ধ কিংবা ফিলিস্তিন সংকট প্রভাব ফেলেছে। কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল বা স্থানীয় ডানপন্থি দলগুলোকে ইসলামবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে একই সঙ্গে তারা স্বীকার করেন যে, ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব মুসলিম সমাজের ভেতর থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন: অ্যালকোহল পান, পতিতাবৃত্তি, কিংবা ধর্মচর্চায় অবহেলা করা মানুষদের তারা ইসলামের শত্রু মনে করেন।

মসজিদ বা ইসলামিক কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন, খ্রিষ্টান সংগঠন, সামাজিক আন্দোলন ও বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ভেরোনায় মুসলিমরা নিজেদের অধিক সুরক্ষিত রাখতে একটি সীমিত, বন্ধ সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। তারা বাইরের পরিবেশকে হুমকিস্বরূপ মনে করে, ফলে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সেখানে তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে পারমায় পরিবেশ তুলনামূলকভাবে সহনশীল, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরুণরা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশ নেয় এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়। এর ফলে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কে আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে।

এই দ্বৈত বাস্তবতায় ইতালির তরুণ মুসলিমদের পরিচয় একদিকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে গড়ে উঠছে, অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক সংকট তাদের ধর্মীয় চেতনায় নতুন মাত্রা যোগ করছে। তারা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসেবে নয়; বরং ন্যায়বিচার, শান্তি ও সমতার ভিত্তিতে সমাজের উন্নতির জন্য একধরনের দিকনির্দেশনা হিসেবে দেখছে। তবে এখনো স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের মূল মনোযোগ নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় রক্ষা ও নিরাপদ সহাবস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার দিকে।

মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে চিত্রটি বেশ জটিল। দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ এখনো ইতালিয়ান নাগরিকত্ব পায়নি। ফলে তাদের ভোটাধিকার নেই এবং রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ অংশগ্রহণও সম্ভব হয় না। যেসব তরুণ মুসলিম ইতালিতে জন্ম নিয়েছে এবং

নাগরিকত্ব পেয়েছে, তারাই কেবল ভোট দিতে পারে। অন্যরা বলেছে, সুযোগ পেলে তারা অবশ্যই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে চাইবে। অনেকে শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হলেও সামাজিক বা রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশই স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিকে নিজেদের প্রভাবের বাইরে বলে মনে করে।

তবে মুসলিম তরুণদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হলো Giovani Musulmani d'Italia। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির জন্ম সেপ্টেম্বর ১১ পরবর্তী সময়ে, যখন ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য ইতালিয়ান গণমাধ্যমে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল তরুণ মুসলিমদের জন্য একটি ভিন্নতর পরিচয় নির্মাণ করা এবং ইতালিয় সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উপস্থাপন করা। তারা কর্মশালা আয়োজন করে, ইসলামিক সাময়িকী প্রকাশ করে এবং খেলাধুলার মতো সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করে। তরুণদের মতে, তাদের বাবা মা প্রায়ই ইতালিয় সমাজের বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথচ নতুন প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছে।

সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায় তারা স্থানীয় সমস্যার চেয়ে বৈশ্বিক মুসলিম ইস্যুতে বেশি সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, গাজা যুদ্ধের সময় রোম ও মিলানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে অনেক তরুণ মুসলিম অংশ নিয়েছিল। তারা বলেছিল, এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নয়; বরং গাজার সাধারণ মানুষের পক্ষে মানবতার কণ্ঠস্বর হিসেবে দাঁড়ানো। মিলান ও বোলোনিয়ায় সেই বিক্ষোভ চলাকালে মুসলিমরা গির্জার সামনে নামাজ পড়েছিল। মূলধারার গণমাধ্যম এটিকে উসকানিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরলেও তরুণরা ব্যাখ্যা করেছিল যে, এটি ছিল কেবল ধর্ম পালনের অধিকার প্রয়োগের প্রতীক। ইতালির সংবিধান তাদের এই অধিকার দিয়েছে, আর সেটাই তারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে।

এই প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ নির্মাণ বা ধর্মীয় অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তুলনামূলকভাবে পেছনে থাকে। তারা মনে করে, এসব বিষয় সম্প্রদায়ের নেতারা সমাধান করবেন। তবে একই সঙ্গে তাদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলও কাজ করছে প্রথমে নিজেদেরকে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, তারপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করা। পারমার আন্তঃধর্মীয় ফোরামের এক নেতার মতে, মুসলিম তরুণরা এখনো ভয় সৃষ্টি করতে চায় না; তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা শক্ত করছে। ভবিষ্যতে ইতালিয়ান ইসলাম

ইউরোপীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, নাকি মৌলবাদী প্রবণতার দিকে ঝুঁকবে এটি সময়ই বলে দেবে। তবে ইউরোপীয় সমাজের দায়িত্বও কম নয়; তরুণ মুসলিমরা কোন পথে যাবে, সেটি নির্ভর করছে বৃহত্তর ইতালিয় সমাজ কীভাবে তাদের জায়গা করে দিচ্ছে তার ওপর।

তবে এটা ঠিক যে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা প্রায় অনুপস্থিত। আমার সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ তরুণই বলেছে, ইতালিতে ইসলামি র‍্যাডিকালাইজেশন বলে কিছু নেই বা থাকলেও তা খুবই অপ্রাসঙ্গিক। তাদের মতে গণমাধ্যম এমন এক ভয়ের চিত্র তৈরি করেছে যা বাস্তবে নেই এটি কেবল পত্রিকা বিক্রি বাড়ানো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো কিংবা অন্য সমস্যাকে আড়াল করার কৌশল। অনেকেই টেলিভিশনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, পুলিশ কখনো কখনো কাউকে আটক করে প্রচার করে যে, তারা নাকি অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়েছে, কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই দেখা যায়, আদালত তাদের নির্দোষ প্রমাণ করেছে, যা খুব ছোট করে সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

ইতালিয়ান মুসলিমদের মতে, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর যুদ্ধনীতির পেছনেও এই ভয়ের রাজনীতি কাজ করে। যেমন একজন তরুণ বলেছে, যুদ্ধের আসল কারণ তেল বা জমি দখল, কিন্তু সেটি বৈধ করতে বলা হয় “দেখুন, এখানে সন্ত্রাসীরা আছে, তাদের দমন করতে হবে।” এই প্রেক্ষাপটে অনেকের দৃষ্টিতে ইসলামকে ‘সন্ত্রাসী ধর্ম’ হিসেবে উপস্থাপন করা একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। তবুও তারা মনে করে, ইতালি নিজে কখনো সরাসরি আগ্রাসী ভূমিকা নেয়নি, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করার জন্যই বিদেশি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ফলে ইতালি সাধারণ আরব দুনিয়ার কাছে শত্রু নয়।

বলনিয়া ও রোমের মুসলিম নেতারাও মনে করেন, এখানে র‍্যাডিকালিজম কার্যত নেই। বরং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ইমামদের শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরির কাজ তরুণদের ভুল পথে যাওয়া ঠেকিয়েছে। তাদের মতে, চরমপন্থা জন্ম নেয় অজ্ঞতা থেকে; সঠিক জ্ঞান অর্জন করলে কেউ চরমপন্থার শিকার হয় না।

যখন তরুণদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় ‘জিহাদ’ মানে কী, প্রায় সবাই এটিকে দৈনন্দিন জীবনের শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছে শিক্ষা, কাজ কিংবা সমাজে নিজেকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা। তারা বলেছে, ইসলাম কোথাও নিরীহ মানুষ হত্যার অনুমতি দেয় না। আত্মঘাতী হামলাকারী বা বেসামরিক মানুষকে আক্রমণকারী মুসলিম নয়; বরং ইসলামের শত্রু। তবে অনেক তরুণ আবার

ফিলিস্তিন, লেবানন বা ইরাকের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে হামলাকে সন্ত্রাস নয়; বরং বৈধ আত্মরক্ষা বা প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। তাদের যুক্তি যখন একটি জাতি দখলের শিকার হয়, তখন প্রতিরোধ করা ন্যায়সংগত, যেমন ইতালিও অতীতে বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে।

তাদের চোখে র‍্যাডিকালিজমের ঝুঁকি একেবারেই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া। তারা বলে, যারা মসজিদে যায়, তারাই বরং সঠিক ইসলামি চর্চায় নিয়োজিত, বিপথগামী নয়। বরং সরকারি কর্তৃপক্ষ মসজিদ নির্মাণে বাধা দিয়ে ভুল করছে। তরুণদের মতে, বৈধ ও স্বীকৃত মসজিদ তৈরি হলে সমাজের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক আরও স্বচ্ছ হবে, এবং উগ্রবাদী গোপন কর্মকাণ্ডের কোনো সুযোগই থাকবে না।

অনেকেই মনে করেন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা জরুরি। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বৈধ মসজিদ গড়ে তোলা হলে তরুণরা বিচ্ছিন্নতার বদলে মূল ধারায় থাকতে পারবে। ইমাম ও সামাজিক নেতারা বলেন, ইসলামের প্রকৃত বার্তা সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া উগ্রবাদ ঠেকানোর অন্য কোনো টেকসই উপায় নেই।

তবে এখানেই শেষ নয়। সামাজিক কর্মীরা মনে করেন, গণমাধ্যম যখন মুসলিমদের এক কাতারে দাঁড় করিয়ে ‘সন্ত্রাসী’ তকমা দেয়, তখন সেটিই তরুণদের মধ্যে “আমরা বনাম তারা” মনোভাব তৈরি করে, যা উগ্রবাদের জন্ম দিতে পারে। তাই গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। পাশাপাশি সমান সুযোগের নিশ্চয়তা ও বৈষম্যহীন পরিবেশই তরুণ মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় সুরক্ষা।

অধিকাংশ তরুণই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে, তবে শর্ত রেখেছে যথেষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে দোষারোপ করা যাবে না। কারও কথায়, “তুমি দাড়ি রেখেছো বলে যদি আমাকে র‍্যাডিকাল বলা হয়, তবে সেটি অবিচার।”

শেষ পর্যন্ত তরুণরা বলেছে, আসল সমাধান একপাক্ষিক দমন নয়; বরং সমন্বিত সামাজিক সংলাপ, শিক্ষা ও সমান অধিকার। মসজিদগুলোকে খোলা রাখা, গণমাধ্যমের ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনা এবং মুসলিম কমিউনিটি ও বৃহত্তর ইতালিয় সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিভাজন ঠেকানো সম্ভব।

এক্ষেত্রে আমার মনে আছে ২০১৬ সালের ১লা জুলাই ঢাকার হলি আর্টিজানে এক সন্ত্রাসী হামলায় ২৪ জন বিদেশির সাথে ৯ জন ইতালিয়ানও নির্মমভাবে নিহত হয়। এই ঘটনায় স্বভাবিকভাবে ইতালিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা বিপর্যস্ত ও হতভম্ব হয়ে যায়। ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মাঝে বড় ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ইতালিয়ানদের পাশাপাশি বাংলাদেশিরাও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আমার মনে আছে, তাৎক্ষণিক বাংলাদেশি ও স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির নেতৃস্থানীয়রা মিলে অনেক বড় "শোক র‍্যালির" আয়োজন করে। হাজার হাজার ইতালিয়ান, বাংলাদেশি ও নন-বাংলাদেশি নারী পুরুষদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে বিশাল র‍্যালি শহরের প্রধানকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়। এভাবে সমগ্র ইতালিতেই সেই সময় এই ধরনের শোক সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের ওই ঘটনা নিয়ে যদিও অদ্যাবধি নানা মহলে হাজারো প্রশ্ন রয়েছে। তেমনি প্রশ্ন রয়েছে আক্রমণকারীদের চরিত্র ও ইসলামি লেবাস নিয়েও। তারা কতটুকু ইসলামি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে–এই সব নিয়ে হাজারো প্রশ্ন থাকার পরও ইতালিয়ানদের কাছে ওটা "উগ্রবাদী হামলা" বা "মুসলিম চরমপন্থি" আক্রমণ। ওই ঘটনার পর বাংলাদেশের সাথে ইতালিয় সরকারের নানান ধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। তৎকালীন বাংলাদেশের ক্ষমতাশীলদের দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন হলেও বাংলাদেশের কপালে এক মারাত্মক কালিমা লেপন করে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন বারবার সামনে আসে এত বিপুলসংখ্যক মুসলিমের বসবাসের পরও কেন একটি কেন্দ্রীয় ওলামা কমিটি কিংবা ফতোয়া বোর্ড গড়ে ওঠেনি?

এখানে মৌলিক সমস্যার একটি হলো বৈচিত্র্য। ইতালির মুসলিম সমাজ একক কোনো জাতিগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নয়। আরব, আফ্রিকান, দক্ষিণ এশীয় ও পূর্ব ইউরোপীয় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেই মুসলিম সমাজের রূপ। প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশীলনে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কোনো মসজিদে এখনো জুমার খুতবা বাংলায় দেওয়া হয়, আবার একই সময়ে আরব ইমামরা আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দেন। নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণ যারা ইতালিয়ান ভাষায় বেড়ে উঠছে, তারা এই ভাষাগত ভিন্নতার কারণে ইমামদের সঙ্গে যোগাযোগে সমস্যায় পড়ে। যদিও কিছু মসজিদে ইতালিয়ান ভাষায় পাঠদান ও খুতবা চালু হয়েছে, তা এখনো সর্বজনীন হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ইতালির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে মুসলিম সংগঠনগুলোর কোনো আনুষ্ঠানিক সমঝোতা (Intesa) নেই। ক্যাথলিক চার্চের মতো মুসলিম সম্প্রদায়

এখনো আইনি স্বীকৃতি পায়নি। ফলে কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড বা ওলামা কমিটি গঠন করে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার সুযোগ সীমিত রয়ে গেছে। সরকারি উদ্যোগে ইমামদের ইতালিয়ান সংবিধান ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হলেও, তা মূলত প্রশাসনিক উদ্যোগ, ধর্মীয় বোর্ড গঠনের পথ নয়।

তৃতীয়ত, মুসলিম সমাজের ভেতরে নেতৃত্বের বিভাজনও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কেউ কেউ স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করেন, আবার কেউ আরব বা আফ্রিকান নেতৃত্বাধীন সংগঠনে সক্রিয়। যেমন, UCOII (Union of Islamic Communities and Organisations in Italy), COREIS (Islamic Religious Community of Italy), কিংবা Italian Islamic Confederation (CII) এসব সংগঠন সক্রিয় থাকলেও, তারা নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে কাজ করছে। সব মত ও চিন্তার আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এখনো গড়ে উঠতে পারেনি।

চতুর্থত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাও এই অনুপস্থিতির জন্য দায়ী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু আইন প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে অঘোষিত মসজিদ বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা স্থানীয় প্রশাসনকে দেওয়া হবে। এই ধরনের নিয়ম মুসলিম সম্প্রদায়কে ভয় পাইয়ে দেয় এবং কেন্দ্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে। অনেক অভিবাসী মনে করেন, তাদের কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখা হয়, মানুষ হিসেবে নয়। এই মানসিক চাপের কারণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে যায়।

তবুও ইতালির মুসলিম সমাজে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। কিছু ইসলামিক সেন্টার ইতালিয়ান ভাষায় খুতবা ও ক্লাস চালু করছে, যা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করছে। একই সঙ্গে ইমামদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মুসলিম নেতৃত্বকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

তবে আমি কয়েকজন আলেমের সাথে কথা বলে বুঝেছি যে, ইতালিতে একটি কেন্দ্রীয় ওলামা কমিটি বা ফতোয়া বোর্ড এখনো বাস্তবায়িত না হলেও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মুসলিম সম্প্রদায় যদি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভাজন অতিক্রম করে একত্রে কাজ করতে পারে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় এবং নতুন প্রজন্মের তরুণদের সঙ্গে আলেমদের সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে একদিন এই অভাব পূরণ হতে পারে। তবে সেটি হবে দীর্ঘমেয়াদি ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া এক কঠিন যাত্রা।

ইতালি বর্তমানে ইউরোপের অন্যতম বড় অভিবাসী নির্ভর দেশ। এখানে বড় একটা অংশ তৃতীয়-দেশের নাগরিক বসবাস করছে, যাদের একটি বড় অংশ মুসলিম বিশেষ করে মরক্কো, আলবেনিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, সুদান, সেনেগাল ও তিউনিশিয়া থেকে আগত অভিবাসীরা। সাম্প্রতিক জরিপ ও গবেষণায় দেখা যায়, ইতালিতে মুসলিম অভিবাসীদের জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক অবস্থান ইতালিয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও, তাদের এখনও বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, ইতালির শ্রমবাজারে তৃতীয়-দেশের নাগরিকরা প্রায় ২.৪ মিলিয়ন জন সক্রিয় শ্রমিক হিসেবে যুক্ত, যা ইতালির শ্রমশক্তির প্রায় ১০ শতাংশেরও বেশি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে আগত। উদাহরণস্বরূপ, মোরক্কোর নাগরিক প্রায় ৪ লাখ, ডিউনিসিয়া, মিশর, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মিলিয়ে আরও কয়েক লাখ মুসলিম অভিবাসী সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

কর্মসংস্থান হার তৃতীয়-দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে ৬০.৭%, যেখানে ইতালিয়দের মধ্যে এই হার ৬১.৫%। তবে মুসলিম নারী অভিবাসীদের অবস্থা সবচেয়ে দুর্বল তাদের কর্মসংস্থান হার ৪৫.৬%-এর বেশি নয়। ফলে মুসলিম অভিবাসী পরিবারগুলোতে একক আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি এবং আর্থিক অনিশ্চয়তাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

তৃতীয়-দেশীয় নাগরিকদের বেকারত্বের হার ১১.৪%, যা ইতালিয়দের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৮%। কর্মে অংশগ্রহণ না করার হার অভিবাসী নারীদের মধ্যে প্রায় ৪৭%, যা মুসলিম পরিবারের সামাজিক একীভূতকরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের চিত্রও উদ্বেগজনক। সম্পূর্ণ অভিবাসী পরিবারগুলোর প্রায় ৩৩.২% “পরম দারিদ্র্যে” বসবাস করছে, যেখানে ইতালিয় পরিবারে এ হার মাত্র ৬.৩%। মুসলিম পরিবারগুলো এই দারিদ্র্য ঝুঁকিতে আরও বেশি ভুগছে, কারণ একদিকে নারীদের কর্মসংস্থান সীমিত, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের অনেকে উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে পারছে না।[৪৬]

---

[46] Aman Alliance (2025). *Italy: Unemployment rate falls to 5.9% in April 2025*. ISTAT (Italian National Institute of Statistics), Labour Market Reports (2023–2024).

যুব অভিবাসীদের মধ্যে যারা পড়াশোনা করছে না, কর্মসংস্থানে নেই এবং শিক্ষানবিশতা বা প্রশিক্ষণেও যুক্ত নয়, তাদের হার প্রায় ২৬.৫%। স্কুল ত্যাগের হার দাঁড়িয়েছে ২৯.৫%। মুসলিম তরুণদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা স্পষ্ট অনেকেই কম দক্ষতা ও কম বেতনের কাজ করছে এবং নিজেদেরকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মনে করছে। বিশেষ করে হিজাব পরিহিত মুসলিম মেয়েরা কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে দ্বিগুণ বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে।

কর্মস্থলে মুসলিম অভিবাসীরা প্রায়ই ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠান নামাজ বিরতি বা হালাল খাবারের সুযোগ দিলেও তা আইনি স্বীকৃত নয়; বরং নির্ভর করছে নিয়োগকর্তার সদিচ্ছার ওপর। ৯/১১-এর পর থেকে মুসলিম পরিচয় নিয়ে সংবেদনশীলতা আরও বেড়েছে, ফলে হিজাব, দাড়ি বা নামাজের কারণে অনেকে অঘোষিত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

"The history of migration is no longer about departure and loss — it is about rebuilding identity, belonging, and hope across new horizons."

বাংলাদেশি অভিবাসী জীবনের নতুন ইতিহাস

এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো ইতালিয়ানদের মানবিকতা, সামাজিকতা এবং দৈনন্দিন জীবনের উন্মুক্ততা। আমার কাছে ইউরোপের অনেক দেশের তুলনায় ইতালিয়দের সামাজিক জীবন অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও আন্তরিক বলে বিবেচিত বলে মনে হয়েছে। তাদের পরিবারকেন্দ্রিক জীবন, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, অতিথিপরায়ণতা এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার প্রবণতা ইতালিয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ইতালির মানুষের স্বভাব সাধারণত উষ্ণ, আবেগপ্রবণ এবং সামাজিক যোগাযোগে আগ্রহী। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বিদেশি ও অভিবাসীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে মানবিক ও সহনশীল রূপ ধারণ করে।

ইতালিয় সমাজের একটি লক্ষণীয় দিক হলো তারা সাধারণত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করতে আগ্রহী নয়। ইতালি ঐতিহাসিকভাবে একটি খ্রিস্টান প্রধান দেশ হলেও সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ইতালির সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের আইনের অধীনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় আচার পালন করতে পারে।

অভিবাসীদের প্রতি ইতালিয়দের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতালির অনেক মানুষ অভিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহনশীল আচরণ করেন। দৈনন্দিন জীবন, কর্মক্ষেত্র বা প্রতিবেশী সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতালিয় নাগরিক বিদেশিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অনেক অভিবাসী পরিবার ইতালিয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এবং নতুন প্রজন্ম ইতালির শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ইতালি ও ছোট শহরগুলোতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবিক আচরণ প্রায়ই চোখে পড়ে।

তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে অভিবাসন প্রশ্নটি ইতালির রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনায় একটি বিতর্কিত বিষয়। অর্থনৈতিক চাপ, কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে কখনো কখনো অভিবাসীদের নিয়ে উদ্বেগ বা সমালোচনা দেখা যায়। কিছু রাজনৈতিক দল কঠোর অভিবাসন নীতির পক্ষে অবস্থান নেয় এবং কখনো কখনো অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বক্তব্যও শোনা যায়। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেও ইতালির দৈনন্দিন সামাজিক বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সহনশীল ও বহুসাংস্কৃতিক চরিত্র ধারণ করে।

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের উপস্থিতি ও তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ১৯৮০-এর দশকে ইতালিতে বাংলাদেশিদের আগমন শুরু হলেও, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে রোমে তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়কালে রোমে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ২০০-৩০০ থেকে বেড়ে প্রায় ১০,০০০-এ পৌঁছায়, যা তাদের ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ অভিবাসী গোষ্ঠীতে পরিণত করে।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা মূলত কম দক্ষ ও কম বেতনের কাজে নিযুক্ত হলেও, ইতালির অর্থনীতিতে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে অনেকেই নির্মাণ, পরিষেবা, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে, নারীদের কর্মসংস্থান সীমিত, এবং অনেকেই গৃহকেন্দ্রিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশি অভিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই কুমিল্লা, ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। এই অঞ্চলের মানুষ ইতালিতে অভিবাসনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ইতালির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। রোম, মিলান ও ভেনিসে বাংলাদেশি গোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। রোমে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ইউরোপের অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি। ভেনিসে, বাংলাদেশি সম্প্রদায় শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা ইতালিতে বসবাসরত অবস্থায় তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে সমাজে একীভূত হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, কর্মসংস্থানে বৈষম্য ও সামাজিক একীভূতকরণের চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে রয়েছে।

ইতালি ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বহু দশক ধরে বিভিন্ন মাত্রায় বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৭২ সালে ইতালি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রোমে বাংলাদেশের একটি দূতাবাস রয়েছে, অপরদিকে ঢাকাতেও ইতালির দূতাবাস কার্যকর রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ইতালি বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে জাতিসংঘে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ গ্রহণে ইতালি স্পনসর দেশগুলির একটি ছিল। পরবর্তীতে শিক্ষাক্ষেত্র, প্রযুক্তি বিনিময় এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে সুদৃঢ় হয়েছে।

২০০০ সালে বাংলাদেশ ও ইতালি "বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা"-সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার আওতায় গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়। এই ধারাবাহিকতায় ইতালির আবদুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২৫ জন বাংলাদেশি গবেষক পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। অর্থনৈতিক সম্পর্কেও উভয় দেশের সংযোগ ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে। ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (IBCCI) মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ইতালিতে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে নিটওয়্যার, বোনা পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, চা, চামড়া ও পাটজাত দ্রব্য। অন্যদিকে ইতালি বাংলাদেশে রপ্তানি করে প্রধানত যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিকস, যানবাহন ও পরিবহন সরঞ্জাম।

অভিবাসনের ক্ষেত্রে ইতালি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে মাত্র কয়েকশ বাংলাদেশি রোমে বসবাস করলেও নব্বইয়ের দশকেই তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। প্রথমদিকে অধিকাংশ পুরুষ কর্মজীবী হিসেবে ইতালি গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে পরিবারগুলো সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন শুরু করে। বর্তমানে ইতালিতে প্রায় দেড় লাখের বেশি বাংলাদেশি বাস করে, অনানুষ্ঠানিক হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা দুই লাখের কাছাকাছি হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইতালি ও বাংলাদেশ অভিবাসন ও শ্রম বিষয়ক নতুন চুক্তি করেছে। এর মাধ্যমে বৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত করা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মানবপাচার রোধ ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার দিকেও উভয় দেশ গুরুত্বারোপ করছে। ফলে বাংলাদেশি অভিবাসীরা শুধু দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের

সেতুবন্ধ নয়, কূটনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।

রোমগামী ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই যে দৃশ্য চোখে পড়বে, তা একেবারেই আপন পরিচিত কোনো বাড়ির বারান্দায় শুকোতে দেওয়া কাঁথা, গামছা কিংবা লুঙ্গি। মুহূর্তেই বুঝতে পারবেন, এখানে বাংলাদেশিদের উপস্থিতি আছে। এই চিত্র শুধু রোমেই নয়; বরং বলনিয়া, ট্রেভিজো, মিলান, সালেরনো, আনকোনা, পালেরমো কিংবা পাদেভা সব জায়গাতেই প্রায় একই রকম। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বছর বছর এই দৃশ্য যেন আরও ঘনঘন চোখে পড়ে, যেন ইতালির শহুরে জীবনের সাথেই মিশে গেছে বাংলাদেশের রং।

এই দৃশ্য প্রমাণ করে যে বাংলাদেশিরা শুধু কর্মসংস্থানের খোঁজে ইতালিতে আসেননি, বরং সঙ্গে এনেছেন তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবনযাত্রার চিহ্নও। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে যারা ইতালিতে বসবাস করছেন, তাদের প্রায় আশি শতাংশই আজ নিজস্ব বাড়ি-ঘর কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। লুঙ্গি শুকোতে থাকা সেই বারান্দাগুলো তাই শুধু কাপড়ের নয়; বরং প্রমাণ দিচ্ছে নতুন এক স্থায়ী প্রবাস জীবনের।

বাংলাদেশিদের এই উপস্থিতি এখন ইতালির সামাজিক বাস্তবতার অংশ। হাজার হাজার মানুষ ইতোমধ্যেই ইতালির নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। তাদের সন্তানরা নিজেদের ইতালিয়ান বলেই পরিচয় দেয়, তারা ইতালির স্কুলে পড়ে, ইতালির ভাষায় স্বপ্ন দেখে, আর তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে এই দেশকে কেন্দ্র করেই। জন্মভূমি হয়তো বাংলাদেশ, কিন্তু মাতৃভূমির অনুভূতি এখন ইতালি।

একসময় ইতালি ছিল বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বড় উৎস। কিন্তু এখন সেই প্রবাহ অনেকটাই কমে এসেছে। কারণ, যারা স্থায়ীভাবে বসতি গড়েছেন, তাদের আর দেশে টাকা পাঠানোর প্রয়োজন আগের মতো নেই। দেশে শুধু জরুরি কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে টাকা যায়। আজকের প্রজন্ম তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ইতালিকে ঘিরেই।

প্রায় সব বড় শহরেই বাংলাদেশিদের উপস্থিতি দৃশ্যমান। কেউ কেউ ছোট দোকান কিংবা রেস্টুরেন্ট চালান, আবার অনেকে হয়েছেন সফল ব্যবসায়ী, যারা ইতালির অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এই সফলতার গল্পগুলোই বলে দেয়, ইতালি আজ আর শুধু প্রবাস নয়-এটি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবারের “দ্বিতীয় ঘর”।

রোমের টার্মিনি স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কোনো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েন, তাহলে ভেতরের দৃশ্য আপনাকে মুহূর্তেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঢাকার কোনো অলিগলির পরিচিত পরিবেশে। কাচের শোকেসে সাজানো গরম গরম সামোসা, সিঙ্গারা, জিলাপি আর রসগোল্লা। পাশে বড় পাতিলে ফুটছে হালিম, যার ঘ্রাণ চারদিক ভরিয়ে তুলছে। এক কোণে প্লাস্টিকের বালতিতে ভিজছে চটপুটি, মশলার ঝাঁঝালো গন্ধে জিভে জল চলে আসছে। টেবিলে বসে ইতালিয়ান এক দম্পতি বিরিয়ানি খাচ্ছেন, পাশে তাদের ছোট্ট সন্তান হাসিমুখে রুটি-চিকেন কারি উপভোগ করছে। রেস্টুরেন্টের টিভিতে চলছে বাংলাদেশি চ্যানেল, হয়তো কোনো নাটক বা সংগীত অনুষ্ঠান, যা ব্যস্ত ক্রেতাদের মুহূর্তের জন্য হলেও মাতৃভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ ওয়েটারটি ইতালিয়ান ভাষায় অর্ডার নিচ্ছে, আবার এক মুহূর্ত পরই অন্য টেবিলের বাংলাদেশি ক্রেতার সাথে বাংলা আড্ডায় মেতে উঠছে। দেয়ালে ঝুলছে লাল-সবুজ পতাকা, পাশে হয়তো কোনো ক্রিকেট দলের পোস্টার। একপাশে রাখা ফ্রিজে ঠান্ডা পানীয়র সাথে পাওয়া যাবে "চা-গরম"-আদা ও লেবুযুক্ত সেই লাল চা, যা রোমের শীতল সন্ধ্যায় এক চুমুকেই যেন বাংলাদেশকে কাছে টেনে আনে।

কিন্তু বাংলাদেশিদের ব্যবসা শুধু রেস্টুরেন্টেই সীমাবদ্ধ নয়। রোম থেকে শুরু করে বলনিয়া, মিলান কিংবা ভেনিস প্রায় সব শহরেই রয়েছে বাংলাদেশিদের গড়ে তোলা ছোট-বড় দোকান। কোথাও মিলবে পান-সুপারি, চানাচুর, ঝাল মুড়ি; কোথাও আবার রসগোল্লা, সন্দেশ বা মিষ্টি দই। রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাবে ভ্রাম্যমাণ জুতার পলিশের দোকান কিংবা মোবাইল এক্সেসরিজ বিক্রি। কেউবা খুলেছেন মোবাইল মেরামতের দোকান, আবার কেউ গড়ে তুলেছেন সুপারশপ বা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা।

যারা একসময় রোমের পার্কে কিংবা ঐতিহাসিক নিদর্শনের সামনে ফুল বিক্রি করতেন, তারাই এখন ছোট-বড় রেস্টুরেন্টের মালিক। তাদের অধিকাংশই পরিবার নিয়ে ইতালিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সন্তানরা ইতালিয় ভাষায় কথা বলে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে এখনও শোনা যায় বাংলাদেশের গান, বাংলা নাটক কিংবা মায়ের রান্না করা খিচুড়ির ঘ্রাণ।

রোমের রাস্তাঘাটে কিংবা ইতালির অন্যান্য শহরের কোণায় দাঁড়ালে আজকের প্রজন্ম হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না তাদের পূর্বসূরিদের সংগ্রাম কতটা কঠিন

ছিল। আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যারা প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইতালিতে এসেছিলেন, তাদের জীবন শুরু হয়েছিল একেবারেই শূন্য হাতে। ভাষা জানা নেই, বৈধ কাগজ নেই, পরিচিত কেউ নেই; শুধু বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

অধিকাংশের হাতেই তখন একমাত্র ভরসা ছিল রাস্তার মোড়ে ফুল বিক্রি। ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলতেই মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন তারা। কখনো হাতে ছোট্ট বালতি আর কাপড়, কখনো ডান্ডা দিয়ে দ্রুত গাড়ির কাঁচ মুছে দিতেন। ত্রিশ সেকেন্ডের এই কাজের বিনিময়ে কেউ হয়তো এক বা দুই ইউরো দিতেন, কেউ কিছুই দিতেন না, আবার দয়াবশত অনেক সময় পাঁচ ইউরো পর্যন্ত হাতে তুলে দিতেন। শীতের তীব্র তুষারপাত হোক বা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ কিংবা হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি সবকিছুর মাঝেই এভাবেই কাটাতে হয়েছে প্রতিদিন।

রোমসহ ইতালির বড় শহরগুলিতে তখন পার্ক কিংবা জনসমাগমস্থলে দেখা যেত এ দৃশ্য। কোনো যুগল বা পরিবার যখন একটু নিরিবিলি বসে আছে, তখন হঠাৎ এক বাংলাদেশি হাজির হতেন হাতে ফুল বা রসুন নিয়ে। ভাষার তেমন দরকার হতো না, ক্রেতারা বুঝে নিতেন, অভাবের তাড়নায় ভিনদেশি এ মানুষগুলো তাদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। অনেকে কিনে নিতেন, কেউবা উপহার হিসেবে দিতেন কিছু টাকা। আবার অনেকেই তখন চাইনিজ খেলনা, সস্তা গৃহস্থালি পণ্য কিংবা বিভিন্ন রকম ছোটখাটো জিনিসপত্র বিক্রি করে দিন গুজরান করতেন।

প্রাথমিক জীবনের এই সংগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছেন অনেকেই। যারা একসময় ট্রাফিক সিগন্যালে ফুল বিক্রি করতেন বা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সস্তা পণ্য বিক্রি করতেন, তারাই আজ ছোট-বড় দোকান, রেস্তোরাঁ কিংবা ব্যবসার মালিক। অনেকে চাকরির পাশাপাশি ফাঁকা সময়েও এসব কাজ চালাতেন। তবে এই কাজের সাথে ঝুঁকিও ছিল সব সময় কখনো পুলিশ এসে পণ্য জব্দ করেছে, কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে একদিনের উপার্জন ভেসে গেছে। তবুও হাল ছাড়েননি তারা।

তাদের এই সংগ্রামকে অনেক ইতালিয়ান ভিক্ষাবৃত্তির মতো করে দেখতেন। ইউরোপে সরাসরি হাত পেতে ভিক্ষা চাওয়া আইনত অপরাধ, কিন্তু বাংলাদেশিদের এ পথ বেছে নিতে হয়নি। বরং ফুল, খেলনা, ছোটখাটো সামগ্রী বিক্রি এসবের মাধ্যমেই টিকে থেকেছেন তারা। এটাই ছিল তাদের উপার্জনের প্রাথমিক ধাপ, যা আজকের প্রবাসী সমাজের শক্ত ভিত তৈরি করেছে।

কিন্তু তাদের সন্তানরা, যারা এখন ইতালিতেই বড় হচ্ছে, হয়তো জানেই না বাবা-মায়ের এই রুদ্ধশ্বাস সংগ্রামের ইতিহাস। তারা শুধু জানে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যায়, খরচ মেটানো যায় এবং সংসার চলে যায়। অথচ এই টাকার পেছনে লুকিয়ে আছে ঘাম, ক্লান্তি আর অপমান সহ্য করা প্রজন্মের অজানা গল্প।

এরাই একসময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস ছিলেন। তাদের ঘাম-ঝরানো কষ্টের টাকায় দেশের অর্থনীতি সচল থেকেছে বহু বছর। প্রবাস জীবনের এই ইতিহাস আসলে শুধু বেদনার নয়; বরং গৌরবেরও-কারণ আজকের প্রজন্মের অনেকেই সেই ফুল বিক্রেতা কিংবা রাস্তার ফেরিওয়ালার সন্তান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, ব্যবসা করছে, নতুন পরিচয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ইতালির মাটিতে।

রোমের ছোট্ট বাংলাদেশি কমিউনিটি হলে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে রঙিন পোস্টার আর ব্যানার। রাস্তায় ছোট ছোট দোকান, ক্যাফে আর রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঝলমলে আলো আর বাংলাদেশের পতাকা সবই যেন অন্য কোনো দেশে পা রাখার অনুভূতি দেয়। তবে এই সব দৃশ্যের মাঝেও সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয় তাদের উৎসব।

প্রতি বছর রোমের উজ্জ্বল রাস্তা ও পার্কগুলো হয়ে ওঠে ছোট্ট বাংলাদেশি শহর। মেলার সময়ে চোখে পড়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন, যেখানে বাঙালি পরিবারগুলো রঙিন জামা-পায়জামা, পিঠা, মিষ্টি আর ঢাকার মতো মঞ্চশিল্প নিয়ে হাজির। ছোট-বড় সবাই অংশ নেয়, আর রাস্তায় ভিড় জমে যায় গান, নাচ ও খেলায়। বাচ্চারা লাল-সবুজ রঙের পতাকা হাতে নিয়ে আনন্দে ঝলমল করে।

ভাষা দিবসে রোমের ছোট কমিউনিটি হলগুলোতে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠ, গল্প বলা, বাংলা গান আর লিপিচর্চা। এখানে এসে প্রত্যেক প্রবাসী মনে করে, "আমরা আমাদের মাতৃভূমি ভুলিনি।" ভাষার ছন্দ আর সুর বিদেশের মাটিতেও তাদের হৃদয়কে গরম রাখে।

ওয়াজ মাহফিলও সেই সংস্কৃতির অংশ। শনিবার বা রবিবার হলে মসজিদের হলভবন ভরে যায়-পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সবাই শুনতে আসে। বক্তারা কুরআনের পাঠ ও ইসলামের নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিষয়ও আসে আলোচনায়। এই ওয়াজ মাহফিলের জন্য লন্ডন থেকেও উস্তাজ বা শায়েখকে নিয়ে আসা হয়। মাহফিলগুলোতে খাবারের ব্যবস্থা থাকে এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ওয়ায়েজিনদের

হায়ার করাও করা হয়। রোমের বা মিলানের কোনো প্রবাসী বাংলাদেশি যখন দেশে বা বিদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে বলেন, তখন সবাই চুপচাপ শুনে নেয়, ভাবছে কীভাবে নিজের পরিচয়, নিরাপত্তা আর পরিচিতি বজায় রাখা যায়।

আমি নিজেও একবার বিশাল 'লোকমেলার' আয়োজন করেছিলাম। সেই মেলায় বাংলাদেশের হা-ডু ডু, বস্তা দৌড়, পাতিল ভাঙা, বালিশ খেলা, সুই সুতা খেলা, বিসকট দৌড়, মুরগির লাড়াই ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ছিল। এটি আনকোনার ইয়েসী শহরে আয়োজন করা হয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত অনুষ্ঠান শুধুই বিনোদন নয়; এগুলো বাংলাদেশি কমিউনিটির আত্মপরিচয় জাগ্রত রাখে। এখানে কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুল বিক্রি বা রেস্টুরেন্টে কাজ করতে পারে, আবার কেউ হয়তো অফিসে বা দোকানে ব্যস্ত। তবু উৎসবগুলো তাদের একত্রিত করে, স্মরণ করায় যে তারা এক ছাতার তলায় হলেও বাংলাদেশ থেকে আগত, আর মাতৃভূমির সংস্কৃতির সঙ্গে এখনও আবদ্ধ।

এভাবে রোম, মিলান, ট্রেভিজো কিংবা পালেরমো-যেকোনো শহরেই উৎসবের সময় বাংলাদেশিদের উপস্থিতি চিত্র দেয় যেন বিদেশের মাটিতে একটি ছোট্ট বাংলাদেশ। সব বয়সের মানুষ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। এই উৎসবগুলো প্রবাসী জীবনের একান্ত আনন্দ ও সংগ্রামের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত মুহূর্ত তৈরি করে, যেখানে সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সব দিক একসাথে মিশে যায়।

রোমের দূতাবাসের অফিসে বসে রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে একবার কথা বলছিলেন। তাঁর চোখে স্পষ্ট, ইতালি এবং বাংলাদেশ একে অপরের সঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি করেছে, তাতে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি ও সংস্কৃতির মিলন ঘটছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ শুধুমাত্র গ্যাস ও তেলের দরপত্র আহ্বান করছে না, বরং এটি ইতালিয়ান কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলছে।"

তেল ও গ্যাস খাতে ইতালির প্রধান বহুজাতিক কোম্পানি 'এনি' এই দরপত্র পর্যবেক্ষণ করছে। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ উপকূলে অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যেখানে মোট ২৪টি অফশোর ব্লক রয়েছে নয়টি অগভীর এবং পনেরোটি গভীর সমুদ্র ব্লক। এভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সঙ্গে ইতালির অংশীদারিত্ব আরও দৃঢ় হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত আলেসান্দ্রো বলেন, "এলএনজি, নবায়নযোগ্য শক্তি ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এই সব ক্ষেত্রে ইতালিয় সংস্থার প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করছে।"

কেবল ব্যবসা নয়, বাংলাদেশ ও ইতালির সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকও গুরুত্বপূর্ণ। ইতালিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে ইতালির সঙ্গে মিশে গেছে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যবসা, রেস্টুরেন্ট, রেস্তোরাঁ, হালাল খাবারের দোকান, কাঁচা বাজার এবং শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রদূত আলেসান্দ্রো উল্লেখ করেন, "ইতালিতে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি দুই দেশের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করছে। এটি শুধু বাণিজ্য নয়, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের নতুন দ্বার খুলছে।"

বাংলাদেশ ও ইতালির সম্পর্কের ইতিবাচক প্রেক্ষাপটে ইতালি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, "বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বৃহত্তম সৈন্য প্রেরণকারী দেশ, এবং এটি দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করছে।"

অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সরাসরি যোগাযোগও সহজ হচ্ছে। রোমে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নতুন ফ্লাইট ইতালি-বাংলাদেশের ব্যবসা ও পর্যটন ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলেছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, "সরাসরি আকাশপথের যোগাযোগ আমাদের সম্পর্ককে আরও ত্বরান্বিত করছে।"

এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্য ইতালির ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এক সুবর্ণ সুযোগের দরজা তৈরি করছে। শুধুমাত্র তেল ও গ্যাস নয়, নবায়নযোগ্য শক্তি, এলএনজি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইতালিয়ান প্রযুক্তি বাংলাদেশে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করছে। একই সঙ্গে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইতালির বিভিন্ন শহরে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দুই দেশের বন্ধুত্বের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করছে।

রাষ্টদূত আলেসান্দ্রো জানান, দুই দেশের সম্পর্ক শুধুমাত্র অতীতের উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা ও মৌলিক বাণিজ্য সীমিত নয়। বর্তমান সময়ে এটি বহুমুখী-বাণিজ্য, অভিবাসন, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং শিক্ষা সব মিলিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছে। তিনি যোগ করেন, "বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ নয়; উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ইতালিয়ান ব্যবসায়ীদের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি

করছে। দুই দেশের একে অপরকে দেয়ার মতো অনেক কিছু রয়েছে এবং আমরা এখনও পুরোপুরি এটি কাজে লাগাইনি।”

এই সব ক্ষেত্রের মিলন ইতালি ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে শুধু ব্যবসায়িক নয়, সংস্কৃতিগত, সামাজিক ও কৌশলগত দিক থেকেও শক্তিশালী করছে। রাষ্টদূতের চোখে, ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে নতুন দরজা খোলা সম্ভব, যেখানে ব্যবসা, প্রযুক্তি, প্রবাসী সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

ইতালির স্বপ্নের পেছনে কত বাংলাদেশির জীবন যেন ঝুঁকির সঙ্গে দোলা দিচ্ছে, তা বোঝার জন্য শুধু সংখ্যা বা রিপোর্ট দেখলেই হয় না; এই গল্পগুলো মানবিক কষ্ট ও সাহসের গল্প। লিবিয়া থেকে ইতালির বিপজ্জনক নৌপথে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশিরা যাত্রা করছেন জীবনবাজি রেখে। তাদের অধিকাংশই উন্নত জীবন এবং জীবিকার খোঁজে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নেন। তবে বাস্তবতা হলো, অনেকেই কখনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না। ২০২৪ সালে ৪ হাজারের বেশি বাংলাদেশি এই পথে বের হয়েছেন, কিন্তু ৭০০-এরও বেশি মানুষ নৌকাডুবি বা অন্যান্য বিপদে প্রাণ হারিয়েছেন।

ভয়ংকর এই যাত্রার শুরু হয় বাংলাদেশ থেকে। সাধারণত দালাল ও মানবপাচারকারীরা অবৈধ পথে প্রবাসী তৈরি করেন। বাংলাদেশ থেকে প্রথমে দুবাই যাওয়ার পর, তুরস্ক বা মিসর হয়ে লিবিয়ায় পৌঁছানো হয়। সেখানে অভিবাসীদের একটি দলে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কীভাবে কম্পাস ধরে নৌকা চালাতে হবে। লিবিয়ার জোয়ারা ও তাজোরা উপকূল থেকে নৌকা ছাড়ার পর, দালালদের আর সঙ্গে থাকে না। তখন একমাত্র ভরসা ভাগ্যবিধাতা এবং তাঁদের নিজস্ব দক্ষতা। অনেকে সমুদ্রপথে হারিয়ে যান বা নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়। কেউ কেউ সিসিলি দ্বীপে পৌঁছালেও সেখানে কোস্টগার্ডের কাছে আটক হন, কারাগারে পাঠানো হয় এবং তারপর পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

ভূমধ্যসাগরের বিপদসংকুল পথ এ বছরও অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করা অবৈধ অভিবাসীর মধ্যে ৪৯,৬৯১ জন বাংলাদেশি ছিল, যা মোট আগমনের ২০ শতাংশ। লিবিয়া হলো প্রধান ট্রানজিট রুট, যেখানে বর্তমানে ২১ হাজারের বেশি বাংলাদেশি কাজ করছেন, যাদের ৮০ শতাংশেরও বেশি বৈধ কাগজপত্র নেই। দেশটিতে আটক বা ফেরত পাঠানো হচ্ছে কয়েক হাজার মানুষকে।

বাংলাদেশিরা এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে নেমেও যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ ইতালিতে আয়-রোজগার সহজ, এবং একবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারলে উন্নত জীবনের আশ্বাস। তবে তাদের জীবন বিপন্ন, অর্থ খরচ সীমাহীন-২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে কেউ কেউ নৌকায় চড়ে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সচেতনতামূলক প্রচারণা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বৈধ শ্রমিক প্রেরণের সুযোগ বৃদ্ধিই এই অবৈধ অভিবাসন কমাতে পারে।

যেখানে ইতালিতে বাংলাদেশি সম্প্রদায় দিন দিন দৃঢ় হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, হালাল খাবারের দোকান, ব্যবসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওই একই সময়ে হাজারো প্রবাসী ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে জীবন বাজি রাখছেন। লিবিয়া থেকে ইতালির বিপজ্জনক যাত্রা শুধু সংখ্যা নয়; এটি অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন, সাহস, ভয় ও ত্যাগের গল্প। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে উন্নত জীবনের জন্য মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি কতটা বড় এবং কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ও অন্যান্য মুসলিম অভিবাসীরা ইতালিতে যে সমস্যার মুখোমুখি, তা কেবল মসজিদ নির্মাণ বা নামাজের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, রোম, মিলান, পালেরমো, বোলোনিয়া, বার্লি ও অন্যান্য শহরে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র বা ইসলামিক স্কুল স্থাপন করা কঠিন। অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসন বা প্রতিবেশীরা নতুন কেন্দ্র বা স্কুল স্থাপনের অনুমতি দেয় না। ফলে শিশু ও কিশোররা স্কুলের বাইরে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, যা তাদের শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।

নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের নামে বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে মুসলিমদের সামাজিক কর্মকাণ্ডও সীমিত। শুক্রবারের খুতবা ইতালিয়ান ভাষায় দেওয়া বাধ্যতামূলক করার মতো নিয়মগুলো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি কমিয়ে দেয়। এমনকি কিছু অঞ্চলে ইসলামি উৎসব উদ্‌যাপনেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় পোশাক বা হিজাব পরিধানেও নানান সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধার মুখোমুখি হতে হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল। মুসলিম শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। অনেক স্কুল বিদেশি শিক্ষার্থীকে ভর্তি নেয় না বা তাদের ইতালিয়ান ভাষার দক্ষতার অভাবকে অবৈধতার কারণ হিসেবে দেখায়। ফলে শিশুদের শিক্ষাগত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মাতৃভাষা ও ধর্মীয়

পরিচয় হারানোর ঝুঁকি থাকে। ইতালিয়ান পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস প্রায়শই ভুল বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা তাদের মানসিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি আরও কঠিন করে তোলে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলিম অভিবাসীরা সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশি শ্রমিকরা প্রায়শই নির্মাণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কৃষি ও অন্যান্য নিম বেতনের কাজে নিযুক্ত। উচ্চশিক্ষিত বা দক্ষ শ্রমিকদের জন্য সুযোগ সীমিত। সামাজিক সুরক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাও সীমিত, ফলে তারা অসুস্থ বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে প্রায়শই বঞ্চিত হন।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও অন্তর্ভুক্তিতেও সমস্যা দেখা দেয়। ইতালির জনমত অনুসারে মুসলিমদের পরিবার বা প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতালি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় কম স্বচ্ছন্দ। ইসলামফোবিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রোজকার জীবন ও কর্মক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। কিছু সম্প্রদায়ের সন্তানরা বৈষম্য, হেনস্থা বা বিভেদমূলক আচরণের শিকার হন, যা তাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একবার রোমের একটি ছোট কিন্তু ব্যস্ত রেস্তোরাঁর ভেতরে আমরা বসে আলাপ করছিলাম। রেস্তোরাঁটির দেয়াল বরাবর ঝলমল করছে ইতালিয়ান ও বাংলাদেশি খাদ্যের গন্ধ, এবং বাইরে রাস্তায় শহরের কোলাহল। আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতা এবং ইতালির ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আমিনুল ইসলাম। তার কথা শুনতে শুনতে বোঝা গেল, কেবল ধর্মীয় দিক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রেও বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সামনে রয়েছে জটিল চ্যালেঞ্জ।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম বললেন, বর্তমানে রোম এবং অন্যান্য শহরে বাংলাদেশি মুসলিমদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নানা সমস্যার মুখোমুখি। ছোট মসজিদগুলোর সংখ্যা কম, এবং অনেক সময় স্থানীয় প্রতিবেশীদের অভিযোগের কারণে এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তরুণ প্রজন্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না থাকার কারণে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, "শুধু সমস্যার কথা বললেই হবে না; সমাধানও দরকার। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে তরুণদের জন্য ইসলামিক শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় তৈরি করা। এতে তারা শিক্ষাগতভাবে শক্তিশালী হবে এবং সামাজিকভাবে মূলধারায় প্রবেশ করতে পারবে।"

তার মতে, নতুন প্রজন্মকে মূলধারায় আনতে পরিবার এবং কমিউনিটি দুইয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার যদি শিশুদের সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি যত্নশীল হয়, আর কমিউনিটি যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহায়তা প্রদান করে, তবে তরুণরা ইতালির সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে। তিনি আরও বলেন, "আমাদের তরুণদের মধ্যে সামাজিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। তারা শুধু নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক।"

মাওলানা আরও ভাবনার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন যে, ইসলামিক শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় কেবল শিক্ষাগত বিকাশ নয়, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিরও একটি প্রধান উপায়। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন যে, যারা এমন সমন্বয় তৈরি করতে পেরেছে, তারা ইতালিয়ান সমাজে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মের জন্য রোল মডেল হিসেবে কাজ করছেন।

ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার অংশ হিসেবে তিনি মনে করলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটি যেন আরও সক্রিয়ভাবে সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগে অংশ নেয়। মাওলানা বলেন, "যখন কমিউনিটি শক্তিশালী হবে, পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় হবে, তখন আমাদের তরুণরা নিজস্ব পরিচয় বজায় রেখে ইতালিয়ান সমাজের সঙ্গে সফলভাবে মিশে যেতে পারবে।"

রেস্তোরাঁর বাতাসে গন্ধ আর চা-চিনি মিশ্রিত আলোকে অনুভব করতে করতে বোঝা গেল, এটি কেবল একটি আলাপ নয়; বরং ভবিষ্যতের এক দিকনির্দেশনার সংলাপ। মাওলানা আমিনুল ইসলাম তার ভাবনা দিয়ে দেখালেন কীভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা এবং সমাধানের দিকে এগোনো যায়। তরুণদের শিক্ষা, সামাজিক নেতৃত্ব এবং মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি এগুলো কেবল কমিউনিটির নয়, পুরো ইতালিয়ান সমাজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

রোমের সেই ছোট রেস্তোরাঁয় বসে মাওলানা আমিনুল ইসলাম আরও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেন। তিনি উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা তুলে আনলেন। তিনি বললেন, "দেখুন, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি মুসলিমরা শুধু নিজেদের কমিউনিটিতে নয়, পুরো সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। তারা স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, সমাজসেবায় নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের সঙ্গে সমন্বয় করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

তিনি আরও যোগ করলেন, "এখান থেকে আমাদের শেখার আছে। ইতালিতেও আমাদের মুসলিমদের বিশেষ করে বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে চাপ দিয়ে যেতে হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য। আমাদের তরুণদের কেবল শিক্ষা দেওয়া নয়, তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। কমিউনিটি এবং পরিবার দুটি মিলে যদি তাদের উৎসাহিত করে, তবে তারা ইতালিয়ান সমাজে কেবল অংশগ্রহণকারী নয়; বরং সক্রিয় নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।"

মাওলানা মনে করিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের অভাব অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বললেন, "যদি আমরা সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব তৈরি করি, তরুণদের ক্ষমতায়ন করি, এবং সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করি, তবে আমাদের কমিউনিটি কেবল নিজেদের জন্য নয়, পুরো ইতালিয়ান সমাজের জন্যও উপকারী হবে।"

তার এই বক্তব্যে স্পষ্ট হলো, শুধু সমস্যা চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়; সমাধান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত নেতৃত্ব তৈরি করা অপরিহার্য। যুক্তরাজ্যের উদাহরণ প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রস্তুতি, নেতৃত্ব এবং সামাজিক সক্রিয়তা কমিউনিটিকে শক্তিশালী করে।

ইতালিয় মুসলিম তরুণদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ

–ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী

১. ভূমিকা

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড এবং ক্যাথলিক বিশ্বের কেন্দ্রভূমি contemporary হিসেবে পরিচিত ইতালি দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে এক প্রভাবশালী অক্ষরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্যিক উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে ক্যাথলিক চার্চের প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক সদর দপ্তর "ভ্যাটিকান সিটি"-র উপস্থিতি পর্যন্ত ইতালি ইতিহাস, ধর্ম, সাম্রাজ্যনীতি এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক বিন্যাসে ধারাবাহিক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এর পাশাপাশি, তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ এক ইসলামিক ঐতিহ্যও ইতালির অতীতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, যা এক সহস্রাব্দ পূর্বে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির নির্দিষ্ট অঞ্চলে মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের যুগে ফিরে যায় এবং স্থাপত্য, বিজ্ঞান, কৃষি ও ভাষার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে।

সমসাময়িক ইতালি বর্তমানে ইতিহাস, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় বাস্তবতা এবং নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সংযোগস্থলে অবস্থান করছে। দেশের পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ যারা আদি ইতালিয় এবং বৃহত্তর অংশ অভিবাসী ও তাদের উত্তরসূরিরা ক্রমবর্ধমান হারে দৃশ্যমান এক সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্ম যারা বিভিন্ন জটিল ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন; যেমন-সামাজিক একীকরণের অসুবিধা, পরিচয় সংকট, শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা, এবং বৃহৎপরিসরে সীমিত আকারে তাদের প্রতিনিধিত্বের উপস্থিতি। তদুপরি, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিক অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক পুনর্নবীকরণ, এবং সমাজে সক্রিয় অবদানের ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত সম্ভাবনারও উদ্ভব ঘটছে।

এই প্রবন্ধে ইতালির ইসলামসম্পৃক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সমকালীন মুসলিম উপস্থিতির বাস্তবতা, মুসলিম যুবসমাজের সম্মুখীন প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তাদের জন্য সম্ভাব্য অগ্রগতির পথসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে প্রজন্ম আজ বিশ্বাস,

নাগরিকত্ব এবং জাতীয় ভবিষ্যতের এক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে এবং যার ভূমিকা আগামী ইতালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট রূপায়ণে নির্ধারক হতে পারে।

২. ঐতিহাসিকভাবে ইতালিতে মুসলিমদের উপস্থিতি

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইতালির সম্পৃক্ততা কোনো সমসাময়িক বা আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ। নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিসিলির বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত আঘলাবীয় এবং পরবর্তীতে ফাতিমীয় শাসনের অধীনে মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সুসংহত রূপ লাভ করে। এই সময় পালের্মো একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর-সভ্যতায় পরিণত হয়; যা শিক্ষা, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদির সমন্বয়ে গঠিত ঐ বহুজাতিক নগর-সমাজ পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁর যে মানবিক ও বিশ্বজনীন চরিত্র উদ্ভাসিত হয়, তার একটি পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মধ্যযুগ পরবর্তী ইউরোপ, বিশেষত ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত রেনেসাঁ-পর্ব, যাকে ক্লাসিক্যাল জ্ঞান, শিল্প ও বৌদ্ধিক সংস্কৃতির “পুনর্জন্ম” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, মূলত এটি ইতালিয় উৎপত্তির ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে এর বৌদ্ধিক ভিত্তি গঠনে ইসলামি সভ্যতার অবদান ছিল সুস্পষ্ট ও বহুমাত্রিক। ইসলামি কৃষি-প্রযুক্তির, বিশেষ করে সেচব্যবস্থার প্রবর্তন, ইতালিয় কৃষিকে নতুন গতিশীলতা প্রদান করে; অপরদিকে বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত এবং ভূগোলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবি গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে যে জ্ঞান-প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তা ইউরোপীয় রেনেসাঁর বৌদ্ধিক পরিকাঠামো নির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

তবে ক্রুসেড-পরবর্তী সামরিক উত্তেজনা, অটোমান সাম্রাজ্যের ভূমধ্যসাগরীয় বিস্তার, এবং লিবিয়া, ইরিত্রিয়া ও সোমালিল্যান্ডে ইতালির ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ডসহ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের উত্থান এই সমস্ত প্রক্রিয়া ইসলামের সঙ্গে ইতালির সম্পর্ককে ধীরে ধীরে দূরত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মাঝে মাঝে সংঘর্ষে রূপান্তরিত করে। তবুও এই ইতিহাসগত বিচ্ছিন্নতা আধুনিক পর্বে স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শ্রমবাজারের পুনর্বিন্যাস এবং বৈশ্বিক অভিবাসন-প্রবাহের ফলে ইতালির মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় একটি নতুন মাত্রায় বিকশিত হয়। এবার সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সামরিক প্রতিযোগিতা বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নয়; বরং মানবিক, অর্থনৈতিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং বিশ্বায়ন-নির্ভর

বাস্তবতা, যার মাধ্যমে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসীদের উপস্থিতি ইতালিয় সমাজে একটি স্থায়ী উপাদানে পরিণত হয়েছে।

৩. সমকালীন ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতি

আধুনিক ইতালিতে ১৯৭০-এর দশক থেকে মুসলিম উপস্থিতি[৪৭]-র শিকড় গজাতে শুরু করে এবং ১৯৯০-এর দশক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়। বর্তমানে, অনুমান অনুসারে ইতালিতে ২৫ লক্ষেরও (*তবে কোনো কোনো তথ্যমতে প্রায় ৬০ লাখ, Islamicity-এর ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী ২.৬ মিলিয়ন যা সে সময়ের জনসংখ্যার ৪.৩০%। ইতালির আদমশুমারিতে মুসলিম জনসংখ্যাকে গণনা করা হয় না বিধায় সঠিক সংখ্যা পাওয়া দুরূহ–গ্রন্থাকার)* বেশি মুসলিম রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪-৫%। যাদের বেশির ভাগই মরক্কো, আলবেনিয়া, তিউনিশিয়া, মিশর, পাকিস্তান, সেনেগাল এবং বাংলাদেশ থেকে আসা প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী যার মধ্যে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৫০,০০০-এরও বেশি, যারা রোম, মিলান এবং নেপলসের মতো শহরে কেন্দ্রীভূত। (*tuttitalia.it-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ইতালিতে বৈধ বাংলাদেশির সংখ্যা ১৯২৬৭৮ জন বা দুই লাখ গ্রন্থাকার)*

যদিও ইতালির বেশির ভাগ মুসলিম বিদেশি বংশোদ্ভূত, তবুও ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ইতালিয় বংশোদ্ভূত তরুণ যারা সাবলীলভাবে ইতালিয় ভাষায় কথা বলে এবং ইতালিয় স্কুলে শিক্ষিত। এই প্রজন্ম “নতুন ইতালিয়” হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে তারা সাংস্কৃতিকভাবে সংকর, সামাজিকভাবে সংযুক্ত এবং তাদের ইতালিয় পরিচয় এবং মুসলিম বিশ্বাস উভয়ই দাবি করার জন্য তারা যথেষ্ট আগ্রহী বা আত্মবিশ্বাসী। তবে ইতালির অবস্থা ফ্রান্স বা যুক্তরাজ্যের মতো নয়, ইতালিতে কনকর্ডাট (*Concordat)*-ভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেখানে ক্যাথলিক ধর্ম এবং অন্যান্য কিছু ধর্মকে আইনি সুযোগ দেয় কিন্তু ইসলামকে তখনও সে সুযোগ দেয়নি। যেহেতু ইতালির মুসলিমরা এখন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক ধারাবাহিক বাস্তবতা, তাই তাদের স্বীকৃতির এই অভাব ধর্মীয় বিষয়, মসজিদ নির্মাণ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবেশাধিকারকে স্বভাবিকভাবে প্রভাবিত করে। কেউ কেউ

---

[47] https://www.agenzianova.com/en/news/in-Italy-among-migrants-there-are-16-million-Muslims%2C-53-percent-are-Christians/?utm_source=chatgpt.com

“পরিচয়, স্বত্ব এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্য মুসলিমদের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ইতালিয় রাষ্ট্রের সাথে একটি ‘ইন্টেসা’[৪৮] (আনুষ্ঠানিক চুক্তি)-এর প্রয়োজনীয়তা” সম্পর্কে কথা বলছেন।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিক হতে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশিরা তাদের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দৃশ্যমান সামাজিক অবদানের জন্য আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে; অনেকেই রাস্তায় ভ্রাম্যমান দোকান, রেস্তোরাঁর কাজ এবং ছোট ব্যবসার মতো বিভিন্ন খাতে প্রবেশ করেছে। আজ, ইতালিতে বাংলাদেশি সম্প্রদায় সবচেয়ে সংগঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। রোমের তর পিনাত্তারাকে, যাকে প্রায়শই “বাংলা শহর”[৪৯] নামে আখ্যায়িত করা হয়, যেখানে অভিবাসীদের একীভূত করার চ্যালেঞ্জ এবং গতিশীলতা উভয়ই চিত্রিত করে। প্রাথমিক দিকের বাংলাদেশি প্রজন্মগুলি অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার লড়াইয়ের ওপর মনোযোগ দিলেও, আজকের তরুণ প্রজন্ম যারা ইতালিয় বংশোদ্ভূত বা বেড়ে ওঠা, তারা জীবিকা নির্বাহের বাইরেও নাগরিক সম্পৃক্ততা, উচ্চশিক্ষা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৪. আর্থ-সামাজিক এবং পরিচয়ের চ্যালেঞ্জ

ইতালিতে তরুণ মুসলিমদের সামনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো কাঠামোগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিচয়গত গতিশীলতার ওপর নিহিত।

৪.১. আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রান্তিকীকরণ

ইতালিয় সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলাম এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছে।[৫০] ক্যাথলিক ধর্ম, যা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক অংশীদার ইহুদি ধর্ম এবং নির্দিষ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলিমদের সঙ্গে এখনো কোনো intera (রাষ্ট্র-স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক চুক্তি) সম্পাদিত হয়নি। অথচ পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ইতালির দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এবং অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত বিশ্বাসব্যবস্থা।

---

[48]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/c10/muslims-italy?utm_source=chatgpt.com
[49] https://euroacademia.eu/presentation/tor-pignattara-as-rome%E2%80%99s-banglatown-the-suburb-as-a-feminine-racialized-spacetime/
[50] https://iris.polito.it/handle/11583/2951945?utm_source=chatgpt.com

ইতালিতে নগর-পরিসরে মুসলিম উপস্থিতি মূলত চারটি প্রধান "সামাজিক-ধর্মীয় ল্যান্ডমার্ক"-মসজিদ, হালাল কসাইখানা, সমাধিস্থল এবং জনজীবনের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠান ও চর্চা সাধারণত শহরের প্রান্তবর্তী বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে; ফলে মুসলিম সম্প্রদায় স্থানিয়ভাবে প্রান্তিক অবস্থানে রয়ে যায় এবং নাগরিক দৃশ্যপটে তাদের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। আন্তেসার অনুপস্থিতি মুসলিম জনসম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে—

১) ধর্মীয় সংগঠনের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি ও সমন্বয়ের অভাব,

২) মসজিদ ও ধর্মীয় কার্যক্রমের জন্য সরকারি অনুদান বা সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা,

৩) মুসলিম ধর্মীয় ছুটি বা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পাওয়া।

অপরদিকে, মসজিদ নির্মাণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও স্থানীয় প্রশাসনিক বাধা মুসলিম সম্প্রদায়কে আরও প্রান্তিক করে তোলে। এর ফলে বহু স্থানে মানুষকে অস্থায়ী কক্ষ, বাণিজ্যিক গুদাম, গ্যারেজ বা শেয়ার্ড স্পেসে নামাজ আদায় করতে হয়। এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র ধর্মীয় চর্চার মানহানি ঘটায় না; বরং মুসলিমদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, কম দৃশ্যমান এবং কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতাকেও জোরদার করে।

ফলত, ইতালিতে মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত অবস্থান কেবল আইনগত বা প্রশাসনিক প্রশ্ন নয়; বরং অন্তর্ভুক্তি, প্রতিনিধিত্ব এবং নাগরিক সমতা প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের অংশ।

৪.২. আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা এবং যুব বেকারত্ব

ইতালিতে মুসলিম অভিবাসীরা প্রায়শই নির্মাণ, রেস্তোরাঁ, কৃষি এবং রাস্তার দোকানের মতো নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে। তরুণ মুসলিমদের জন্য, বিশেষ করে যারা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বা বেড়ে উঠেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি গভীর হতাশার অনুভূতি তৈরি করে তারা সাংস্কৃতিকভাবে একীভূত কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত। ইতালিতে বিদেশি বংশোদ্ভূত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ৩০%, *(বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ১১%-গ্রন্থাকার)* যা জাতীয় গড়ের প্রায় দ্বিগুণ। ইতালিয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিয়োগ, আবাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়।

ইতালিতে বাংলাদেশিদের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, তাদের বর্তমান জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে। যেখানে ১৯৯৫ সালে ৫,৫৪১ জন নিয়মিত বাসিন্দা থেকে ২০১৬ সালে ১৪২,৪০৩ জনে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এই সম্প্রদায়।[৫১]

৪.৩. পরিচয় সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা

ইতালিয় মুসলিম তরুণরা বর্তমানে এক বহুমাত্রিক ও জটিল পরিচয়-নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে তারা তাদের পিতামাতার জন্মভূমির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রত্যাশাকে ইতালিয় ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। এই অভিজ্ঞতা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বতন্ত্র। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে মুসলিম সম্প্রদায় বহু দশকের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ, রাষ্ট্র-সম্পর্কিত স্বীকৃতি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দৃশ্যমানতা অর্জন করলেও, ইতালিয় মুসলিমরা এখনো গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং জাতীয় রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে অদৃশ্য রয়ে গেছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক অদৃশ্যতা তরুণ মুসলিমদের আত্মপরিচয় গঠনে বিশেষ ধরনের চাপ তৈরি করে।

ফলে ইতালির বহু তরুণ মুসলিম দ্বৈত-পরিচয়ের একটি অন্তর্গত টানাপোড়েনে আক্রান্ত হন। পিতামাতার প্রজন্মের দৃষ্টিতে তারা প্রায়ই "অত্যধিক ইতালিয়", যাদের সাংস্কৃতিক অভ্যাস, ভাষা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ "আদিবংশীয়" মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত বলে বিবেচিত হয়। অপরদিকে মূলধারার ইতালিয় সমাজের কাছে তারা "অত্যধিক বিদেশি"-চেহারা, নাম, ধর্মীয় পরিচয় বা সাংস্কৃতিক চর্চার কারণে। এই দ্বৈত অবস্থান তরুণদের জন্য একটি "লিমিনাল স্পেস"-না পুরোপুরি ভেতরে, না পুরোপুরি বাইরে এ রকম এক জটিল সামাজিক অবস্থান তৈরি করে।

এই পরিচয়গত টানাপোড়েন প্রায়শই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মসংশয় বা সাংস্কৃতিক প্রত্যাহারের দিকে ধাবিত করতে পারে, বিশেষত সেই প্রেক্ষাপটে যেখানে জনসাধারণের আলোচনায় ইসলামকে নিরাপত্তাহীনতা, রক্ষণশীলতা বা অসামঞ্জস্যের কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডানপন্থি জাতীয়তাবাদ, অভিবাসী-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য, এবং লেগার মতো দলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মুসলিমদের সামাজিক প্রান্তিকতাকে আরও তীব্র করেছে; যা তরুণদের মাঝে নতুন ধরনের অসংগতির অনুভূতি সৃষ্টি করে।

---

[51] https://www.mdpi.com/2076-0760/8/4/123?utm_source=chatgpt.com

তবুও দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে তরুণ মুসলিমরা কেবল সন্ত্রাসবাদ, নারীবিদ্বেষ বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার মতো প্রচলিত স্টেরিওটাইপ অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন না; বরং তারা এমন এক সমন্বিত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত যা একই সঙ্গে নাগরিক, ইতালিয় এবং আধুনিক হওয়ার সমান অধিকার দাবি করে। এই প্রচেষ্টা তাদেরকে ইতালির উদীয়মান বহুসাংস্কৃতিক নাগরিকত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার রূপে গড়ে তুলছে।

৪.৪. লিঙ্গ এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা

তরুণ মুসলিম নারীরা ইতালির সামাজিক বাস্তবতায় একটি স্বতন্ত্র ও জটিল অবস্থানের মুখোমুখি হন। যদিও পরিসংখ্যানিকভাবে দেখা যায় যে, তারা প্রায়শই শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেন এবং উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত সুযোগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন, তবুও তাদের অভিজ্ঞতা একাধিক আন্তঃসম্পর্কিত চাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়। একদিকে রয়েছে ঐতিহ্যনির্ভর পারিবারিক প্রত্যাশা, অন্যদিকে বৃহত্তর ইতালিয় সামাজিক পরিমণ্ডলে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভুল ধারণা। ফলে তারা বহুস্তরীয় এবং প্রায়ই পরস্পর বিরোধী চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের দ্বৈত চাপে থাকেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হিজাব একটি বিশেষত স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত প্রতীক হয়ে উঠেছে। যদিও হিজাব ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পরিচয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বহিঃপ্রকাশ, ইতালির স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং জনপরিসরের বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটি সন্দেহ, নিরাপত্তা-উদ্বেগ বা সাংস্কৃতিক সংঘাতের চোখে দেখা হয়। ইতালিয় মুসলিম নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ স্কুল প্রশাসন, নিয়োগকর্তা অথবা সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য ও মাইক্রো-এগ্রেশনের অভিজ্ঞতার কথা জানান। এসব অভিজ্ঞতা কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নই নয়; বরং নাগরিক অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং পরিচয়গত স্বীকৃতির সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

তবুও, এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ইতালির তরুণ মুসলিম নারীরা দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। তারা পেশাজীবী, গবেষক, উদ্যোক্তা, সৃজনশীল কর্মী এবং সামাজিক কর্মী হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে দৃশ্যমান হচ্ছেন। তাদের সক্রিয় উপস্থিতি কেবল সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনই তৈরি করছে না, বরং অন্তর্ভুক্তি, নাগরিক সমতা এবং বৈচিত্র্যের পক্ষে সুসংগঠিত প্রচারণার অগ্রভাগেও নিয়ে আসছে। ফলে তারা ইতালিয় সমাজে ইসলামের প্রতিনিধিত্বের ধরন পুনর্নির্ধারণে অবদান রাখছেন এবং এমন এক

নাগরিক পরিচয়ের রূপরেখা নির্মাণ করছেন যা ধর্মীয় বিশ্বাস, নারী-স্বাধীনতা এবং আধুনিক নাগরিকত্বকে একই সঙ্গে ধারণ করতে সক্ষম।

৪.৫. নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের অভাব

ইতালিতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপক্বতা সত্ত্বেও, সরকারি অফিস, স্থানীয় কাউন্সিল এবং মূলধারার নাগরিক সংগঠনগুলিতে তরুণ মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে সীমিত। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত "ইন্টেসা"র অভাবের কারণে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রায়শই "বহিরাগত" হিসেবে মনে করার কারণে রাজনৈতিক মাঠে অংশগ্রহণের সুযোগকে যথেষ্টভাবে সীমিত করে। ভেনিসে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠন সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা যায়, যদিও সেখানো সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভিন্ন সমিতি বিদ্যমান, তা প্রায়শই মূলধারার নাগরিক-রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে শুধু সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে নিজেদের সীমাবদ্ধ থাকে।[৫২]

এই সকল প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা আজকের তরুণ মুসলিমদের নাগরিক জীবনে দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, নগর পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ এবং বৈষম্যবিরোধী নীতিনির্ধারণে যথাযথভাবে একীভূত হওয়ার পথকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, এটি একটি বর্জন এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাদের নাগরিক ক্ষমতায়ন এবং সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণকে দুর্বল করে।

৫. একীকরণ, সংলাপ এবং উদীয়মান কণ্ঠস্বর

এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও সেখানে আশাব্যঞ্জক উন্নয়ন ঘটছে। আজ ইতালিয় মুসলিম তরুণরা ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, নাগরিক সমিতি এবং আন্তঃধর্মীয় উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করছে। তারা সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করছে, সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলছে এবং স্টেরিওটাইপগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছে।

অভিবাসন, বৈচিত্র্য এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কিত জনসাধারণের বিতর্কে মুসলিম পেশাদার এবং কর্মীরা আবির্ভূত হতে শুরু করেছেন। বোলনিয়া, তুরিন এবং মিলানের মতো শহরে আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রকল্পগুলি স্কুল, এনজিও এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাগ করা নাগরিকত্ব এবং সংলাপকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে।

[52] https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/1063?utm_source=chatgpt.com

২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বোলনিয়াতে মসজিদ এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের দ্বারা পরিচালিত "নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রকম[৫৩]" দেখায় যে, কীভাবে সেই শহরে মসজিদ বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সংহতকরণ এবং নাগরিক অংশগ্রহণের স্থান হয়ে উঠেছে।

ইতালিয় ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana), মুসলিমদের এবং ভ্যাটিকান এর মধ্যে সংলাপ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আধ্যাত্মিকতা, শান্তি এবং নাগরিক দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম উপস্থিতির একটি অনন্য ইতালিয় মডেল গড়ে তুলেছে।

যুবপর্যায়ে, ইসলামি পরিবেশবাদ, স্বেচ্ছাসেবী এবং সামাজিক উদ্যোক্তাদের প্রচারের উদ্যোগগুলি সমাজে মুসলিমদের অবদানকে পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছে যা ইতালির নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামকে কল্যাণের শক্তি হিসেবে দেখায়।

আজ ইতালিয় মুসলিম তরুণরা-ইতালিয় শহরগুলির সামাজিক কাঠামোর সাথে মিশে থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাপী মুসলিম নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থেকে সাংস্কৃতিক সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। দ্বৈত পরিচয় তাদেরকে সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ লালন করার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশগত যত্ন এবং সংহতির ভাগ করার মূল্যবোধ প্রচারের অনন্য সম্ভাবনা প্রদান করে।

ইতালিয় শহরগুলিতে[৫৪] মুসলিম উপস্থিতির ওপর পর্যালোচনা শুধু ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতির স্থানিক প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্যের ওপরই আলোকপাত করে না, বরং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের জনসাধারণের সংযোগস্থলের ওপরও আলোকপাত করে। নগর জীবনে মুসলিমদের একীভূতকরণ এবং তাদের দৃশ্যমান নাগরিকত্ব স্টেরিওটাইপগুলি ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে।

৬. এগিয়ে যাওয়ার পথ: অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতালিয় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা

একবিংশ শতাব্দীতে আজকের আধুনিক ইতালিকে সুসংহত গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদী দেশ হিসেবে বিকশিত করতে হলে এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করতে হবে। অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মতো, এই রূপান্তরে ইতালিয় মুসলিম

[53] https://www.mdpi.com/2077-1444/16/10/1316?utm_source=chatgpt.com
[54] [54] https://iris.polito.it/handle/11583/2951945?utm_source=chatgpt.com

যুবকদেরও একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে যা বহুস্তরীয় কৌশলের একধরনের সেটের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ নিহিত রয়েছে।

৬.১. পরিচয় থেকে নাগরিকত্ব

মুসলিমদের, বিশেষ করে তাদের সন্তানদের নিজেদেরকে “অভিবাসী” বা “অতিথি” হিসেবে দেখার মানুষিকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকার পাশাপাশি সমান নাগরিক হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য তৈরি হতে হবে। এই রুপান্তরের জন্য মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন, ইতালিকে তাদের আত্মীয়ের মত ভাবা এবং তাদের মাতৃভূমি হিসেবে দাবি করার মাধ্যমে সমান অধিকার এবং সামজিক কর্তব্যসহ নাগরিক কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে হবে। এই বিশ্বাসে কোনও বাধা হওয়া উচিত নয় বরং সততা, করুণা এবং নাগরিক কর্তব্যের মূল্যবোধ লালনের উৎস হওয়া উচিত। এর জন্য অবশ্যই কিছু আইনি সংস্কার প্রয়োজন, যেমন: ইতালিয় রাষ্ট্র এবং মুসলিমদের মধ্যে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রবেশাধিকার এবং ধর্মীয়-শিক্ষানীতিতে প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি (ইনটেসা)।

৬.২. শিক্ষা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ

শিক্ষা ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি। মুসলিম পরিবার এবং তাদের সংগঠনগুলিকে মানসম্মত শিক্ষা, ভাষাগত সাবলীলতা এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বৃত্তি, পরামর্শদান কর্মসূচি এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ তরুণ মুসলিমদের সাংবাদিকতা, আইন, শিক্ষা এবং রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য সজ্জিত করতে পারে। দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণদেরকে সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা এবং নাগরিক ক্ষমতায়নের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করার ওপর বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ইতালিয় মুসলিম যুব ফোরাম তৈরি করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্ব এবং সমন্বয় গড়ে তুলতে পারে।

৬.৩. নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ

সক্রিয় নাগরিকত্ব মানে স্কুল, ইউনিয়ন, স্থানীয় কাউন্সিল এবং জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ইতালিয় মুসলিম যুবকদের আবাসন ও কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈধ ব্যবসা সকলের স্বার্থে নাগরিক আন্দোলন গঠন করা বা যোগদান করা উচিত। এটি সকলের জন্য কল্যাণের শক্তি হয়ে নাগরিক

অবদানের পথ উন্মুক্ত করবে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা মানে সকল ইতালিয়দের জন্য ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করা।

পৌর নির্বাচন এক্ষেত্রে একটি প্রবেশপথ হতে পারে: তরুণ মুসলিমরা স্থানীয় কাউন্সিলের জন্য দাঁড়াতে পারে, যেখানে তারা পাড়া এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে। স্থানীয় রাজনীতিতে ব্রিটিশ, ফরাসি এবং জার্মান মুসলিমদের আপেক্ষিক সাফল্য মূল্যবান শিক্ষা প্রদান করে।

৬.৪. বৃহত্তর সমাজের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

ইতালির মুসলিমদের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে বিকশিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ইতালিয় মুসলিম তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ক্যাথলিক যুব সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও সামাজিক প্লাটফর্ম, ট্রেড ইউনিয়ন এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পারস্পরিক মূল্যবোধ-বিশেষত পরিবার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জলবায়ু-সংক্রান্ত সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে আন্তঃসম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে।

ভ্যাটিকানের সাম্প্রতিক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতি উন্মুক্ততা এই সহযোগিতার জন্য একটি ইতিবাচক কাঠামো সরবরাহ করে। এটি শুধুমাত্র পৃথক স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নয়; বরং নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক ইস্যুসমূহে মুসলিম ও ক্যাথলিক-উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে একটি সমন্বিত নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

৬.৫. মিডিয়া এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নের সুষ্ঠু ব্যবহার

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো ইতালিতেও মুসলিমদের মূলধারার গণমাধ্যমে উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো পডকাস্ট, তথ্যচিত্র, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণা এবং নতুন মিডিয়ার অন্যান্য মাধ্যম তরুণ মুসলিমদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড, উদ্যোক্তা উদ্যোগ এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার নানাবিধ অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য একটি কার্যকর উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ধরনের উদ্যোগ নেতিবাচক স্টেরিওটাইপকে প্রতিহত করার পাশাপাশি ইতালিয় জনপরিসরে মুসলিমদের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে। ইতিবাচক

গল্প বলার মাধ্যমে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক কাজে মুসলিম ব্যক্তিরা যে বহুমাত্রিক অবদান রেখে চলেছে, তা আরও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়।

৬.৬. লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়ন

ইতালির মুসলিম সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং লিঙ্গ-সম্পর্কিত মনোভাব বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তরুণ মুসলিম নারী এবং লিঙ্গ সমতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।[৫৫] নারীদের জন্য নেতৃত্ব কর্মসূচি, উদ্যোক্তা অনুদান, মিডিয়া এবং জনজীবনে দৃশ্যমানতা এবং মহিলা সংগঠনগুলির সাথে অংশীদারিত্ব (মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়) মুসলিম নারীদের নাগরিক অভিনেতা হিসেবে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষা, উদ্যোক্তা এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের সহায়তাকারী উদ্যোগগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নারী মুসলিম আইনজীবী, সাংবাদিক এবং শিল্পীদের নতুন প্রজন্ম একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করেঃ বিশ্বাস এবং স্বাধীনতা সহাবস্থান করতে পারে।

৬.৭. বিশ্বাসভিত্তিক নৈতিক পুনর্নবীকরণ

এমন একসময়ে যখন বস্তুবাদ এবং নিন্দাবাদ ইউরোপের নৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন ইসলামের নীতিগত বার্তা সততা, করুণা এবং দায়িত্ব একটি ইতিবাচক শক্তি হতে পারে। মুসলিম তরুণদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নৈতিক গুণাবলীকে ধারণ করা উচিতঃ অভাবীদের সেবা করা, পরিবেশ রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা। এই ধরনের নৈতিক উপস্থিতি বিতর্কের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান তৈরি করে।

৭. উপসংহারঃ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতালিয় ভবিষ্যতের দিকে

ইতালি আজ এক সংবেদনশীল ও রূপান্তরমুখী মুহূর্ত অতিক্রম করছে। দেশটির জনসংখ্যা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠিত হচ্ছে, এবং আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রটি তার নৈতিক ও সামাজিক দিকনির্দেশনাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার সংগ্রামে নিয়োজিত। এই পরিবর্তনশীল বাস্তবতার মাঝেই ইতালিয় মুসলিমদের গল্প, যা একদিকে অভিবাসন, অন্তর্ভুক্তি ও

[55] https://www.rieds-journal.org/rieds/article/view/63?utm_source=chatgpt.com

সংগ্রামের, অন্যদিকে আশাবাদ, পুনর্গঠন এবং নতুন নাগরিক সম্ভাবনার-ক্রমশ রূপ নিতে শুরু করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতালিতে মুসলিম উপস্থিতি কোনও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ বা সামাজিক অস্থিরতার কারণ নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার এক তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ। ইতালিয় মুসলিম যুবসমাজকে কোনও "সমস্যা-উৎপাদক গোষ্ঠী" হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন নয়; বরং তারা এমন এক মানবসম্পদ, যাদের বিকাশ, অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা ইতালির ভবিষ্যৎ সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে। এই তরুণ প্রজন্ম একটি নতুন ধরণের ইতালিয় নাগরিকত্বের প্রতীক-যেখানে ইসলামি ঐতিহ্য, ইতালিয় পরিচয়, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরস্পরকে অস্বীকার না করে বরং সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়।

মরক্কো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আলবেনিয়া কিংবা অন্যান্য দেশ থেকে আসা পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম তরুণদের জন্য পথ নির্দেশনা স্পষ্ট-নিজেদের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিকে দৃঢ় রেখে সমান মর্যাদাসম্পন্ন ইতালিয় নাগরিক হিসেবে জনজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এই অগ্রযাত্রা দাবি করে শিক্ষা, যোগ্যতা, দূরদর্শিতা এবং সামাজিক সাহস। মুসলিম তরুণদের উচিত বাধা-নির্মাতা নয়; বরং সেতুবন্ধনকারী হিসেবে আবির্ভূত হওয়া; অভিযোগকারী নয়; বরং ইতালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কার্যকর অবদানকারী হয়ে ওঠা। ইসলামের মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির শিক্ষা এবং ইতালির শিল্প, চিন্তা ও নাগরিক ঐতিহ্যের সম্মিলন তাদের জন্য এক শক্তিশালী আদর্শ কাঠামো তৈরি করতে পারে।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতালি যে রাষ্ট্র তার মুসলিম জনগণকে বহিরাগত বা সাময়িক উপস্থিতি হিসেবে নয়; বরং পূর্ণ নাগরিক ও সহনির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সেই ইতালি তার নিজস্ব ঐতিহাসিক চেতনাকেই পুনরুদ্ধার করবে। কারণ ইউরোপীয় নবজাগরণের জন্মই হয়েছিল সভ্যতাগুলির মধ্যকার জ্ঞান-সংলাপ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে। যেমন সিসিলি অতীতে মুসলিম-খ্রিষ্টান সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশে বিকশিত হয়েছিল, তেমনি সমসাময়িক ইতালিও তার বহুবর্ণ নাগরিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান এবং সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পুনরায় বিকশিত হতে পারে।

ইতালির সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, তারা কি তাদের নিজস্ব সার্বজনীন মূল্যবোধ solidarietà, giustizia, umanità (সংহতি, ন্যায়বিচার, মানবতা) পুনরায় আবিষ্কার করতে পারবে কি না, যারা বিশ্বাসে ভিন্ন হলেও একই মানবিক স্বপ্ন ভাগ করে নেয়। ইতালির মুসলিম তরুণরা যদি প্রজ্ঞা এবং সততার সাথে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে তারা কেবল নিজেদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গঠন করবে না বরং ইতালির আত্মাকেও সমৃদ্ধ করবে।

*** ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী একজন সুপরিচিত ব্রিটিশ নাগরিক, শিক্ষাবিদ, প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ এবং লেখক। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে সংক্ষিপ্ত সময় কর্মজীবন শেষে তিনি যুক্তরাজ্যে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে বিশেষ শিক্ষা ও আচরণগত সহায়তা বিষয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন।*

তিনি মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন, সিটিজেন্স ইউকে এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদের অন্যতম সংগঠক এবং লন্ডন ২০১২ অলিম্পিকের পরিচালনা কমিটির বোর্ড সদস্য ছিলেন। নাগরিক সমাজ, যুব নেতৃত্ব এবং মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই তাঁর আজীবন কাজ।

ড. বারী যুক্তরাজ্যের মুসলিম সমাজে সংলাপ, সংহতি এবং মধ্যমপন্থার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ। তিনি "reason and love"-এর মাধ্যমে বিভাজন দূর করার বার্তায় পরিচিত।

২০০৩ সালে তিনি এমবিই উপাধি লাভ করেন এবং ২০১৬ সালে গ্রেটার লন্ডনের ডেপুটি লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সম্মানিত ফেলো এবং ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেটপ্রাপ্ত।

(গ্রন্থাকার মূল প্রবন্ধের ইংরেজি ভার্সন হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন)

“Knowledge is the light that guides kings better than the sword.”
(Frederick II of Hohenstaufen) —

করণীয় ও নীতিনির্ধারণের নতুন দিকনির্দেশনা

আজ হতে প্রায় **১২** বছর আগে Islam in Italia: una questione politica, non di libertà religiosa. La via degli accordi interstatual নামক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রকাশক ইতালির প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আলোকপাত করে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দেন। তার দীর্ঘ প্রবন্ধের সারাংশ হলো “ইতালিতে ইসলামের উপস্থিতি আজ শুধুমাত্র ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা। উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ থেকে আগত মুসলিমদের অভিবাসনের ফলে ইতালির সমাজে এক নতুন সাংস্কৃতিক স্তর গঠিত হয়েছে। প্রায় বারো লক্ষ মুসলিম বর্তমানে ইতালিতে বসবাস করছে, যাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক কারণে অভিবাসী হয়েছে। প্রফেসর সিয়রো স্বাইলো[৫৬] তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ইসলামকে কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা ভুল হবে, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনিক কাঠামো এবং নাগরিক অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন।

ইতালির সংবিধানের অষ্টম ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা বা “ইন্তেসে” চুক্তি করতে পারে। কিন্তু ইসলামি সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। ইসলামে কোনো কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ না থাকায় রাষ্ট্রের পক্ষে একক প্রতিনিধি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে, যার ফলে আনুষ্ঠানিক চুক্তি জটিলতায় পড়ে। তা ছাড়া ইসলামি শরিয়াহ ও ইতালিয় নাগরিক আইনের মধ্যে পারিবারিক, উত্তরাধিকার ও বিবাহসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ধারণাগত বিরোধ রয়েছে। তাই ইসলামের অবস্থান ইতালিতে কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার নয়; বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমঝোতার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

স্বাইলো ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখান, ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিমদের জনজীবন থেকে ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, আর ব্রিটেনের

[56] Professore di Diritto pubblico comparato – Università degli Studi Internazionali (UNINT), Roma.

বহুসংস্কৃতিবাদ মুসলিমদের সামাজিকভাবে আলাদা করে তুলেছে। এই দুই চরম অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইতালির উচিত নাগরিক সমতা ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। তিনি মনে করেন, ইসলামকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলে সামাজিক সংহতি আরও মজবুত হবে।

লেখক ইসলামের "রাষ্ট্রায়ন" বা Islam degli Stati ধারণাটি সামনে আনেন। তাঁর মতে, ইতালির মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্যবস্থাকে মুসলিম মাতৃদেশগুলোর সহযোগিতায় গড়ে তোলা উচিত। এভাবে রাষ্ট্র অনুমোদিত ইমাম ও শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে, ধর্মীয় শিক্ষা ইতালিয় নাগরিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং চরমপন্থা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এতে ইসলাম ইতালির সমাজে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসেবে নয়; বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অন্তর্ভুক্ত অংশে পরিণত হবে।

স্বাইলো উপসংহারে বলেন, ইতালিতে ইসলামের প্রশ্ন শুধুমাত্র মসজিদ বা পোশাকের বিতর্কে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ভূমধ্যসাগরীয় রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। ইসলামকে যদি ইতালির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহযোগী শক্তি হিসেবে দেখা যায়, তবে এটি সমাজে নতুন ধরনের ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্ম দেবে। কিন্তু যদি ইসলামকে কেবল সহনশীলতার সীমায় আবদ্ধ রাখা হয়, তবে বিভাজন ও অবিশ্বাস আরও বাড়বে। তাঁর মতে, ইসলামের উপস্থিতি ইতালির জন্য কোনো সংকট নয়; এটি এক নতুন সামাজিক চুক্তি নির্মাণের সুযোগ, যেখানে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, শিক্ষাগত সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সংলাপ মিলিত হয়ে ইতালির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে।

ইতালিতে ইসলামের উপস্থিতি এখন আর প্রান্তিক কোনো বাস্তবতা নয়; এটি রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে অভিবাসনের ধারায় ইতালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক নতুন বহুস্বর সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৬০ লক্ষেরও বেশি মুসলিম আজ ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন কেউ শ্রমিক, কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা নাগরিক সমাজের কর্মী। এই নতুন বাস্তবতাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় স্বাধীনতার আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা আজ আর সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক সিয়রো স্বাইলো (২০১৭ সালে) তাঁর প্রবন্ধ তাঁর এই বিশ্লেষণ সে সময় যথার্থ ছিল, যখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সীমিত এবং অভিবাসন ছিল প্রধানত অস্থায়ী চরিত্রের। কিন্তু বর্তমানে ইতালির সামাজিক

কাঠামো বদলে গেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিমরা ইতোমধ্যেই ইতালিয় সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে এবং নাগরিক পরিচয় লাভ করেছে। ফলে ইসলাম এখন ইতালির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত এক বাস্তবতা।

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো ইসলামকে নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়, নাগরিক অংশগ্রহণের উপাদান হিসেবে দেখা। মুসলিমরা ইতালির কৃষি, নির্মাণ, শিল্প ও স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তারা কেবল কর্মসংস্থানের অংশ নয়, অর্থনৈতিক স্থিতির অন্যতম ভিত্তিও। রাষ্ট্রের উচিত এই সম্প্রদায়কে “অভিবাসী” পরিচয় থেকে সরিয়ে “ইতালিয়ান নাগরিক মুসলিম” হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে সমাজে অদৃশ্য এক বিভাজন ক্রমশ গভীরতর হবে।

একই সঙ্গে, ইতালির শিক্ষাব্যবস্থা ও গণসংলাপে ইসলামকে বোঝার জন্য সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা (cultural literacy) বাড়ানো জরুরি। ধর্মীয় বিতর্ক নয়; বরং ইতিহাস, দর্শন ও শিল্পকলার পরিসরে ইসলামি অবদানকে উপস্থাপন করতে হবে। মধ্যযুগে যেমন আরব ও ইউরোপীয় চিন্তার মিলন পালেরমো ও সিসিলিকে এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করে তুলেছিল, আজও সেই ঐতিহাসিক সহাবস্থানের শিক্ষা নতুন করে প্রাসঙ্গিক। দার্শনিক এরনেস্টো বালদুচ্চি একবার বলেছিলেন, “ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সে কতটা মানবিকভাবে অন্যকে বুঝতে পারে তার ওপর।” এই উক্তি আজ ইতালির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ভূমিকা হওয়া উচিত সহযোগিতামূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক নয়। ইমাম প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় শিক্ষা ও মসজিদ পরিচালনা এসব বিষয়ে স্বচ্ছ ও নাগরিকসম্মত নীতি গ্রহণ জরুরি। একটি জাতীয় ইসলাম কাউন্সিল (Consiglio Nazionale Islamico) গঠন করা যেতে পারে, যেখানে ইসলামি সংগঠনসমূহ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা মিলিতভাবে নীতিনির্ধারণ করবে। এতে ইসলাম ইতালির সামাজিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠবে, বিদেশি প্রভাবের বাহন নয়।

এক্ষেত্রে “রাষ্ট্রীয় ইসলাম” (Islam degli Stati)-এর ধারণার পরিবর্তে “নাগরিক ইসলাম (Civic Islam)” প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। নাগরিক ইসলাম অর্থাৎ এমন এক ইসলাম, যা ধর্মীয় বিশ্বাসে স্বাধীন, কিন্তু নাগরিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি মুসলিমদের ইতালিয় সমাজে অংশীদার করে তুলবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে নয়; বরং ঐক্যবদ্ধ জাতির সদস্য হিসেবে।

ইতালির নীতিনির্ধারকদের এখন দরকার রাজনৈতিক সাহস ও সাংস্কৃতিক দূরদৃষ্টি। ইসলামকে সন্দেহের নয়, সহযোগিতার পরিসরে আনতে হবে। রাষ্ট্র যদি ইসলামকে সামাজিক সংলাপ, শিক্ষা ও নীতির পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে তা বিভাজনের নয়; বরং ঐক্যের ভিত্তি হয়ে উঠবে। ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়-যখন ইসলাম ও ইউরোপের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে, তখনই সভ্যতা নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে। ইতালির বর্তমান সমাজে তাই করণীয় তিনটি মূল দিক-

১. ইসলামকে নাগরিক অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন হিসেবে দেখা;
২. শিক্ষাব্যবস্থা ও গণসংলাপে ইসলামি সংস্কৃতির ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা;
৩. রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা।

যদি এই পথ অনুসৃত হয়, তবে ইসলাম আর "অন্যের ধর্ম" থাকবে না; বরং তা ইতালির সমাজ ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আমিন মালুফ একবার লিখেছিলেন, "যখন পরিচয়কে ভয় নয়, সৌন্দর্য হিসেবে দেখা যায়, তখনই সভ্যতা টিকে থাকে।" ইতালির ভবিষ্যৎও হয়তো এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্যেই নিহিত ইসলামের সঙ্গে সহাবস্থান নয়, সহবিবর্তনের পথেই মানবিক ইউরোপ পুনর্জন্ম লাভ করবে।

ইতালিতে বসবাসরত মুসলিমদের জন্য এখনকার সময়টি আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী আগে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে ইসলাম যে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ বপন করেছিল, আজকের প্রবাসী মুসলিমদের সেই ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। একটি সুস্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর অনুরাগ। ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম তরুণদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু শুধু পেশাগত নয়, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানার্জন-অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা এই চেতনা তাদের মধ্যে জাগাতে হবে।

ইসলামের অনুসরণ মানে কেবল নামাজ বা রোজার আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং ন্যায়, সততা, দায়িত্ববোধ ও মানবকল্যাণকে জীবনের অংশ করে নেওয়া। একটি অমুসলিম সমাজে বসবাসের ফলে ধর্মীয় জীবনযাত্রা রক্ষা করা যেমন চ্যালেঞ্জ, তেমনি এটি এক মহান সুযোগও ইসলামের সৌন্দর্য ও ভারসাম্য প্রদর্শনের

সুযোগ। ইতালির সামাজিক বাস্তবতায়, মুসলিমদের উচিত কর্মক্ষেত্রে, প্রতিবেশে ও জনজীবনে আদর্শ আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা।

হালাল রোজগারের প্রতি কঠোর অনুরাগ থাকা এই সমাজে বিশেষভাবে জরুরি। ইউরোপীয় অর্থনীতি নানা রকম প্রলোভন ও অনৈতিক ব্যবসায়িক সংস্কৃতিতে ভরপুর। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের উচিত ইসলামি বিধানের আলোকে রোজগার অর্জন করা, যাতে প্রতিটি উপার্জন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। "হালাল আয়" শুধু শরিয়তের বিধান নয়, এটি মানবিক মর্যাদা ও আত্মিক শান্তির উৎসও।

দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রেও ইতালির মুসলিমদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এখানে কোনো রাজনৈতিক প্রচার নয়; বরং নৈতিকতা ও মানবিকতার শিক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ইতালিয় সমাজ সংস্কৃতি, শিল্প ও আলোচনায় সমৃদ্ধ; তাই সংলাপ ও উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কুরআনের ভাষায়, "তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" এই আদেশই মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ, যেখানে কঠোরতা নয়, সদ্ব্যবহারই দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি।

পরিবারই হলো ইসলামি সমাজের ভিত্তি। বিদেশের মাটিতে সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে মাতৃভাষা ও ধর্মচেতনা জাগানো, এবং পারিবারিক জীবনে ইসলামি মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা আজ সবচেয়ে বড় করণীয়। বাবা-মা যদি নিজেরা আমলে স্থির হন, তবে সন্তানরাও ইসলামের আলোয় বেড়ে উঠবে।

ইতালির মুসলিমদের সামনে তাই একটি দ্বৈত দায়িত্ব নিজেদের বিশ্বাস ও চরিত্রে ইসলামকে ধারণ করা, এবং সমাজের সামনে ইসলামকে পরিচিত করা একটি মানবিক, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই ইতালির মাটিতে ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব যেখানে মুসলিমরা কেবল প্রবাসী নয়; বরং ইসলামি মূল্যবোধের আলোয় আলোকিত নাগরিক হিসেবে এক নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণে অংশ নেবে।

একই সাথে সামষ্টিক দায়িত্ব আজ ইতালির মুসলিমদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। ব্যক্তিপর্যায়ের সচেতনতা ও আমল যেমন অপরিহার্য, তেমনি সমাজে টিকে থাকা ও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রয়োজন সংগঠিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ। ইতালির প্রায় ৬০ লাখ মুসলিম যদি তাদের জ্ঞান, সম্পদ ও অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করতে পারেন, তবে তারা শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়; বরং সমাজের উন্নয়নে অংশীদার নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে—

প্রথমত, ইসলামি চিন্তা ও বাস্তবতার ওপর গভীর গবেষণার জন্য একটি "রিসার্চ সেন্টার" গড়ে তোলা জরুরি। এই কেন্দ্র ইসলাম, ইউরোপীয় সমাজ, অভিবাসন, আইন, শিক্ষাব্যবস্থা ও মুসলিম প্রজন্মের পরিচয় নিয়ে কাজ করবে। এর মাধ্যমে ইতালিয় একাডেমিক পরিসরে ইসলামকে নতুন আলোয় উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের নিজস্ব "মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম" থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ইসলাম প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা ও নেতিবাচক ধারণায় উপস্থাপিত হয়। একটি শক্তিশালী মুসলিম মিডিয়া শুধু সংবাদ প্রচার করবে না, বরং ইতালিতে মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি, দাওয়াতি কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরবে, যা জনমত পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মাধ্যমে "রিলিফ ও চ্যারিটি সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যাতে মুসলিমরা দেশের দুর্যোগকালীন সহায়তা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন। এতে ইতালিয় সমাজের কাছে ইসলামের মানবিক চিত্র স্পষ্ট হবে, এবং মুসলিম সংগঠনগুলো সরকারী স্বীকৃতি পাবে।

চতুর্থত, "কমিউনিটি ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" যেমন: যুব প্রশিক্ষণ, পরিবার পরামর্শ, নারীশিক্ষা, উদ্যোক্তা বিকাশ এগুলোর মাধ্যমে মুসলিমরা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারক হতে পারেন। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে "ডায়ালগ ফোরাম", যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম চিন্তাবিদ, ধর্মীয় নেতা ও নীতিনির্ধারকরা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবেন।

পঞ্চমত, ইতালির মুসলিমদের উচিত "মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা" নেওয়া। মুসলিমদের ওপর অন্যায় আচরণ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা ইসলামফোবিয়া এসব প্রশ্নে সংগঠিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। একই সঙ্গে একটি শক্তিশালী "হিউম্যান রিসোর্স নেটওয়ার্ক" তৈরি করে তরুণদের দক্ষতা, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠত, মুসলিমদের "সমাজের মূল ধারায় প্রবেশ" করতে হবে শিক্ষা, ব্যবসা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, প্রশাসন সবখানেই উপস্থিতি বাড়াতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে "রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব", যাতে মুসলিম নাগরিকরা শুধু দর্শক নয়; বরং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারেন।

সবশেষে, মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে "ফিকহি ইখতেলাফ বা মতভেদের সমস্যা" দূর করা অপরিহার্য। মাজহাব বা জাতিগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যের ভিত্তি হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মাধ্যমে।

এই সামষ্টিক দায়িত্ব পালনই ইতালিতে ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। একক প্রচেষ্টা নয়; বরং ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ, চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমেই মুসলিমরা নিজেদের পরিচয় রক্ষা করে ইউরোপের এই মাটিতে ন্যায়, মানবিকতা ও ইসলামি মূল্যবোধের আলোকিত সমাজ গঠন করতে পারবে।

ইতালিতে মুসলিম পরিবারের সামনে আজ যে বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তা শুধু অর্থনৈতিক চাপ বা সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে নয়; এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে পরিচয়, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথরেখা গড়ার প্রশ্ন। বহু পরিবারেই দেখা যায়, সন্তান যখন ১৬ বা ১৮ বছরে পৌঁছে যায়, তখন আর্থিক সংকটের কারণে তাকে দ্রুত কাজের পথে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এতে পরিবার তাৎক্ষণিক স্বস্তি পেলেও সন্তানের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি, উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা গড়ে ওঠা সীমিত হয়ে যায়। অথচ একটি সমাজ বা জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের চিন্তা, শিক্ষা এবং গঠনমূলক স্বপ্ন দেখার ক্ষমতার ওপর। তাই অভিভাবকদের ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের মনে প্রথম যে স্বপ্ন জ্বলে ওঠে, তা জ্বালানোর কাজ অভিভাবকেরই। তাদের দায়িত্ব শুধু সন্তানকে ভরণপোষণ করা নয়; বরং জীবনের লক্ষ্য দেখানো, তার আগ্রহ ও প্রতিভাকে যত্ন দিয়ে বড় করে তোলা। বাল্যকাল থেকেই শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, পেশাগত কোর্স, গবেষণা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা ও উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি। সন্তানকে বোঝাতে হবে যে জীবন কেবল অল্প আয়ের একটি চাকরি নয়; বরং এটি চিন্তা, স্বপ্ন এবং দৃঢ় প্রচেষ্টার সমষ্টি।

এক্ষেত্রে কমিউনিটি ও মসজিদ কেন্দ্রগুলোকে শুধুই ধর্মীয় আচার পালনের স্থানে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। এগুলো হওয়া দরকার শিক্ষার, প্রশিক্ষণের এবং পারস্পরিক সহায়তার কেন্দ্র। স্থানীয় কমিউনিটি যদি ক্যারিয়ার পরামর্শ, চাকরির তথ্য, ভাষা ও গণিতের অতিরিক্ত শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্দেশনা এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ চালু করতে পারে, তাহলে অনেক শিক্ষার্থী প্রবলভাবে উপকৃত হবে। একই সাথে মসজিদের খুতবা ও ধর্মীয় আলোচনায় শিক্ষা, শ্রম, জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন; যাতে যুবসমাজ বুঝতে পারে ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ বা রোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞানের অনুসন্ধান ও মানবতার কল্যাণও ইসলামের মূলে রয়েছে।

পরিবার, সমাজ এবং ধর্মীয় জ্ঞান এই তিন উপাদানের সুষম সমন্বয় হলেই ইতালির মুসলিম তরুণ প্রজন্ম নিজেদের আত্মপরিচয় বজায় রেখে আধুনিক সমাজে

দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। আর্থিক সংকট সাময়িক, কিন্তু শিক্ষা ও দক্ষতা স্থায়ী শক্তি। আজ যদি আমরা সন্তানকে একটু সময় দিই, একটু ধৈর্য ধরি, তাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিই, তাহলে আগামীকাল সে পরিবার, সমাজ এবং দেশ সবকিছুর জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এখনই সময় স্বল্পমেয়াদি লাভের চিন্তা থেকে বেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে দৃঢ়ভাবে হাঁটার। পরিবার-সমাজ-ধর্মীয় নেতৃত্ব সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতালির মুসলিম প্রজন্ম জ্ঞান, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতার এমন এক উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, যা শুধু তাদের নিজেদের নয়; বরং পুরো ইউরোপীয় সমাজের জন্যও হতে পারে একটি ইতিবাচক উদাহরণ।

ইতালির তরুণ মুসলিমরা আজ এক দ্বৈত বাস্তবতায় বাস করছে একদিকে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের উন্মুক্ততা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, অন্যদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার হ্রাস। এই অবস্থায় তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজের "মুসলিম পরিচয় ও সংস্কৃতি ধরে রাখা"। ইসলাম তাদের শুধু একটি ধর্ম নয়; বরং ন্যায়, দয়া, জ্ঞান ও শৃঙ্খলার জীবনব্যবস্থা। যদি তারা এই চেতনা নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারে, তবে সিসিলির নর্মান দরবারে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান কিংবা পালেরমোর আরবি প্রশাসনের উদাহরণ শুধু ইতিহাসের অধ্যায় নয়; বরং বর্তমানের কর্মপন্থা হয়ে উঠবে।

তরুণ প্রজন্মকে ইসলামি আদর্শের প্রতি "আকৃষ্ট করতে হবে জ্ঞান ও চরিত্রের মাধ্যমে"। ইসলাম কখনো অন্ধ আনুগত্যের ধর্ম নয়; বরং এটি যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের ধর্ম। তাই তরুণদের সামনে ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে এটি আধুনিকতার সঙ্গে সংঘর্ষে নয়; বরং মানবজীবনের ভারসাম্যের পথপ্রদর্শক। মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হতে হবে এই নবজাগরণের কেন্দ্র, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সংলাপ ঘটবে, যেমনটা ঘটেছিল ফ্রেডেরিক দ্বিতীয়ের রাজসভায়, যেখানে মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকরা ইউরোপীয় চিন্তাকে আলোকিত করেছিলেন।

এই প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম পরিবারই হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। কিন্তু আজ অনেক পরিবার ব্যস্ত জীবনে ধর্মীয় পরিচর্যাকে গৌণ মনে করে। অথচ যদি বাবা-মা নিজেরা ইসলামি আদর্শে জীবনযাপন করেন, সন্তানদের সঙ্গে আল্লাহ, নবি ও নৈতিকতার কথা বলেন, তবে সেই ঘরই হয়ে উঠবে এক ক্ষুদ্র মাদরাসা, এক নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র।

তরুণদের "আদর্শিক সুশিক্ষা" দিতে হলে শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। ইতালিতে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা মুসলিম তরুণদের বুঝতে হবে-তারা এই সমাজেরই অংশ, তবে তাদের পরিচয় আলাদা এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রা বহন করে। কুরআনের শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও সামাজিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে, তারা হবে এমন প্রজন্ম যারা জ্ঞানে ও আচরণে মুসলিম, কিন্তু নাগরিকত্বে সম্পূর্ণ ইতালিয়ান যেমনটি একসময় সিসিলির আরব প্রশাসক ও স্থপতিরা ছিলেন।

একই সঙ্গে তরুণদের নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে "সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা" করা প্রয়োজন। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস, আরবি ভাষা, ইসলামি শিল্প ও সংগীত এসবের সঙ্গে পরিচয় তাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি দৃঢ় করবে। তারা যদি তাদের সংস্কৃতিকে জানে ও ভালোবাসে, তবে তারা কখনো আত্মগোপন করবে না; বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলবে "আমরা মুসলিম, আমরা ইতালির নাগরিক, এবং আমাদের অতীত এই দেশের ঐতিহ্যের অংশ।"

তরুণ প্রজন্মের এই দায়িত্ব ব্যক্তিগত নয়, সামষ্টিকও বটে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সংগঠিত প্রচেষ্টা ও দাওয়াতি মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। ইসলাম শুধু নামাজ বা রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যেখানে জ্ঞান, নৈতিকতা, সমাজসেবা ও মানবিকতা সব একসঙ্গে চলমান।

যদি তরুণ প্রজন্ম এই চেতনায় গড়ে ওঠে, তবে তারা ইতালির সেই হারিয়ে যাওয়া সোনালি অতীতকে মনে করিয়ে দেবে যখন মুসলিমরা ছিল জ্ঞানের দিশারি, শিল্পের অনুপ্রেরণা, সহাবস্থানের প্রতীক। তারা প্রমাণ করবে, ইসলাম আবারও এই ভূমিতে নবজীবন লাভ করতে পারে, যদি তা জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতার আলোয় পরিচালিত হয়।

ইতালির আকাশে হয়তো একদিন নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে আবারও প্রতিধ্বনিত হবে সেই চেতনা "আমরা এই দেশেরই অংশ, কিন্তু আমাদের দিশা আল্লাহর পথে।" এবং তখন সত্যিই ইতালির মাটিতে ইসলামের সেই সোনালি ঐতিহ্য নতুন আলোয় ফিরে আসবে।

"Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni."

বাংলা অনুবাদ: "ভবিষ্যৎ সেই ব্যক্তির, যারা তাদের স্বপ্নের সৌন্দর্যে বিশ্বাস রাখে।"

ইতালির আকাশে ইসলামের আলো প্রথম উদিত হয়েছিল এক সহস্রাব্দেরও বেশি আগে যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মানবিকতার শিখা ভূমধ্যসাগরের তীরে প্রজ্বলিত

হচ্ছিল। সিসিলির পাথরে খোদাই করা সেই আলোকরেখা আজও ম্লান হয়নি; বরং ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে সে আবার জেগে উঠছে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে।

মুসলিমরা একদা এখানে এসেছিল জয়ের পতাকা নয়, সভ্যতার প্রদীপ হাতে। তারা গড়েছিল শহর, বাগান, গ্রন্থাগার ও এমন এক সংস্কৃতি, যেখানে জ্ঞান ও ন্যায় ছিল একই নক্ষত্রের দুই প্রান্ত। সময়ের আবর্তে অনেক কিছু বিলীন হয়েছে, কিন্তু সে সোনালি দিনের চেতনা এখনো ইতালির অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত স্থাপত্যে, ভাষায়, সঙ্গীতে, এমনকি মানবিক ভাবনাতেও।

আজকের ইতালির মুসলিমরা সেই ঐতিহ্যের নতুন দায়বাহক। তারা কেবল একটি ধর্মীয় পরিচয়ের ধারক নয়; বরং দুটি সভ্যতার মাঝে জীবন্ত সেতু। তাদের হাতে রয়েছে সংলাপের সম্ভাবনা, সমবেদনার বার্তা, এবং মানবিক ভবিষ্যতের নকশা। এ প্রজন্মের তরুণরা যদি জ্ঞান, নীতি ও সৃজনশীলতায় নিজেদের পুনর্গঠন করতে পারে, তবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা অনিবার্য যেখানে ইসলাম হবে না প্রাচীন স্মৃতি, বরং আধুনিক ইতালির নৈতিক হৃৎস্পন্দন।

ইতিহাসের এই দীর্ঘ সফরে আমরা দেখেছি, কোনো সভ্যতা চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু চিন্তার দীপ্তি ও নৈতিকতার আলো কখনো নিভে যায় না। সেই আলোই এখন আমাদের হাতে। আমরা যদি সেটি প্রজ্বলিত রাখতে পারি সততা, জ্ঞান, ও সংলাপের আগুনে তবে ভবিষ্যৎ ইতালি আবারও হতে পারে এমন এক ভূমি, যেখানে মানুষ একে অপরকে নয়; বরং সত্যকে খুঁজে বেড়াবে।

এই বই সেই যাত্রারই এক ক্ষুদ্র মানচিত্র অতীতের স্মৃতি থেকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথে। আর এখন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নয়; মানুষের হৃদয়ে শুরু হোক ইসলামের নতুন অধ্যায়।

একনজরে মুসলিম শাসনের অধীনে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার

নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সিসিলিতে মুসলিম শাসন দ্বীপটির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময়কালকে সিসিলির “স্বর্ণযুগ” হিসেবে গণ্য করা হয়। আরবরা কেবল শাসক হিসেবে নয়; বরং উদ্ভাবক এবং সংস্কৃতির বাহক হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছিল, যা সিসিলির কৃষি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং সমাজকে আমূল বদলে দিয়েছিল।

১. কৃষি বিপ্লব এবং খাদ্য সংস্কৃতি

মুসলিম শাসকরা সিসিলির শুষ্ক জলবায়ুকে মাথায় রেখে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন।

১. উন্নত সেচব্যবস্থা: তারা পারস্য ও উত্তর আফ্রিকা থেকে উন্নত সেচ প্রযুক্তি নিয়ে আসে। এর মধ্যে ছিল ভূগর্ভস্থ জলপথ বা 'কানাট' (qanats) এবং পশুর শক্তি ব্যবহার করে জল তোলার যন্ত্র 'সেনিয়া' (senia)। এই ব্যবস্থাগুলি সারা বছর ধরে ফসলের জন্য জলের সরবরাহ নিশ্চিত করে।
২. নতুন শস্যের প্রবর্তন: আরবরা প্রায় ৩০ ধরনের নতুন শস্য প্রবর্তন করে, যা সিসিলির মাটির জন্য অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে প্রধান ছিল:
৩. ডুরম গম: এই শক্ত গম পাস্তা তৈরির জন্য আদর্শ ছিল।
৪. আখ: চিনির উৎপাদন শুরু হয়, যা ইউরোপে একটি নতুন পণ্যের চাহিদা তৈরি করে।
৫. লেবু ও কমলা: ভূমধ্যসাগরের জলবায়ুতে এই ফলগুলির চাষ শুরু হয়।
৬. চাল, তুলা, বেগুন, পেস্তা, পালংশাক এবং আর্টিচোক।
৭. পাস্তা শুকানোর কৌশল: ডুরম গমের প্রাচুর্য এবং পাস্তা রোদে শুকিয়ে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ ও পরিবহনের কৌশল উদ্ভাবিত হয়। এই উদ্ভাবনটি আধুনিক ইতালিয় পাস্তা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করে।
৮. রন্ধনপ্রণালিতে প্রভাব: আরবরা নতুন মশলাপাতি (যেমন জাফরান, দারুচিনি) এবং রান্নার কৌশল, যেমন 'ভাজা' (frying), চালু করে। জনপ্রিয় সিসিলীয় খাবার আরানসিনি (ভাতের বল) এবং ক্যানোলির মতো মিষ্টান্নগুলোতে আজও সেই প্রভাব স্পষ্ট।

২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য বিস্তার

৯. ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রবিন্দু: মুসলিম শাসনামলে পালেরমো ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ এবং ধনী শহরে পরিণত হয়। এটি উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।
১০. কুটির শিল্প ও বাণিজ্য: টেক্সটাইল, কাগজ, চিনি, কাঁচ, এবং রেশম শিল্পের বিকাশ ঘটে। সিসিলীয় উৎপাদিত পণ্যগুলি দূরদূরান্তে রপ্তানি হতো।

১১. আর্থিক ব্যবস্থা: একটি দক্ষ প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা (দি এক্সচেকার বা 'Diwan al-Makhzin') চালু করা হয়, যা ভূমি জরিপ এবং কর আদায়কে সুসংগঠিত করেছিল।

৩. জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন

১২. জ্ঞানের সেতু: সিসিলি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান বিনিময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এখানে গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি এবং হিব্রু ভাষার পণ্ডিতরা একত্রিত হন।

১৩. অনুবাদ আন্দোলন: মুসলিম বিজ্ঞানীরা গ্রিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিকে আরবিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে সিসিলি থেকেই সেই আরবি অনুবাদগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে, যা ইউরোপীয় রেনেসাঁর পথ প্রশস্ত করে।

১৪. ভূগোল ও মানচিত্রাঙ্কন: বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল-ইদ্রিসি নর্মান রাজা দ্বিতীয় রজারের দরবারে কাজ করেন এবং তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভুল মানচিত্র 'টাবুলা রজেরিয়ানা' (Tabula Rogeriana) তৈরি করেন।

১৫. স্থাপত্য ও শিল্পকলা: মুসলিম স্থাপত্যশৈলী সিসিলির ল্যান্ডস্কেপকে সমৃদ্ধ করে। পালাজো ডেলা কুবা (Palazzo della Cuba) এবং লা জিসা (La Zisa)-এর মতো প্রাসাদগুলি ইসলামিক নকশার উজ্জ্বল উদাহরণ। পরবর্তীতে খ্রিষ্টান ও ইসলামিক স্থাপত্যের মিশ্রণে এক অনন্য 'আরব-নর্মান' শৈলী গড়ে ওঠে।

Books and Primary Sources

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr).* Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li-l-Nashr, 30 vols.

Al-Azmeh, A. (1997). *Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian, and Pagan Polities.* London: I.B. Tauris.

Al-Baladhuri, A. ibn Y. (1916). *The Origins of the Islamic State (Kitab Futuh al-Buldan)* (P. K. Hitti, Trans.). New York: Columbia University Press.

Al-Idrisi, M. (Various editions). *The Book of Roger (Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq)* (E. Cerulli & S. Maqbul Ahmad, Trans.).

Allievi, S. (2005). *Muslims in Western Europe: Integration and Pluralism.* Edinburgh: Edinburgh University Press.

Amari, M. (1854–1872). *Storia dei Musulmani di Sicilia (History of the Muslims of Sicily).* Florence: Felice Le Monnier.

Alicino, Francesco. *Constitutional Democracy and Islam: The Legal Status of Muslims in Italy*. Routledge, 2023.

Bennison, A. (2009). *The Great Caliphs: The Golden Age of the Abbasid Empire.* London: I.B. Tauris.

Braudel, F. (1972). *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* (S. Reynolds, Trans.). London: Collins.

Burdett, C. (2016). *Italy, Islam and the Islamic World: Representations and Reflections.* Oxford: Peter Lang.

Burman, T. E. (2007). *Reading the Qur'an in Latin Christendom, 1140–1560.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Campanini, M. (2008). *L'Islam religione dell'Occidente.* Milano: Bruno Mondadori.

Campanini, M. (2010). *The Qur'an: Modern Muslim Interpretations.* London: Routledge.

Chiarelli, L. (2011). *A History of Muslim Sicily.* Midsea Books.

Cocchianella, D. (2008). *Integration and Inclusion in Bologna: The Challenge of Pluralism.* Bologna Institute for Social Inclusion.

COREIS Italiana. (2023). *InterMuSe Project: Interreligious Coalition Building against Anti-Muslim Hatred and Anti-Semitism.* Milan: COREIS Publications.

Darke, D. (2020). *Stealing from the Saracens: How Islamic architecture shaped Europe*. Publisher.

Dalli, C. (2016). *Malta and Sicily in the Medieval Mediterranean.* University of Malta Press.

Eco, U. (1986). *Art and Beauty in the Middle Ages.* Yale University Press.

Fabbri, A. (2014). *Identity and Faith in Emilia Romagna: Islam and Civic Participation.* Bologna University Press.

Firas. Alkhateeb, *Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilisation from the Past* (London: Hurst & Company, 2014).

Emily, Greble, Muslim and Making of Modern Europe, Oxford University Press 2021

Gabrieli, F. (1957). *Arab Historians of the Crusades* (E. J. Costello, Trans.). Berkeley: University of California Press.

Granara, W. (2011). *Arab Sicily: History, Language and Literature.* Cambridge: Harvard University, Center for Middle Eastern Studies.

Grasso, L. (2018). *Islam in Italy in the Age of Fear and Hope.* Rome: Edizioni Laterza.

Hendrickson, J. (2007). *Muslim Communities in Post-Norman Sicily: Memory and Identity. Journal of Medieval History, 33*(2).

Hillenbrand, C. (2003). *The Crusades: Islamic Perspectives.* Edinburgh University Press.

Hussain, T. (2025). *Muslim Europe: A journey in search of a fourteen hundred year history* (4 Dec. 2025).

Ibn al-Athir, A. (1987). *Al-Kamil fi al-Tarikh (The Complete History).* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.

Ibn Khaldun, A. (1377/1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.

Irwin, R. (1986). *The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate, 1250–1382*. London: Croom Helm.

Johns, J. (2002). *Arabic Administration in Norman Sicily: The Royal Diwan.* Cambridge: Cambridge University Press.

Jonah, G. (2013). *Italy's Hidden Mosques: Architecture and Identity in a Changing Europe*. London: I.B. Tauris.

Sikder, Kamal. *Lost Caliphate: Power, Politics and Principle in Early Islam.* Paperback ed., 17 December 2025.

Lafram, Y. (2014). *Muslim Communities and Civic Dialogue in Bologna.* Islamic Cultural Centre of Bologna.

Levi Della Vida, G. (1947). *L'Islam nell'Italia medievale.* Rome: Istituto per l'Oriente.

Matthew, D. (1992). *The Norman Kingdom of Sicily*. Cambridge: Cambridge University Press.

Meloni, S. (2019). *Islam e Società in Italia Contemporanea.* Rome: Carocci Editore.

Merola, V. (2008). *Politics and Pluralism in Bologna: A Case Study of Mosque Controversies.* Bologna City Council Reports.

Metcalfe, A. (2009). *The Muslims of Medieval Italy*. Edinburgh University Press.

Mustafa al-Siba'i. *Islamic Civilization and Orientalism: A Comparative Study of Islamic and Western Civilization and Culture*.

Murray, D. (2018). *The strange death of Europe: Immigration, identity, Islam* (14 Jun. 2018).

Norwich, J. J. (1970). *The Kingdom in the Sun, 1130–1194.* London: Longmans.

Neill, S. (2015). *Bologna's Muslims: "We are part of this city."* Al Jazeera English.

Pappalardo, M. (2016). *Rebirth of Islam in Italy: Between Identity and Integration.* Milan: FrancoAngeli.

Pirenne, H. (2001). *Mohammed and Charlemagne Revisited: The History of a Controversy.* London: Routledge.

Rossi, P. (2017). *Young Muslims in Italy: Identity, Belonging, and Faith in a Secular Society.* Florence: Polistampa.

Roggero, Maria Adele. "Muslims in Italy." In *Muslims in the West: From Sojourners to Citizens*. Oxford Academic, 2002

Sicily's Conquest, Empire & Legacy. (2013). *Arab-Norman Sicily and the Mediterranean World.* Palermo: Regione Siciliana.

Salim T. S. Al-Hassani, ed. *1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization*. Manchester: Foundation for Science Technology and Civilisation.

Ramadan, T. (2015). *To be a European Muslim* (31 Dec. 2015). Publisher.

Tibbetts, G. R. (1971). *Arab Navigation in the Indian Ocean before the Coming of the Portuguese.* London: The Royal Asiatic Society.

Tonna, A. (2019). *The Muslims in Sicily: History and Legacy.* Palermo University Press.

UNESCO. (2015). *Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalù and Monreale.* Paris: UNESCO World Heritage Centre Reports.

Zirotti, L. (2015). *Moschee e Iman in Italia: Spaces of Faith and Dialogue.* Rome: Carocci Editore.

Zucchelli, E. (2020). *New Muslim Generation in Italy: Between Tradition and Modernity.* Bologna: Il Mulino.

ডক্টর আবুদদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস। ইউরোপে ইসলাম ও মুসলিম। কামিয়াব প্রকাশনী ঢাকা।

ড. রাগিব সারজানি। মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে। আবদুস সাত্তার আইনী অনূদিত। মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী

ফাহমিদ উর রহমান। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) বাংলা সাহিত্য পরিষদ

Additional Digital and Research Articles

Islam in Sicily – Islamic Studies, Oxford Centre Online. *(2018).*
Italy Turns to Islam. *(2014).* The Guardian.
Italy's Radical Islam Problem Highlighted by Politics. *(2016).* The Economist.
Muslim Sicily: The Forgotten Heritage. *(2017).* Islamic Heritage Research Journal.
The History of Islam in Italy: From the Arabs to Modernity. *(2019).* Cambridge Historical Review.
The Muslims of Sicily and Their Cultural Legacy. *(2020).* European Journal of Mediterranean Studies.

Chiara Anna Cascino - "De-Centering the Gaze on Peripheral Islams" (Religions, MDPI, 2025)

Valentina Schiavinato & Mohammed Khalid Rhazzali — "Training of Imams, Murshidat and Muslim Religious Leaders

বাংলা সংবাদপত্রের প্রামাণ্য প্রবন্ধ / রিপোর্ট

ইতালিতে মুসলিম সমাজ: দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাবলি – Prothom Alo

ইতালিতে শরণার্থী ও মাইগ্র্যান্ট মুসলিমদের বাস্তবতা – Bangladesh Pratidin

ইতালিতে ইসলামী কেন্দ্র ও মসজিদ: একটি লেখচিত্র – The Daily Star (বাংলা সংস্করণ)

(সমাপ্ত)